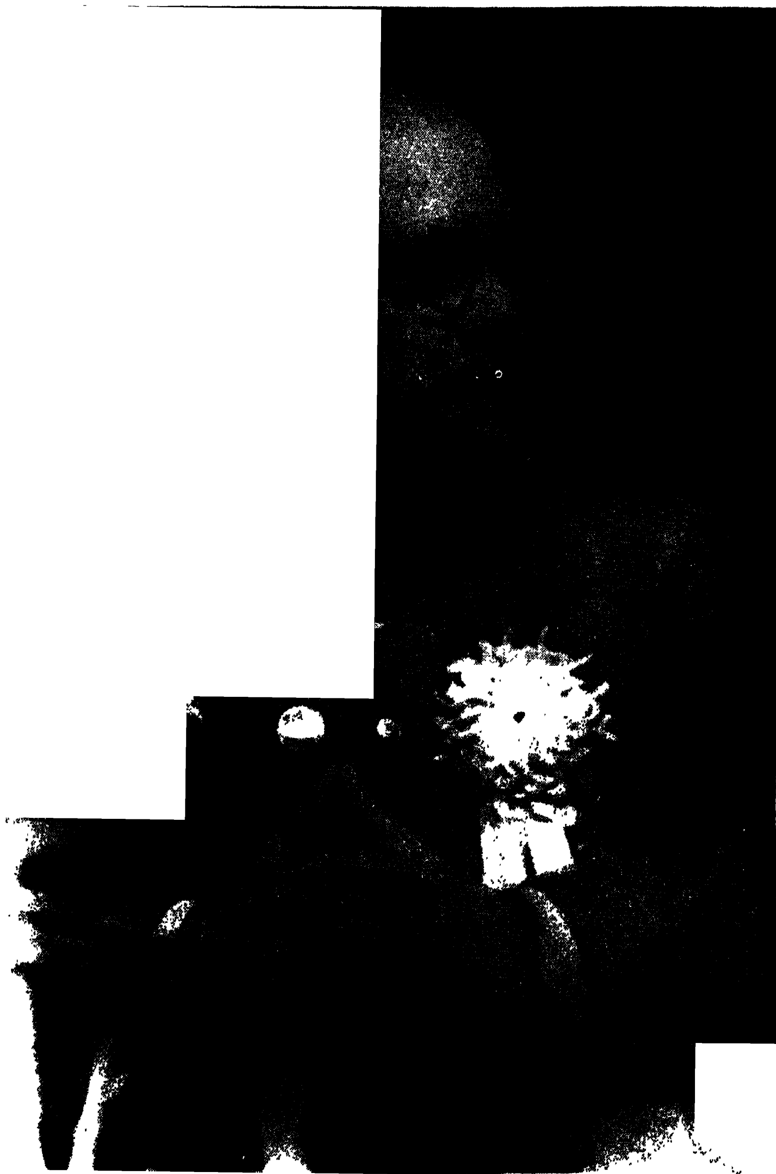


নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা - ১২

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭৩

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

মুদ্রক :
কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

দাম : সাত টাকা

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর শুরু হবার গোড়া থেকেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ভারতীয় করণে ইংরেজ রাজী হয়েছিল। কংগ্রেসের তখন সে-প্রস্তাব মনঃপূত হয় নি। হলো ১৯৪৬-এ। জহরলাল নেহেরু সমাদরে ও উচ্চকণ্ঠে এর নাম দিয়েছিলেন ইনটারিম গভর্ণমেণ্ট। এর পরই ১৯৪৭-এ যে-শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে কংগ্রেসের হাতে এল, তার নাম ডোমেনিয়ন স্টেটাস। স্বাধীনতা নয়। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির পদে দুজন ইংরেজকে রেখে এবং বৈদেশিক রাজার আনুগত্যের শপথ নিয়ে যা পাওয়া যায়, তাকে স্বাধীনতা বলে না।

ধনুর্ভাঙ্গা পণ ইংরেজ বজায় রাখল পুরোপুরি। এক কথায় স্বাধীনতা দেবে না সে, এবং দিলও না।

পরিশ্রান্ত বয়ঃবৃদ্ধ নেতারা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে পরমানন্দে দিল্লীর গদি দখল করে বসলেন। দুশ্চিন্তা ওঁদের বিদূরিত হল। জেলে যাবার সাধ ওঁদের সাঙ্গ হয়ে গেছে। শিথিল ও জরাজীর্ণ বর্তমান হাতছানি দিয়ে ডাক দিল কুয়াশায় ঢাকা আগামী দিনকে। প্রলুব্ধ লালসা এসে দাঁড়াল মনের দরজায়। (১৯৪৭-এর পর এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লিওনার্ড মোস্‌লে এক সাক্ষাৎকারে জহরলাল নেহেরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেন তাঁরা দেশ বিভাগে রাজী হলেন। উত্তরে জহরলাল বলেছিলেন: The truth is that we were tired men and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for united India as we wished it, prison obviously awaited us). (১)

পরবর্তী কালে কী সর্তে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, জানবার উপায় নেই।

(১) 'লাষ্ট ডেজ অব বৃটিশরাজ'—লিওনার্ড মোস্‌লে

লিওনার্ড মোস্‌লে তাঁর বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে, সর্তগুলি নাকি ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশ করা চলবে না।

অর্থাৎ সেদিনকার বয়ঃপ্রাপ্তরা এবং তাদের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠরা বেঁচে থাকতে ও-তথ্য প্রকাশ করা হবে না। ততদিনে অনেক কথা বিস্মৃতির অন্ধ গুহায় চাপা পড়ে যাবে।

গেছেও। আজ কেউ এ-প্রশ্ন উত্থাপন করতে চায় না যে, কেন পূর্ণ স্বাধীনতার সোচ্চার অঙ্গীকার সহসা ১৯৪৬-এর কংগ্রেস কর্তারা বেমালুম ভুলে গেলেন। এ-প্রশ্নও বেশির ভাগ লোকেরই মনে নেই যে, কেন অকস্মাৎ ১৯৪৬-এর প্রারম্ভে, (মার্চ, ১৯৪৬) দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার মিত্রপক্ষীয় সর্বাধিনায়ক লর্ড মাউণ্টব্যাট্‌ন্‌ যুদ্ধে জয়লাভ করবার অব্যবহিত পরই সিঙ্গাপুরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রেডফোর্টের মামলা তখনও শেষ হয়নি। (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৬, প্রথম কিস্তির যুদ্ধবন্দীরা,—শা'নওয়াজ, শেগল ও ধীলন মুক্তি পান।) সমগ্র দেশ অভূতপূর্ব আবেগে কাঁপছে থর থর করে। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের অভ্যর্থনায়, মিছিলে, সভায় দেশ ও জাতি মাতাল হয়ে উঠেছে। দাঙ্গা বেধে গেছে বহু স্থানে। বম্বে আর কলকাতায় পুলিশের গুলিতে মানুষ প্রাণ দিয়েছে বিস্তর। নৌ-বিদ্রোহ ঘটে গেছে। ঘটে গেছে পুলিশ বিদ্রোহ। এবং রেডফোর্ট মামলা উপলক্ষ করে ইংরেজ সেনা-বাহিনীর (ভারতীয়) ক্ষুব্ধ অসন্তোষ গোপন করবার চেষ্টা সত্ত্বেও চাপা যায় নি।

দেশের এ-হেন পরিস্থিতির মাঝখানে সকলের আগে সেদিন মাউণ্ট-ব্যাট্‌নের মনে জহরলাল নেহেরুর কথা জাগল কখন ?

আর কেনই-বা ?

দু'দিন পূর্বের বিদ্রোহী কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। জেল খেটে সবে বের হয়ে এসেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে মাউণ্টব্যাট্‌ন্‌ রাজপথ পরিক্রম করেছিলেন। মিছিলের জলুস হয়েছিল রাজোচিত। কেন ?

সদ্য সদ্য আজাদ হিন্দ বন্দীদের এবং নেতাজির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত গণ-

অভ্যুত্থানের অভূতপূর্ব দৃশ্য ও মানস ভারতবর্ষে দেখে যাবার পর স্বভাবতই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতপ্ত মনে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজির জন্য খানিকটা ভাবাবেগ আকস্মিক ভাবে জেগেও উঠেছিল। তিনি আজাদ হিন্দ শহিদ বেদীতে মাল্যদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটন্ রাজী হননি। জহরলাল নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলেন। জহরলালের এই সময়োচিত বিজ্ঞ আচরণে ও মনোভাবে মাউণ্টব্যাটন্ যথেষ্ঠ পুলকিত ও আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং ভবিষ্যতে এই ব্যক্তিটি তাঁর ভারত সম্পর্কীয় পরিকল্পনায় কতখানি অপরিহার্য ও সহায়ক হবেন, সে কথা ভেবে সেইদিনই হয়তো নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। (১)

জহরলালকে নিয়ে ইংরেজের এই ঢলাঢলি নতুন নয়। ১৯৩৬-এ সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি পাননি। কিন্তু পেয়েছিলেন জহরলাল। আর ইংলণ্ডে তাঁর অভ্যর্থনারও অন্ত ছিল না।

কিন্তু ১৯৩৬ আর ১৯৪৬ এক নয়। নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখ কংগ্রেস অহিংস হলেও বিদ্রোহ করেছে। এবং সেই বিদ্রোহের অন্যতম নায়কও ছিলেন জহরলাল।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করে চলে যান ১৯০৬-এর মার্চ মাসে। নতুন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটন্। দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া পুনরুদ্ধার করে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার প্রাক্কালে ম্যাউণ্টব্যাটন্ আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন জহরলালকে।

সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করে মাউণ্টব্যাটন্-এর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ

(১) He (Mountbatten) would restrict him in no way, but requested one concession : that Nehru would forego laying a wreath on the war Memorial erected to the Indian National Army because they had fought against the local people. It was probably the first time Nehru had a clear picture of what happened. Nehru agreed so that Mountbatten's first impression of him was that of his reasonableness.

—Panditji, a portrait of Jaharlal Nehru by Marie Seton. (Page, 119)

শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করা। সেই স্মৃতিস্তম্ভ,—নেতাজি শেষবারের মতো সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে যা কর্ণেল স্ট্র্যাসিকে তৈরী করাবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া পুনরুদ্ধার করেছিল মিত্রপক্ষ নিশ্চয়ই; কিন্তু ঐ ভূখণ্ডে পদার্পণের পরক্ষণেই মিত্রপক্ষ,—বিশেষ করে ইংরেজ, এ-কথা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, দেশ মানে শুধু মাটি নয়। মানুষও। ইংরেজ কিছুদিনের জন্য মাটি হয়তো পেয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা জেনেওছিল যে, মানুষ সে পায়নি। আর ঐ মানুষগুলোই একদিন তাকে এবং তার সমগোত্রীয় শ্বেতাঙ্গদের মাটি ছাড়া করবে, (এবং পরবর্তীকালে করেও ছিল) সে দিন ইংরেজ এ-কথা ভাববার সময় পায় নি।

এর জন্য একজন ভারতবাসী সর্বোতোভাবে দায়ী, এ-কথাটি মাউণ্টব্যাটেন্-এর অবিদিত ছিল না। তাই কি আর একজন ভারতবাসীর প্রয়োজনীয়তা সেদিন ইংরেজ-প্রতিনিধির কাছে এত বৃহৎ হয়ে দেখা দিয়েছিল?

হয়তো মাউণ্টব্যাটেন্ জহরলালকে সুভাষ বোসের সমকক্ষ ভেবে থাকবেন। অথবা অন্য আর কোন খ্যাতনামা ভারতবাসী অপেক্ষা জহরলাল অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভর সমর্থ, এ-কথা মাউণ্ট-ব্যাটেন্-এর মনে ওঠাও বিচিত্র নয়। এর পূর্বে মাউণ্টব্যাটেন্-এর সঙ্গে নিবিড় তো দূরের কথা জহরলালের আদৌ কোন পরিচিতি ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই।

মাউণ্টব্যাটেন্ অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দীর্ঘদিন ভারতভূমিতে বিরাজ করবেন, এ-কথা জহরলালের জানা ছিল, তার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকলেও থাকা অস্বাভাবিক মোটেই নয়। এবং এই সূত্রে জহরলালের সঙ্গে পরবর্তী রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা একেবারেই আলোচিত হয় নি, বিশ্বাস করা কষ্টকর বই কি।

পরবর্তী ঘটনা অতি দ্রুত এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস।

নেতাজি ও তাঁর হাতে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এই সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিন্দু পরিমাণও স্থান দেয়া হবে না, এও কি ছিল এই নবলব্ধ স্বাধীনতার অন্যতম সর্ত?

এ-সর্তও কি ছিল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভারতীয় সৈন্যদলে স্থান দেয়া চলবে না?

তিন হাজার কোটি বৈদেশিক মুদ্রা হাতে নিয়ে জহরলাল নেহেরুর স্বাধীন ভারতবর্ষ রাজত্ব করতে শুরু করে। সংগ্রাম ক্ষেত্রে আত্মাহুতি দেবার পর অবশিষ্ট কয়েক হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় সেনাবিভাগে স্থান হবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল ইংরেজ ও তার তাঁবেদার কতকগুলি ভারতীয় সৈন্যবিভাগের ওপর-ওয়ালা কর্মচারী; কিন্তু ঐ তিন হাজার কোটি টাকার সামান্যতম অংশ বিলাশ বহুল রাজকার্যের নামে এবং বিপুল অপচয়ের ফাঁকে হতভাগ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের বাকি বেতন ও পেনশন দিলে স্বাধীন ভারত সরকার কি দেউলিয়া হয়ে যেত?

সকল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর পেনশন থাকল অব্যাহত। যারা আজাদী সৈনিকদের গুলি করে মেরেছিল, তাদের চাকুরি রইল, এবং পদোন্নতিও হল; দেশভক্ত ভারতবাসী যে-সব পুলিশের হাতে মল আর অকথ্য অত্যাচারে জীবন্মৃত হয়ে থাকল, তারা সকলের আগে বীরত্ব ও দেশভক্তির শিরোপা পেল। আর তারা?—থাক্।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নতুন নাম দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ দ্বীপ বা নেতাজি দ্বীপ নয়,—একান্ত উদার ও অর্থবহ দুটি নাম; স্বরাজ ও শহিদ দ্বীপ। হায়রে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা! নবতম ভারত-ইতিহাস-স্রষ্টা নেতাজির দেয়া সামান্য দুটি নাম জহরলাল নেহেরু গঠিত ভারত-সরকার অনুমোদন করবার অবকাশ পেল না।

বহুকষ্টে ও অনন্যোপায় হয়ে 'জাতির জনক' বা 'ফাদার অব দি নেশন' কথাটা গলাধকরণ ওরা করেছে। করেছে এই কারণে যে, ওরই মতো আর একটা কথা বলবার মতো মগজ নেই বলে।

সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত প্ল্যানিং কমিটিই-যে আজকের প্ল্যানিং কমিশন, এ-কথাটাই-বা কে মনে রেখেছে? তারপর অশোক চক্র: ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত পতাকা-বেদী অনুরঞ্জিত হয়েছিল অশোক-চক্র দিয়ে। এবং আজকের অশোক-চক্রের বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম নেতাজির মনেই উদয় হয়েছিল,—কেউ কি আর বলবে সে-কথা?

২০ বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষ একটা জাতীয় সম্ভাষণ জন্ম দিতে পারেনি। পারেনি একটা সিংহনাদ বা শ্লোগান তৈরী করতে। নেতাজির 'জয়হিন্দ' ওরা মাঝে-মধ্যে বলে, কিন্তু বলে ঢোক গিলে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ অচ্ছুৎ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ অচল। তবে কি আজও চলবে হিপ্‌, হিপ্‌, হুররে?

অথচ কর্মক্ষেত্রে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজির মনে একথা জেগেছিল যে, প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই নিজস্ব শ্লোগান থাকে। যার থাকে না, সে দুর্ভাগা। শ্লোগান খুঁজে পেতে কুড়ি বছর নেতাজিকে অপেক্ষা করতে হয়নি।

কেউ কেউ বলে, জহরলাল নেহেরুর সব চাইতে বড় অবদান তাঁর নিরপেক্ষ নীতি। (Policy of non-alignment) একবার কমিউনিস্ট, পরক্ষণে সোস্যালিষ্ট হবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে জহরলাল খেপে উঠতেন। হননি ধনী সমর্থকদের ভয়ে। আর মস্তিষ্কহীন দলের চাপে। কিন্তু একমাত্র নেতাজিই স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, আগে-ভাগে কোন বিশেষ মতের বা বাদের কাছে মাথা বিকোনো চলবে না। সব দেশের যা ভালো, সব মতের যা শ্রেয়, সর্বোপরি ভারতবর্ষের পক্ষে যা হবে কল্যাণকর, তাই হবে জাতীয় মত ও পথ।

নিরপেক্ষ নীতির এ-ছাড়া আর কোন্ যথার্থ ব্যাখ্যা আছে?

গান্ধীর অতুল্য তপস্যা, সীমাহীন সাধনা ও অগাধ ত্যাগ সত্ত্বেও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে জহরলাল নেহেরু এবং তাঁর তৎকালীন অনুবর্তীরা গান্ধীকে নেতৃত্বচ্যুত করে ভারতবর্ষের শাসক হয়ে বসেছিলেন মুরুব্বি মাউণ্টব্যাটে্‌ন্‌-এর প্রসাদে;—সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক তুলনাহীন ট্র্যাজেডি। অনুবর্তী সেজে প্রবর্তকের আসন কেড়ে নেবার সাক্ষ্য ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকের চরম মুহূর্ত সেইটুকু, যেখানে গান্ধীর ভূতপূর্ব ভক্তরা তাঁর নামের জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁর কথা অমান্য করেছে এবং করে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছে উল্লসিত হয়ে।

গান্ধী দেশকে খণ্ডিত দেখবার পূর্বে মরতে চেয়েছিলেন। ওঁর ভক্তরা জোর করে বাপুজির মৌন সম্মতি আদায় করে দেশকে টুকুরো করে দিল। কিন্তু গান্ধীর মরা হল না। গান্ধীর জীবিতকালে ঘটল কাশ্মীর আর

হায়দারাবাদের সংঘাত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য গোপন ইস্তাহার বিলি করা যিনি মনে করতেন পাপ, হিটলার ও চেম্বারলেনকে যিনি যুদ্ধ পরিহার করে অহিংস হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন,—সেই গান্ধী নিজের মতবাদ অনুযায়ী না পারলেন পাকিস্তান বা হায়দারাবাদের সামনে বুক খুলে দাঁড়াতে, না থামাতে পারলেন তাঁর ভক্তদের। বহু আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু-মুসলমান-মিলনের এক রক্তাক্ত উপসংহারের দিকে গান্ধীর বোবা দৃষ্টি শুধু অসহায় হয়ে চেয়েই রইল।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের সোচ্চার ঘোষণা, জহরলাল নেহেরু বর্তমান ভারতবর্ষের রূপকার। কোন্ ভারতবর্ষের? কালোবাজারী, মুনাফা-, লুঠেরা, ভেজাল ও ঘুঁষের পারদর্শী ভারতের?

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে যে-ভারত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের এক নিরবচ্ছিন্ন পরিচয় অমর করে রাখল, সেই ভারতের?

অফুরন্ত সুযোগ ও সুবিধা পেয়েও আত্মহারা হয়ে যে-ভারত বিলাসিতা ও অপব্যয়ের সীমাহীন অপদার্থতা প্রমাণ ও প্রচার করে একান্ত প্রয়োজনীয় দেশ-রক্ষার কথা ভুলে গেল, সেই ভারতের?

সত্যাগ্রহী কংগ্রেস দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে প্রচার করে চলেছে যে, গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে স্বাধীনতা সম্ভবপর হয়েছে। গান্ধী স্বরাজ লাভের তিনটি উপায় নির্দেশ দিয়েছিলেন: অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু মুসলমানের মিলন, আর চরকার প্রচলন। ১৯৪৭ পর্যন্ত এর কটা পূর্ণ হয়েছিল? একটাও কি হয়েছিল?

তারপর ১৯৪২। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ অনেক দূরে। নিশ্চিন্ত বিশ্ব-সমর বিজয়ী ইংরেজ শুধু শুধু ভয় পেয়ে ভারত থেকে পালিয়ে গেল?

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যার সূচনা, শত শত আত্মবলিদানে যার প্রতিষ্ঠা, অজ্ঞাত ও অখ্যাত শত আত্মাহুতি যাকে দিল প্রাণ ও ধর্ম,—সর্বোপরি আগুনঝরা খড়্গের শেষ অব্যর্থ আঘাতে রাহু-মুক্ত সূর্যের মতো যা উঠল মূর্ত হয়ে ফুটে, সে সবই হয়ে রইল উপকথা? গল্প? অলীক?

ইম্ফল রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ জিতেছিল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে আরও একটি সিদ্ধান্ত লুকিয়ে ছিল, এ-কথা সেদিন কংগ্রেস বোঝেনি। ইংরেজ ভাবেনি। ১৯৪৫-৪৬-এর সমসাময়িক ভারতীয়

রণক্ষেত্রে ইংরেজ পরাভূত হয়ে ভারত ছেড়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করেছিল, এ-সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক ফরমাইসি ইতিহাসের ঘোষণা নয়,—চিরন্তন ইতিহাসের সাক্ষর। (ওঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন : The story of the Indian National Army, formed in Burma and Malaya evoked an astonishing enthusiasm.—ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া) [It looked as though the Indian National Army (I. N. A) itself eclipsed the Indian National Congress and the exploits of war and violence abroad threw into obscurity the victries of Non-violence at home.—সীতারামাইয়া]

ইংরেজ সুভাষ বোসের ভয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এ-তথ্য ঐতিহাসিক। ইংরেজ জানত যে, তার প্রিয় ও বিশ্বস্ত জহরলাল নেহেরুর ওপর নির্ভর করা তার স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ। তাই সে শাস্ত্রবানী 'অর্দ্ধং ত্যজতি' স্বীকার করে ভারত ছেড়ে যেতে রাজী হয়েছিল। এবং এ-কথাও তার অজানা ছিল না যে, না গেলে ভারতব্যাপী বিদ্রোহানল তাকে পুরিয়ে খাক করে দেবে। (বিদেশী লেখকের কাছে ইংরেজের এই মনস্তত্ত্ব অবিদিত নেই। 'লাষ্ট ইয়ারস অব বৃটিশ ইণ্ডিয়ার' ইংরেজ লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস্ লিখেছেন : ...বৃটিশ রাজত্বের শেষ চার বৎসর প্রতিটি কন্‌ফারেন্‌স্-এর বৈঠকে ইংরেজ সুভাষ বোসের ছায়া-মূর্তি দেখেছে।)

কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আর গান্ধীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। গান্ধীর চাইতেও গান্ধীর মতবাদ শ্রেষ্ঠতর। প্রতিদিন তাকে হত্যা করে চলেছে গান্ধীর ভক্তরা। জহরলাল নেহেরু ছাই হয়ে গেছেন বহুদিন আগে। কিন্তু বর্তমান ও অনাগত কালের যে-কোন মুহূর্তে নেতাজি একা সহস্র হয়ে জাতির মনোমুকুরে উদ্ভাসিত হয়ে বেঁচে থাকবেন চিরদিন।

আত্মবলিদানের প্রয়োজনীয়তা যেদিন আর যখনি অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে,—আর কারও কথা জাতির মনে জাগবে না। জাগবে শুধু ঐ একটি মাত্র অমিতবীর্য পুরুষ প্রধানের নাম, যে কোনদিন মাথা নোয়াল না, হার মানল না, আপোস করতে রাজী হল না।

এই কথা-কটি বলবার জন্যই 'নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' লিখতে শুরু

করেছিলাম। ঘটনার চাপে নেতাজি-আলেখ্য আবৃত করবার চেষ্টা আমি করিনি। মানুষ নেতাজিকে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার ভিড় ঠেলে বের করতে চেষ্টা করেছি।

আমার দেখা অপূর্ণ। জানাও অনধিক। ঐ বিরাট ব্যক্তির কথা কারও পক্ষেই একা লেখা সম্ভবপর নয়। সে চেষ্টাও আমি করিনি। যোগ্যতারও অভাব। তবুও আমার ধ্যানে ফুটে-ওঠা নেতাজির রূপ আঁকতে চেয়েছি।

নেতাজিকে জানতেন, আজও, তেমন লোকের অভাব নেই। তাঁরা সবাই যদি তাঁদের জানা নেতাজির কথা লিখে যান, ভবিষ্যতে পূর্ণ নেতাজি রূপ ফুটে উঠবে।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া ও ইওরোপের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর কথায়। কোনদিন সে-তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে কিনা জানিনে। তাঁর সঙ্গে ঐ সব ক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেকে আজও জীবিত। তাই, সবটা না হলেও খানিকটা হয়তো সংগ্রহ করা আজও সম্ভব। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত।

জার্মেনীতে থাকাকালে নেতাজি-জীবনের আখ্যায়িকার জন্য নেতাজি-সাথী এন. জি. গণপুলের 'নেতাজি ইন জার্মেনী' বই-এর সাহায্য নিয়েছি সর্বাধিক। এবং দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার কথার জন্য বেশি নির্ভর করতে হয়েছে অন্যতম প্রধান নেতাজি-সঙ্গী এস. এ. আয়ারের 'আন্ টু হিম এ উইট্‌নেস্'-এর ওপর।

প্রথম খণ্ডে বলেছি, আবারও বলব, স্নেহভাজন ডাঃ শিশির বোসের সাহায্য পেয়েছি অঢেল। তাঁরই সহায়তায় নেতাজির প্রথম ছবিখানি সহজলভ্য হল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর আন্তরিকতা স্বীকার না করে আমার উপায় নেই।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান দীপঙ্কর ও কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান তীর্থঙ্কর 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গের' প্রকাশনে অশেষ যত্ন নিয়েছেন। নেতাজি এঁদের নিত্যদিনের পূজো-বিগ্রহ। জয়হিন্দ।

হরিধাম
৪৭, নিউ বালিগঞ্জ রোড,
কলিকাতা - ৩৯
দোল পূর্ণিমা, ১৩৭৩।

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী

নেতাজি।

একটি নাম। শোনা মাত্র

মুগ্ধ হয়ে যায় দেহ আর মন।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর দেশ প্রেম।

সকল কর্মে জ্বলন্ত তাঁর অমিত বীর্য।

নেতাজি।

একটি জীবন। ভয়ঙ্কর অভিযানে নিঃশঙ্ক।

উপকথার বিচিত্রতায় মুখর।

অতুল্য তাঁর নির্ভীতি সৃষ্টি করেছে নব ভারতের

নতুন সৈনিক।

চোখে দিয়েছে স্বপ্নের কাজল।

খুলে দিয়েছে আদর্শের নব দিগন্ত।

সমগ্র জীবন দিয়ে

আর কে করলো অমন করে দেশ মাতৃকার পূজো ?

নেতাজির জীবন আর তাঁর স্নেহের দুলাল

আজাদ হিন্দ ফৌজ

এনেছে বলিদানের প্রেরণা।

সকল পার্থক্য ও অনৈক্যের উর্ধ্বে তাঁর বিগ্রহ রূপ।

জাতিকে দিয়েছেন দীক্ষা। দিয়েছেন শৃঙ্খলার নবতম ব্যঞ্জনা।

সমগ্র জাতি অবনত হয়ে

গ্রহণ করুক এই অভিনব শিক্ষা।

ধন্য হয়ে উঠুক তাঁর প্রতি সমবেত প্রেম।

দেশ আবার সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াক

জগৎ সভায়।

—জাতির জনক গান্ধী

নেতাজির অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি



অজানার পথে সাইগন থেকে যাত্রার পূর্বক্ষণে তোলা ঃ
১৭ই আগস্ট, ১৯৪৫

আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভার
উপদেষ্টা শ্রীদেবনাথ দাশের সৌজন্যে

॥ এক ॥

যাত্রা হল শুরু।

বাতাস ছোটেনি। তুফান ওঠেনি। কিন্তু দেরিও নেই।

ছুটবে। উঠবেও। ছুটবে ঝড়। উঠবে তুফান।

সাঁ করে গাড়ি বেরিয়ে যায় এলগিন রোডের বুকে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় পশ্চিমে। তারপর দক্ষিণে। শত্রুর সজাগ চক্ষু পেছনে। সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করে সন্ধানী-দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। তাড়া করে আসবে না তো?

গাড়ি ছুটে চলে নক্ষত্র বেগে। সুপ্ত কলকাতার রাজপথ। গভীর রাত্রির রাজপথ। পিচ্ছিল। পাণ্ডুর আলো ওর বুকে। জনহীন।

গাড়ি এসে পড়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে।

আস্‌ফাল্‌ট্‌-মোড়া প্রশস্ত রাজপথ। কালো। দু'পাশে গাছের সারি। পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো। ঠিকরে পড়ে পাথুরে বুকে।

বোবা রাজপথ। বুক বোঝাই সহস্র কথা। ইতিহাস হেঁটে গেছে বার বার ওর বুকের ওপর দিয়ে। রেখে গেছে পায়ের ছোপ।

শের সাহের তৈরী রাজপথ। তিনিও এই পথে গিয়েছিলেন দিল্লী। ছিনিয়ে নিয়েছিলেন রাজদণ্ড। বিদ্রোহী শের সাহ্‌।

গাড়ি চালান শিশির। শরৎ বোসের ছেলে শিশির বোস।

পাশে?

ভারতবর্ষের নবতম ইতিহাস স্রষ্টা।

সুভাষ।

রাঙ্গা কাকাবাবু। সমস্ত সংসারটি তাকিয়ে থাকে ঐ একটি মানুষের দিকে। হাঁক নেই। নেই কোন ডাকও। তবুও সবাই কান উঁচিয়ে থাকে।

রহস্যের দুর্ভেদ্য বর্মে-ঢাকা এই মানুষটি আত্মীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তা'ছাড়া? ভাই-বোন-কাকা-ছেলে, আরও কতই-না সম্পর্কের গাঁটছড়া, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও কী একটা দুর্বোধ্য প্রশ্নের কুহেলীতে মানুষটি ঢাকা। চেনা যায় না। বুঝেও মনে হয় দুর্জ্ঞেয়। কেন হয়?

সেই রাঙ্গা কাকাবাবু পাশে বসে। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বছরের জীবন নিমিষে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল জীর্ণ বস্ত্রের মতো। বাসাংসি জীর্ণানি,···নতুন পথ। নতুন যাত্রা। জীবন? তাও নতুন। নির্মোকমুক্ত নব কলেবর। এ জীবন শুধু আত্মীয়ের জীবন নয়। কাকাও নয়। আরও কিছু। অন্য কিছু।

তাই তো দ্বিধা। তাই তো এতো শঙ্কা। যদি কিছু ঘটে? শত্রু যদি টের পায়?

মাথার ওপর দুর্দান্ত ইংরেজের রক্তাক্ত হিংস্র খড়্গ। শির শির করে ওঠে সারা দেহ।

একসেলেরেটারের ওপর পা চেপে বসে। জোরে। আরো জোরে।

চোখের ওপর ভেসে ওঠে দেশ, জাতি। যদি কিছু হয়? যদি ধরা পড়ে যান?···

নির্বিকার মানুষটি পাশে বসে।

কী ভাবছেন?

ঢলে পড়েছে পরিপাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমে। পাতলা কুয়াশা চারদিকে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে।

জীবনের বড় একটা অধ্যায় শেষ। সাঙ্গ আমার ধুলো খেলা। সেদিনের খেলা-ঘরের বর হয়তো কনের পাশে বসে ভেবেছিল সেই খেলাটিকেই সত্যি বলে। আবছা, অস্পষ্ট, অবচেতন শিহরণ কি ছিল দেহে? আর মনেও? হয়তো ছিল, হয়তো ছিলই না। শুধুই ছিল খেলা। কিন্তু তারই রেশ আর সূত্র ধরে যে অপার্থিব দিনটি এল জীবনের মহাসত্যের রূপে, তার স্বরূপ কি জানা?

না।

বাস্তব আর কল্পনার বিচিত্র ও বিরাট আচ্ছাদনে মোড়া ওর অবয়ব। চেনা নেই। জানাও নেই। তবু আকর্ষণের অন্ত নেই। দুর্নিবার ওর ডাক।

তাইতো সবই মনে হল মিথ্যে। জীবন, ঘর, আত্মীয়তা, নাম, যশ, খ্যাতি, ভবিষ্যৎ, সব।

ছিন্ন মেঘের ফাঁক বেয়ে রুদ্রের ডাক এল। এল হাতছানি।

কিন্তু হবে তো? কে জানে? কেউ কি জেনেছে?

সামনে গোবিন্দপুর না? গাড়ির গতি মৃদু হয়। গোবিন্দপুর পাশে রেখে গাড়ি চলে ধানবাদের পথে। বাঁয়ে। দেখা যায় বারারি। অশোকের বাংলো অদূরে। শরৎ বোসের বড় ছেলে ডঃ অশোক বোস।

নেতা নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। শিশির গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যান একা। গাড়িতে থাকল বিছানা আর স্যুটকেস। সঙ্গে নিলেন শুধু এটাচি কেসটা।

কেউ কাউকে চেনেই না। মৌলবীসাহেব হেঁটে চলেছেন একা। অজানা স্থান। তার বাড়া অজানা এখানকার মানুষ। নবাগতের ভঙ্গী দেহে আর দৃষ্টিতে। চোখ ঘুরতে থাকতে দু'পাশে। তারপর গতি এসে থামে অশোক সাহেবের বাংলোর সামনে।

ইনশিওরেনস্-এর এজেন্ট মৌলবীসাহেব সুপ্রভাত জানিয়ে করমর্দন করেন ডঃ অশোক বোসের সঙ্গে। ডঃ বোস ধানবাদের বড় অফিসার।

সত্যি সত্যি গল্প মনে হয়। উপকথা। উপকথার রাজপুত্র চলেছেন দিগ্‌বিজয়ে।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই অশোককে জানানো হয়েছিল যে, নেতা নির্দিষ্ট দিনে ওখানে যাবেন। আর এ-কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, কথাটি যেন আর কেউ না জানে।

সকাল বেলা। ১৮ই জানুয়ারির (১৯৪১) প্রত্যুষ। ৭টাও

বাজেনি। প্রথম পৌঁছোল এসে শিশিরের গাড়ি। ১৫ মিনিট পর এলেন নেতা। ধীর পায়ে হেঁটে আসছেন মৌলবীসাহেব।

অচেনা অজানা লোক। থাকবার স্থান হল বাইরের ঘরে। পরিচয় দেয়া হল বাড়ির কর্ত্রী ও ভৃত্যদের কাছে ইনশিওরেন্স্-এর এজেন্ট বলে।

বাইরের অতিথি, ভৃত্যের হাতে প্রাতরাশ গেল। গেল চা। মামুলি দু'চারটি কথা বলে এবং আপ্যায়ন করে গৃহস্বামী চলে যান কর্মস্থলে। মৌলবীসাহেব ঘরে বসে থাকেন একা।

নিখুঁত পরিপাটি দেহের সজ্জা। শেরওয়ানি ও ফেজ-এ, ছাঁটা গোঁফ আর ছুঁচালো দাড়িতে মানিয়েছে অপূর্ব।

মৌলবীসাহেব ডঃ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজীতে। ভৃত্যেরা বোঝে না, তবুও তাকিয়ে থাকে মৌলবীসাহেবের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। টিফিনের ছুটি হয়। অশোক ফিরে আসেন বাংলোতে। দুটি-একটি কথা হয়। মধ্যাহ্নের খাবার আসে মৌলবীসাহেবের ঘরে। অজানা অতিথি, তাতে ভিন্ন ধর্মীয়, এক সঙ্গে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কথা শেষ হয় না। এজেন্ট আরও কথা বোঝাতে চান বোস সাহেবকে। (সন্ধ্যা বেলায় গাড়ি। থাকতে হবে সেই পর্যন্ত,—তাই।) হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে অশোক বলে ওঠেন: "অফিসের পর আবার কথা হবে, কেমন?"

"কিন্তু সন্ধ্যার ট্রেন আমাকে ধরতেই হবে।" বলেন মৌলবীসাহেব।

"ঠিক আছে।" বলেই বেরিয়ে যান অশোক।

সন্ধ্যা নেমে আসে ধীর পায়ে। মৌলবীসাহেব তৈরী হন। বাজে ৭টা ৩০ মিনিট। খাবার দেয়া হয়। খুব সামান্য খেয়ে ওঠে পড়েন মৌলবীসাহেব।

ট্রেন ধরতে হবে। গৃহস্বামী ভৃত্যকে ট্যাক্সি ডাকতে বলেন। মৌলবীসাহেব ধন্যবাদ জানিয়ে বলে ওঠেন: "দরকার হবে না। পথে আমি ট্যাক্সি ডেকে নেবো।"

বেরিয়ে পড়েন মৌলবীসাহেব।

"পিছু পিছু আমারাও। শিশির, আমার স্ত্রী আর আমি। শিশিরের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সান্ধ্য ভ্রমণ। ভৃত্যদের তাই বলা হলো।" বলে চলেছেন অশোক।

আজ,—দীর্ঘদিন পর আর বর্তমান পরিবেশে এ-কথা ভাবা আর লেখা খুবই সহজ। কিন্তু সেদিন এমন সহজ ছিল না। প্রাণপ্রিয় রাঙ্গা কাকাবাবুর জীবনের প্রশ্নই সেদিন শুধু ছিল না, ছিল তাঁর লক্ষ্যও। ছিল তাঁর জীবনের মহাব্রত। তারপর ছিল পারিবারিক নিরাপত্তার কথা।

ক্ষুরধার পথ। সঙ্কীর্ণ। বিপদ-সঙ্কুল। একচুল এদিক-ওদিক হলে নিঃশেষ হয়ে যাবেন শরৎ বোস। যাবেন অশোক। যাবেন শিশির। যাবে সমগ্র পরিবার।

কিন্তু সেই মুহূর্তে হয়তো এ-সব কোন কথাই মনে ওঠেনি। উঠেছে মাত্র একটি কথা: এই মহাজীবন নির্বিঘ্নে ঈপ্সিত পথে যেতে পারবে তো?

এমন আকুল হয়ে অশোক ও শিশির কি জীবনে আর কোন দিন প্রার্থনা করেছেন? ডেকেছেন তাঁদের দেবতাকে?

এগিয়ে যায় গাড়ি। চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন মৌলবীসাহেব। গাড়ির গতি মৃদু হয়। ত্রস্ত পায়ে গাড়িতে চড়ে বসেন মৌলবী-সাহেব।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে যান অশোকের স্ত্রী। রাঙ্গা কাকাবাবু!

দিল্লী-কালকা মেল ধরতে হবে। গাড়ি ছুটে চলে গোমো স্টেশনের দিকে। স্টেশনের অনতিদূরে গাড়ি থামে। নেমে পড়েন মৌলবী-সাহেব।

সবাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। স্নেহ ঝরে পড়ে দৃষ্টির কোণ বেয়ে। আর?

না, চোখের জল দেখা যায়নি।

খুব আস্তে বলেছিলেন: "আমি চলি, তোমরা ফিরে যাও।"

শিশিরের হাতে একটা গান্ধী-টুপি দিয়ে বলেছিলেন: "ফেরবার পথে টুপিটা পরে নিয়ো।"

"আমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। নেতাজি টিকিট কিনতে গেলেন। টিকিট কিনে চলে গেলেন প্ল্যাটফরমে। ট্রেন এসে পড়লো তখুনি। গাড়ি ছেড়ে দিল।" শেষ করলেন অশোক। (১)

ওঁরা কি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সারা রাত?

ঘরে ফিরলেন কেমন করে?

চোখের জল পড়া কি শেষ হয়েছে?

আবাদ খাঁ। সামান্য একজন মোটর ড্রাইভার। পিরপাই গ্রামের অধিবাসী। পেশোয়ার জেলার নামজাদা তহশীল নৌশেরা। সেই নৌশেরার অন্তর্গত পিরপাই।

আকবর শা' খুঁজে বের করেছিলেন এই আবাদ খাঁকে। সাধু নন এবং সন্ত তো ননই। নেহাইতই গ্রামের মানুষ। তাঁর সঙ্গে ছিল বাড়তি আরও কিছু কিছু উপকরণ। সহরের যাতায়াত আর মোটরের সংস্পর্শ মোটেই অকলঙ্ক রাখেনি মানুষটিকে। অন্তত পুলিশের খাতায় সুনাম একটু গাঢ়ই ছিল।

সেই আবাদ খাঁ এসে দাঁড়ালেন নৌশেরা জংশনে। সেলাম ঠুকে তুলে নিলেন নেতাকে নিজের লরিতে। লরি-ড্রাইভার আবাদ খাঁ সুপরিচিত ব্যক্তি। লোকের কাছে, আবার পুলিশের কাছেও। খাতিরও তাঁর খুব সামান্য নয়। আবাদ খাঁর লরি ছুটতে থাকে। নৌশেরা থেকে সোজা পেশোয়ার।

আবাদ খাঁর কাছে সংকেত ছিল। নিঃসন্দেহে নেতা চড়ে বসলেন লরিতে। পেশোয়ার পৌঁছোলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে।

রাত কাটাতে হবে পেশোয়ারে। যুদ্ধের বাজার। উত্তপ্ত

(১) ডঃ অশোক ঘোস ও ডাঃ শিশির ঘোসের বিবৃতি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। অদূরে খাইবার পাশ। যুগে যুগে বিদেশী এসেছে এই পথে ভারতের বুকে।

স্থায়ী প্রহরী উত্তুঙ্গ পর্বতমালা কোন যুগে বাধা দিতে পারেনি। বাধা দেয়ওনি। সজাগ ইংরেজ ইতিহাসের ইঙ্গিত ভোলেনি। দুর্বার করে তুলেছে, তাই, সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার সজাগ প্রহরী। সশস্ত্র সান্ত্রী ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে। রাত্রির অন্ধকার শত্রুর প্রিয়। চৌকিতে জাগে চৌকিদার।

সহরের একপ্রান্তে আজাদ মুসাফিরখানা। সরাই। আফগানিস্তান আর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসে যাত্রী। আসে আরও দূর থেকে। আসে খচ্চরের পিঠে। সওদা আনে ভিন্ দেশ থেকে। রাত কাটায় সরাইখানায়।

সরাইখানায় মানুষ আর জানোয়ার থাকে পাশাপাশি। নোংরা। জানোয়ার আর মানুষের পুরীষে আর নানা ময়লায় সমাকীর্ণ।

আবাদ সন্তর্পণে নেতাকে নিয়ে আসেন সরাইখানায়। অদূরে থানা। পুলিশের আনাগোনা দেখা যায়। শোনা যায় ওদের বুটের আওয়াজ আর হাঁক-ডাক।

যাত্রীদের অনেকেই আবাদের চেনা ও জানা। ওখানকার সবাই নিচের তলার লোক। দরিদ্র। শিক্ষাহীন। বার বার ওরা যাতায়াত করে এই পথে। রাত্রি কাটায়। জুয়া খেলে। দারুও পিয়ে নেয় আলাপচারির ফাঁকে ফাঁকে। আবার চলে যায়।

কম্বল বিছিয়ে দেন আবাদ খাঁ। ভাই তো। তাতে আবার অসুস্থ। যেতে হবে অনেক দূরে। ফকিরের আস্তানায়। দরগায়। মানত আছে। স্বল্পালোকে কম্বলে মুখ ঢেকে নেতা শুয়ে পড়েন।

ভোর বেলা লরি ছাড়ে। সামনে সবকদর। পেশোয়ার জেলার শেষ ঘাঁটি। পেশোয়ার থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। এর পরই মোমান্দ্ অঞ্চল। পাহাড়ীদের সীমান্ত। ইংরেজ প্রভাব শূন্য স্বাধীন

মোমান্দ্‌দের নিজ নিকেতন। সবকদরে ইংরেজের পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিল।

খাইবারের দিকে ওদের নজর কড়া। অদূরে আফগানিস্তানের সীমানা। ওটা ছাড়ালেই রাশিয়া। রাশিয়া ভিড়েছে হিটলারের দলে। বিশ্বাস করবার অবকাশ কোথায়? তা'ছাড়া কাবুল। সবদেশের গোয়েন্দা আর গুপ্তচরে বোঝাই। ইংরেজ চুপ করে থাকবে কোন্ ভরসায়?

দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে নেতা হয়ে গেলেন বোবা আর কালা। স্যুটকেসেই ছিল পাঠানের পোষাক। অন্ধকার থাকতেই অঙ্গে উঠল সেই পোষাক। পুরোদস্তুর পাঠান। পালটে গেল নাম। জিয়াউদ্দিন বেরিয়ে এলেন সরাইখানা থেকে। আবাদ খাঁর দায়িত্ব শেষ। ভার নিতে এগিয়ে এলেন রহমৎ খাঁ, ওরফে ভকৎরাম।

আবাদ খাঁ। হিন্দুস্থানের নন, পাকিস্তানেরও নন। ভারতবর্ষের আবাদ খাঁ। জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া আবাদ খাঁ। ইতিহাস মনে রাখেনি আবাদ খাঁকে। মনে রাখেনি দেশবাসী। আর ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীন সরকার।

আবাদ খাঁ ধরা পড়েছিলেন মাসখানেকের মাথায়। অসহ্য অত্যাচার হয়েছিল আবাদের ওপর। মারের চোটে অচেতন হয়ে পড়েছেন বার বার। একটি কথাও বের করা যায়নি আবাদের মুখ থেকে।

"আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে-দৃশ্য। গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে আবাদ। গলার ভেতর থেকে বেরুচ্ছিল একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ। বিরামহীন প্রহার চলেছে সমানে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে চলেছেন আবাদ: 'বোলবো না, বোলবো না আমি'।" শেষ করলেন পেনশন-ভোগী ভূতপূর্ব পুলিশ অফিসার। (১)

(১) উত্তর-ভারতের এক সহরে দেখা হয় এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ১৯৬২তে। আবাদের কাহিনী শুনি এঁর নিজের মুখে। ভদ্রলোক সীমান্ত পুলিশ-বাহিনীতে চাকুরী করতেন। চাক্ষুস দেখছেন সব।

১৯৪৬-এর প্রথম দিকে আবাদ মুক্ত হন কারাগার থেকে। আবাদের মোকদ্দমা তদ্‌বির করেছিলেন স্পেশাল পুলিশ-সুপার খাঁ বাহাদুর আতাউল্লা জান এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের সি, আই, ডি, সুপার রায়বাহাদুর দ্বারকানাথ।

পুরো দুটো দিনও আবাদ সুভাষচন্দ্রকে কাছে পায়নি। একান্তই পথের সাথী। ক্ষণিকের দোস্ত্। এ কোন্ সর্বনাশা স্পর্শ যা পেয়ে আবাদ মুহূর্তে হলেন রূপান্তরিত? মৃত্যুঞ্জয়ী এই কি সেই অমৃত অবিনশ্বর ছোঁয়াচ, যা এনে দেয় সুদুর্লভ দেবত্ব মানুষের মনে আর দেহে?

১৭ই থেকে ২৬শে জানুয়ারি, মোট ন'দিন। নিখুঁত অভিনয় করতে হয়েছিল এই ন'দিন ধরে। ঘরে নেতা থাকতে যেমন করে খাবার দেয়া হত, হত ঝাড়-মোছা, ঠিক তেমনি চলতে লাগল। বাড়ির ছেলেরা এক-একদিন এক-একজন পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকত। খাবার টেনে নিয়ে খেয়ে যেমন করে নেতা পাত্র ও ভুক্তাবশিষ্ট রেখে দিতেন বাইরে, তেমনি করে রেখে দিত।

চোখের জলের তো বিরাম ছিল না। তবু সবলে তা চেপে মাজননী কথা কইতেন। হাসতেও হত, আবার খেতেও। ভেতরটা দুমড়ে যেতে কি বাকি ছিল? ব্যবস্থা মতো শরৎবাবু চলে যান রিষড়া। ছোট একটা বাগানবাড়ি, গঙ্গায় স্নানের জন্য আর বিশ্রামের জন্য কিছুদিন আগে কিনেছিলেন। মামলার দিন ২৭শে জানুয়ারি, সে দিন সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তার জন্য তৈরী না হয়ে উপায় ছিল না।

২৬শেই প্রকাশ করতে হল। বিকেল বেলা। একটা কিছু উপলক্ষ্য করে দরজা খুলে অকস্মাৎ জানা গেল যে, সুভাষচন্দ্র ঘরে নেই। কোথায় গেলেন? পড়ে গেল হুলুস্থুলু। টেলিফোনের পর টেলিফোন চলতে লাগল। এখানে, ওখানে, সম্ভবপর সব স্থানে।

ছুটে এলেন শরৎবাবু। কলকাতার নামজাদাদের কাছে টেলিফোনে

রহমৎ খাঁর ভাই। সাক্ষাৎ সোদর। জন্ম থেকে বোবা আর কালা। পীরের থানে মানত আছে। পীর সাহেবের দোয়ায় যদি ভাইটার একটা হিল্লে হয়ে যায়। নসিব। খুদাতাল্লার মর্জি।

জানুয়ারি মাস। তুষারের স্তূপ জমেছে পথে পথে। হাড় কাঁপুনি শীতে জমে আসে রক্ত। বেঁকে যায় হাত পা। ভ্রূক্ষেপহীন ভারত-পথিক ছুটে চলেছেন কাবুল নদীর প্রান্ত ঘেঁসে।

ওঁৎ পেতে বসে আছে পাহাড়ী মোমান্দ্। প্রকৃতির অবুঝ পোষ-না-মানা দুর্দ্ধর্ষ সন্তান। শত চেষ্টায় ইংরেজ বাগ মানাতে পারেনি। লোভ আর লালসা অগ্রাহ্য করে চায় শুধু স্বাধীনতা। অব্যর্থ লক্ষ্য ওদের। কে জানে কী ওরা মনে করে বসবে। যদি ভাবে ইংরেজের কেউ, হাতের রাইফেলটা শুধু গর্জে উঠবে। লুটিয়ে পড়বে শিকার।

লালপুরও এল। এবার কাবুল। বেশি দূরে নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই স্থান পেলেন জিয়াউদ্দীন উত্তম চাঁদ মালহোত্রের গৃহে। কাবুল পৌঁছোলেন ২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১।

পেশোয়ার থেকে কাবুলের পথে এবং কাবুলেও আপদ-বিপদের অন্ত ছিল না। আশঙ্কা ছিল ততোধিক। ইংরেজের গোয়েন্দা, কাবুলের পুলিশ,—তারপর পথের গুণ্ডা। সমভাবে এবং একসঙ্গে পিছু নিয়েছিল। নিয়েছিল সঙ্গের অর্থ ও ঘড়ি। নিতে চেয়েছিল গারদখানায়। পারেনি। তার পূর্বেই জিয়াউদ্দীন পেয়ে গেলেন মালহোত্রকে।

এ-সবের মধ্যেও ছিল প্রচণ্ড চাঞ্চল্য। রোমাঞ্চ ও নব নব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও কি কম ছিল? তুলনায় উত্তমচাঁদের গৃহ নিশ্চয়ই নিরাপদ। এবং একটি অনুরক্ত মানুষের অফুরন্ত পরিচর্যা ঘিরেও রেখেছিল অনুক্ষণ। কিন্তু এই নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত পরিবেশ কামনা করে বা এরই জন্য এই মানুষটি এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়ান নি। সহস্রগুণ বেশি হয়ে উঠুক জীবনের দুর্যোগ। শান্তি ও সান্ত্বনার

পথ এ-মানুষের কোনদিনই কি কাম্য ছিল ? মহা অমানিশার গোপন মাতৃপুজোর একমাত্র উপকরণ নিজের বুকের রক্ত। এ-তত্ত্ব ও তথ্যও তো তাঁর অজানা নয়।

প্রাণে জাগে অসহ্য অস্থিরতা। প্রতিটি মুহূর্তের বিফলতা আকুল করে তোলে সর্ব সত্তা। জীবন মনে হয় ব্যর্থ। অভিষ্ট সিদ্ধির পূর্বাহ্নে যদি কিছু ঘটে, যদি অপূর্ণ থেকে যায় ব্রত,—কী নিয়ে জীবন তিনি কাটাবেন ?

সম্বলহীন জীবন। সহায়হীন পথ।

পিছনের অনেকদিনের জীবন ঝরে পুড়ে গেছে। সম্মুখের শূন্যতায় ভরা অজানা ক্ষণ। এই শূন্যতার বুক কোন্ কল্পনার অতীত অপার্থিব প্রাপ্তি ভরে দেবে আকণ্ঠ ?

খুঁজে বের করতে হবে ইংরেজের শত্রু। সে জার্মেনী হোক, ইটালী হোক, আর হোক রাশিয়া। ইংরেজের শত্রুই ভারতবর্ষের মিত্র। একটানা শতবর্ষের দুঃখ আর গ্লানির জীবনে যে আসবে সহানুভূতি আর সাহায্যের উপঢৌকন নিয়ে,—ভারত তাকেই স্বীকার করে নেবে বান্ধব বলে।

শত্রুর শত্রুই মিত্র। সেই অনেকদিনের পুরনো নেপোলিয়নের কথা। তবু এর নতুনত্ব কম নয়। কমেওনি। এই কথায় চার্চিল তাতিয়ে তুললেন তাঁর দেশকে। সুভাষের মুখেও ঐ একই কথা।

লক্ষবার নাকি ঘর-বার করেছিলেন রাধিকা তাঁর প্রিয়তমের জন্ম। কৃষ্ণ প্রেমে ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, জীবনের প্রিয় ও প্রিয়তমা ছেড়ে যৌবনে যোগী হয়ে বিবাগী হলেন নিমাই। তাতেও শান্তি নেই। প্রিয়তমের জন্য শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিলেন সাগরের বুকে।

কৃষ্ণ প্রেম আর দেশ প্রেম। প্রেমই আসল কথা। মেকি নয়, তরল নয়, কৃপণ নয়, মিথ্যা নয়। অকুণ্ঠ। নিখাদ। খাঁটি হেম প্রেম। একই রূপ। একই ধর্ম। একই পরিণাম। সাগরে সুভাষ ঝাঁপ দেননি। কিন্তু সাগর কি এই ক্ষণের এই অজানা সহস্র বিপদ-

সঙ্কুল নির্বান্ধব বিদেশের মায়াহীন ভবিষ্যতের চাইতেও ভয়ঙ্কর ? না তো।

কাটল বুঝি দুঃখের প্রতীক্ষা। এল সেই দিন আর ক্ষণ। সুভাষ আশা পেলেন ইটালীর রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। পেলেন পাশপোর্ট। জিয়াউদ্দীনের নতুন নাম হল অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা। (Orlando Mazotta) ইটালীর বাসিন্দা।

২রা এপ্রিল, ১৯৪১। কাবুল থেকে ইতালীর রাষ্ট্রদূত রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁর গভর্ণমেন্টের কাছে। তার আদ্যন্ত ছিল সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ ও মন্তব্যে ভরা।

তার পূর্বেই মস্কো হয়ে নেতা বার্লিনে পৌঁছে গেছেন। ১৮ই মার্চ কাবুল পরিত্যাগ করে চলে আসেন পাটা-কেসার (Pata Kesar)। অক্সাম নদীর ধারে আফগান সীমান্ত সহর। ওপারে সোভিয়েট রাশিয়া। স্বপ্নের দেশ। নবযুগের তীর্থভূমি।

পাটা-কেসার থেকে ২০শে মার্চ নেতা পৌঁছে যান টারমিজে (Termiz)। টারমিজ থেকে ট্রেনে মস্কো। সঙ্গে ছিলেন একজন জার্মান ইন্‌জিনিয়ার। ডঃ ওয়েলার (Dr. Weller), আফগান সরকারের কর্মচারী। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে পূর্বাপর বিশেষ সংযোগ ছিল ওয়েলারের।

মস্কোতে সোভিয়েট সরকার সরকারীভাবে কোনও সাহায্য সুভাষ-চন্দ্রকে দেননি, সংযোগও রাখেননি। কিন্তু ওঁদের ব্যবহার ছিল একান্তই হৃদ্যতাপূর্ণ। মস্কো থাকা কালে তাঁর সর্ববিধ সাচ্ছন্দ্যের দিকে পরোক্ষ দৃষ্টি ছিল সোভিয়েট সরকারের। রাজনৈতিক কারণ এবং দেশের স্বার্থ সবার ওপরে। এবং সোভিয়েট সরকারের ঠিক সেই সময়ে কিছু করবার উপায় ছিল না এরই জন্য। ভারতবর্ষের আসন্ন বিপ্লব সম্ভাবনায় কিন্তু ওরা পুলকিত না হয়ে পারেন নি। এই মনোভাব খুব বেশি গোপন করতেও ওরা চান নি। ওখানকার জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা

বিভাগের অধিকর্তা এ-কথা জেনে বার্লিনের কর্তৃপক্ষের গোচরে তা এনেছিলেন। (In moscow no official cognizance had been taken of his presence, but the Russians had done everything they could to make his stay there pleasant one. Revolution in India fitted their plans excelently.) (১)

ইংরেজের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের নতুন করে আলোচনা চলছিল এই সময়ে ক্রীপ্‌স্‌-এর মাধ্যমে। হয়তো একথাও সোভিয়েট সরকার ভাবতে চাইছিলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান জার্মান শক্তির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

রাশিয়ার অভিপ্রায় বুঝতে নেতার আদৌ দেরি হয়নি। দুষ্কর তো হয়ইনি। বিশ্ব, পরপদানত দেশ ও তাদের কল্যাণ চিন্তা বড় কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু সবার ওপর সত্য রাশিয়া। 'তাহার উপরে নাই'। ওরা গোপন করে না এ-কথা। ওদের তত্ত্ব ধোঁয়াটেও নয়। আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা ওদের বাস্তব বুদ্ধি ও বিচার শক্তি আবৃত্ত করে রাখে না।

আরও একটি কাজে ওরা পারদর্শী নয়। চালবাজি। কথার ভোজবাজি ওদের রাজনীতির সর্বস্ব নয়। পেশা তো নয়ই।

মস্কো থাকতেই নেতা ওখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূত count von Derschulenburg-এর সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পান। এই ব্যক্তিটি ছিলেন এসিয়ার সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। নেতা জার্মান রাষ্ট্রদূতের সমস্যা বিশ্লেষণের গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। যা চাওয়া যায়, সবটাই কি পাওয়া যায়? চাওয়া আর পাওয়ার এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং পার্থক্য কত রকমেই-না মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর ভুলও বোঝায়।

---

(১) An extract from Nachrichtendieust i.e. the German military Intellingence Service for Far East in charge of Paul Leverkuchn. ('নেতাজি ইন জার্মানী' থেকে উদ্ধৃত)।

কিন্তু নেতাকে বিভ্রান্ত করে নি। ভুলও বোঝায় নি। রাশিয়ার সাহায্য কিম্বা সহায়তা পাবার কামনা তাঁর খুবই প্রবল ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তা পাবার কোন উপায়ও ছিল না।

এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, তাই, তাঁকে বিন্দুমাত্রও হতাশ করেনি। চলার পথে বাধা থাকবেই। বিপত্তি না থাকলেই বা ও-চলার আকর্ষণ কোথায়?

সুভাষ মস্কো থেকে প্লেনে চেপে বসলেন। গন্তব্য স্থান বার্লিন।

বার্লিন পৌছোলেন মার্চ মাসেই। (১৯৪১)

কাবুলের জার্মান রাষ্ট্রদূত আদৌ সুভাষচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এবং তাই জার্মেনীতে তাঁর আসবার ব্যবস্থাও তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেননি। এমন কি বিশেষ কোন সাহায্যের আশ্বাসও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ইটালীর রাষ্ট্রদূত শুধু সুভাষচন্দ্রকে এবং তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিযান বোঝবারই চেষ্টা করেন নি, পরন্তু তাঁর যাত্রা পথ সুগম ও সহজ করবারও চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর রিপোর্টে তিনি লিখলেন,—সে অনেক কথা। তবে এ-কথা লিখতে ভোলেননি: "…বোসের প্রথম কাজই হবে ইওরোপের কোন স্থানে সর্বাগ্রে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট গঠন করা এবং তা ঘোষণাও করা। ইটালী, জার্মেনী এবং জপানী সরকার এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে কাল বিলম্ব না করে স্বীকৃতি জানাবে, এও তাঁর কামনা।… বোস মনে করেন যে, ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। প্রাথমিক কাজ শুরু করবার সাহসের শুধু অভাব। দ্বিতীয়ত, ইংরেজের শক্তি ও সামর্থ্য বিষয়ে অহেতুক ও অত্যধিক ভীতিও কম অন্তরায় নয়। যদি একবার জার্মেনী কিম্বা ইটালী, কিম্বা জাপান ভারতের সীমান্তে যেয়ে দাঁড়াতে পারে, (ইংরেজ নিযুক্ত) ভারতীয় সৈন্য ওদের পক্ষ ছেড়ে চলে আসবে। জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে। এবং ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান হবে অনতিবিলম্বে।

"বোসকে আমরা জানি তাঁর কাজ থেকে। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তিতে,

সামর্থ্যে, যোগ্যতায় এবং তাঁর প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্যে আমরা তাঁকে বিলক্ষণ বুঝতে পারি। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাস্তবানুগ।

…"গত বৎসর আমরা একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৪০-এর জুন মাসে ইংলণ্ডের পতন হয়ে উঠেছিল সুনিশ্চিত। তখন বোসের উপস্থিতির গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। এবং তাঁর প্রস্তাবিত পন্থায় ভারতবর্ষ মুক্ত করা নিশ্চয়ই সহজও ছিল। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রধানতম স্তম্ভ।

"গত বৎসরের সুযোগ আমরা হারিয়েছি। আবার তেমনি সুযোগ এবারও আসতে পারে। এবং তার সদ্ব্যবহার করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" (১)

(১) ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট—শরৎ বোস এ্যাকাডেমি কর্তৃক ১৯৬০-এর বুলেটিন, নেতাজী-জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত।

॥ দুই ॥

হিটলারের বেপরোয়া অভিযান চলেছে বিরামবিহীন। হিটলারের দেখাদেখি মুসোলিনিও তাঁর খেল দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম প্রথম আফ্রিকার মরু প্রান্তরে খানিকটা চমকও তিনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মার খেলেন গ্রীসে। তাঁকে রক্ষা করতে হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জেনারেল ক্যাসারলিং-এর বিমানের সেই বিস্ময়কর খেলা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল বিশ্বদুনিয়াকে। গ্রীস আত্মসমর্পণ করল ২৪শে এপ্রিল (১৯৪১)।

স্পেনের প্রান্ত থেকে রাশিয়ার সীমান্ত। একটা বিরাট প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ গিলে ফেলেছে সমগ্র ইওরোপ। টিম টিম করে টিকে আছে ইংলণ্ড। তাও নামে। অবরুদ্ধ ইংলণ্ডের নাভিশ্বাস উঠেছে। গোয়েরিং-এর বিমানের খেল শেষ-না-হতেই মেতে উঠল হিটলারের ইউবোট আর ফকার উল্‌ফ্‌ বিমান। দুটোই আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু মার মারাত্মক! ইংরেজের যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়ে দেয় ওরা নিমেষে। ইংরেজের জাহাজ ডুবি নয়,—ভরা-ডুবি। দুর্ভেদ্য স্কাফাফ্লোর ভেতর ঢুকে জাহাজ মেরে হিটলারের ইউবোট নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এল। উত্তর সাগরের উপকূলে ইংলণ্ড ঘর বেঁধেছে। ঘরে ঢোকবার সকল দুয়োর তার মুখের ওপর রুদ্ধ হবার দিন এগিয়ে আসছে। না খেয়ে ইংলণ্ড মরবে নাকি?

হাপুস নয়নে কাঁদে ইংলণ্ড। কেঁদে কেঁদে ডাকে আমেরিকাকে। চোরাগোপ্তা সাহায্য আমেরিকা করেছে অনেক; কিন্তু ওতে ইংলণ্ড বাঁচবে না। ইংলণ্ড জানে এ-কথা। তাই সে আমেরিকাকে সাথী করতে চায়।

১লা জুন ক্রীট গেল। অদূরে আলেকজান্দ্রিয়া। কায়রো দেখা

যায় না ? হিটলারের লালা ঝরতে থাকে। মনে পড়ে নেপোলিয়নের কথা। ওখান থেকে....না, ভারতবর্ষ অনেক দূর।

ইটালীর গ্রাৎসিয়ানি কয়েকটা দিন হেসেছিলেন কিন্তু জেনারেল ওয়াভেল ঠেলে তাঁকে হটিয়ে দিলেন তিউনিসিয়ায়। হাঁপাতে লাগলেন মুসোলিনি। এগিয়ে এলেন রোমেল। হিটলারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ।

জয় করবার জায়গাই যেন ফুরিয়ে গেল। বিরাট বলকান পদানত। ভূমধ্যসাগর আর ইংরেজের নয়। আগুন ঝলসানো ইংলণ্ড তবু চুপ করে আছে কেন ? হিটলার চঞ্চল হয়ে উঠেন। ইংলণ্ড সন্ধির কথা বলেনি। অবধারিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও ইংলণ্ড এগিয়ে এল না।

অপ্রতিহত রোমেল। এগিয়েই চলেছেন। তব্রুক ছাড়িয়ে ছাউনি ফেলেন এল আলামিনে। ওয়াভেল বিদায় নেন। আসেন অকিনলেক। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী করেছেন রোমেল।

বিজয়লক্ষ্মীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যে হিটলার মদগর্বে আকণ্ঠ ভরপুর।

অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা এসে দাঁড়ালেন জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সামনে। একা। সঙ্গে শুধু ইটালিয়ান পাশপোর্ট। কোন সম্বর্দ্ধনা হল না ম্যাজোটার। সময় কোথা ? হিটলার মহা ব্যস্ত রাশিয়া নিয়ে। তার আজন্ম শত্রু রাশিয়া।

ইংলণ্ডকে হিটলার মারতে চায়নি। আরও কয়েকজন চেম্বারলেন যদি ইংলণ্ডের থাকত, ইংলণ্ড বেঁচে যেত। হিটলারের শত্রু তাঁর দুধারে : ফ্রান্‌স্ আর রাশিয়া। ফ্রান্‌স্ গেছে। রাশিয়া ?

যাবে। ২২শে জুনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাশিয়ার বুকে।

অলক্ষ্যে বিজয়লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু এমন হল কেন ? কেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করতে গেলেন ? ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ার দুর্বলতা খানিকটা ধরা পড়েছিল। তাই ?

অথবা নেপোলিয়নের সাবধান বাণী? ইংলণ্ডকে ঘাঁটাতে যেয়ো না, বলেছিলেন নেপোলিয়ন।

রাশিয়া ইংলণ্ডের শত্রু। শত্রু গোটা সভ্যজগতের। ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে চায় রাশিয়া। বিশ্বজগৎ ধরে তুলে দিতে চায় ছোটলোকদের হাতে। কুলী-মুটে-মজুর-মেহনতি জনতাই নাকি হবে আগামী দিনের মালিক। আর এর প্রবর্তক হবে রাশিয়া। হিটলার যদি এই মওকায় মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে রাশিয়াকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন,—সভ্য জগতের সদয় সহানুভূতি কি তিনি তাতেও পাবেন না?

ইংলণ্ড-আমেরিকার গায়ে হাত তুলতে তিনি চাননি। ইওরোপের ঐ শতধা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ইওরোপকে রেখেছে চিরদুর্বল করে। ওদের উৎখাত করে একটি শক্তিশালী রাজ্য তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। বিসমার্ক একদা যা একমাত্র জার্মেনীর জন্য করেছিলেন, সমগ্র ইওরোপের জন্য তাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। বাধ সাধল কেন ইংলণ্ড?

তাইতো বাধ্য হয়ে তাঁকে কঠোর হতে হল। কিন্তু তাঁর এই মুহূর্তের আচরণ বিশ্বের বুকে এই স্বাক্ষরই রেখে যাবে যে, তিনি ভদ্র ও সুসভ্য বিশ্বের কত বড় বন্ধু। তাঁর নয়া তালিম কেউ বুঝল না। এই কথাই বলতে চেয়েছে তাঁর নয়া তালিম। বোঝাতেও চেয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বুঝল না কেন?

চার্চিল গোড়াতেই রবাহুতের মতো এগিয়ে এসেছিলেন উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। প্রথমটা স্ট্যালিন বিশ্বাস করেননি ইংরেজের এই অযাচিত ও অতিব্যস্ত মহানুভবতার তাৎপর্য। লর্ড ইস্মে তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখছেন: "সেই রাত্রেই প্রধানমন্ত্রী (চার্চিল) তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা আকাশবাণী মারফৎ প্রচার করলেন। রাশিয়া এবং তার জনসাধারণের এই বিপত্তিকালে ইংরেজের সাধ্যায়ত্ব সর্বপ্রকার সাহায্যের উদার উপঢৌকন সে নিয়ে এগিয়ে যাবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। সবাই ভেবেছিল যে, সোভিয়েট সরকার নিশ্চয়ই সমাদরে এ-ঘোষণার স্বীকৃতি জানাবে,

কিন্তু ওরা কোন জবাবই দিল না। ওদের নিরুত্তপ্ত স্তব্ধতা ছিল বরফের মতোই ঠাণ্ডা আর জমাট।"

টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম গেল। গেল আশ্বাস। দেয়া হল প্রতিশ্রুতি। সহানুভূতি বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতোই রাশিয়ার বুকে আছড়ে পড়ল।

অবশেষে বরফ গলল। কিন্তু তার তুহিন শীতলতায় ইংরেজ হকচকিয়ে উঠেছিল। স্ট্যালিন বেশ-একটু খোলাখুলিই বলে ফেললেন যে, দরদ দেখাতে হলে, কথা নয়—সেটা দেখাতে হবে কাজে। এবং কাজটাও হওয়া চাই একটু তাড়াতাড়ি। গয়ংগচ্ছ ভাব ও গদাই লস্কারি চাল রাশিয়া পছন্দ করে না। কাজ যদি খানিকটাও হয়, স্ট্যালিন প্রকৃতপক্ষে তবেই আশ্বস্ত হবেন। (At last Stalin deigned to reply ; but his answer was confined almost exclusively to the demand that we should immediately establish a second front against Hitler in the West.—Ismay)

বাক্যের ফুলঝুরির পরিবর্তে স্ট্যালিন সবিনয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে শুধু পশ্চাদপসরণের মহড়া না দিয়ে একটু প্রতিরাক্রমণের মদত দেখাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ।

কিন্তু রাশিয়ার বস্তুতান্ত্রিক কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ইংরেজের অজানা নয়। ম্যাটেরিয়ালিজম্ আয়ত্ত করেছে ইংরেজ হাতে-কলমে। এইক্ষণে পশ্চিমে প্রতিরাক্রমণের অর্থ আত্মহত্যা। ইংরেজ মরতে চায় না।

ম্যাজোটা কি ভুল করলেন? মাত্র কয়েকটা মাসের ব্যবধান। কালচক্র ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সত্যি সত্যি হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে বসবেন, এ-কথা রাশিয়ার কেউই হয়তো ভাবেনি। যুদ্ধের সামগ্রিক রূপই সহসা পালটে গেল।

মনের কোণে ম্যাজোটার তবু একটা ক্ষীণ আশা জেগে ওঠে।

হিটলারের প্রাথমিক সাফল্য অভাবনীয়। রাশিয়া পিছু হটছে অনবরত। থামছে না। ওকি থামবেই না?

ককেসাস ছাড়িয়ে রাশিয়া যদি আরও পিছু হটে,—তারপরই ইরান না? নেপোলিয়নের কথা মনে পড়ে। ইরাণের রাজাকে নেপোলিয়ন ভারতবর্ষে যাবার পথ ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। রাজী হয়েছিলেন ইরাণের রাজা। যদি তাই হয় এবারও?

কিন্তু তাঁকে কি হিটলার বিশ্বাস করবেন? ইটালীতে মুসোলিনির জামাই ও বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কাউণ্ট শিয়ানোর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। খুব বেশি খুশি হয়েছেন শিয়ানো তা কিন্তু মনে হল না।

আর এখানে? বার্লিনে?

সুভাষ বোস হিটলারের অজানা নন। ওঁর বৈদেশিক দপ্তর যুদ্ধের পূর্ব থেকেই ভারত ও তার রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে বিস্তর। সুভাষ বোস গতানুগতিক কংগ্রেস-নেতা ছাড়াও কিছু-একটু বেশি, এ-তথ্য বৈদেশিক দপ্তর বিশেষ ওয়াকিবহাল এবং হিটলারকেও এ-কথা জানাতে কসুর করেনি।

সুভাষ বোস ভারতবর্ষের সমস্যাসঙ্কুল ব্যক্তি। শান্তি ও স্বস্তি ওঁর জীবনের বড় কামনা নয়। গান্ধী নাকি মহাত্মা ব্যক্তি। সেইন্ট্। তাঁর সঙ্গে সুভাষ বোসের বনেনি। বনেনি জহরলালের সঙ্গেও। এখানে ঐ ব্যক্তিটি কি বনিয়ে চলতে পারবেন?

এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের জন্য হিটলারের তেমন কোন মাথা ব্যথা থাকবার কথা নয়। পঁয়ত্রিশ কোটি লোক নির্বিবাদে মুষ্টিমেয় ইংরেজের গোলামী করল দীর্ঘ দেড়শো বছর। একটা সোচ্চার প্রতিবাদ কেউ শুনতে পেল না। সেই দেশের লোক এই সুভাষ বোস।

যুদ্ধের ডামাডোলে ইংরেজ পাঠায়নি তো বোসকে? শত্রুর বেশে মিত্র কেমন করে আত্মগোপন করে থাকে, হিটলারের তা অজানা নয়। কুইসলিং কি শুধু নরওয়েতেই থাকে? সুভাষ বোসও-যে পেছন থেকে ছুরি মারবেন না, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

আর বেশি-কিছু বায়নাক্কা না তুলে উনি কি বক্তৃতা করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। দিন না যত ইচ্ছে গাল ইংরেজকে। হিটলার আর বৈদেশিক দপ্তরের বড়কর্তা রিবেনট্রপ এ-ব্যাপারে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করতে রাজী। আর এতে আপত্তিই-বা কোথায়? ইংরেজ হ-হ বা মরোক্কোর রশিদ আলি অথবা জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতি কি তাই করছে না? তবে?

সুভাষ বোস প্রকৃতই ইংরেজ বিরোধী হয়তো এ-কথাও মিথ্যে নয়। ইংরেজ ওঁকে বারবার বন্দী করেছে, কষ্ট দিয়েছে, পাঠিয়েছে নির্বাসনে, মেরে ফেলতেও হয়তো দ্বিধা করবে না; কিন্তু জার্মেনী বা হিটলারের তাতে কী এসে গেল? বোস কি ন্যাসন্যাল সোস্যালিজম বা নাৎসিবাদ সমর্থন করেন? হিটলারের নববিধান? ভারত সম্পর্কেই-বা হিটলারের কী স্বার্থ থাকবে ভবিষ্যতে?

সুভাষ বোস নন,—ম্যাজোটা মনের অতলে তলিয়ে যান। নির্বান্ধব বিদেশের এই ভয়ার্ত পরিবেশে নিঃস্ব ও সঙ্গীহীন এই মানুষটি তন্ন তন্ন করে নিজেকে ও নিজদেশের কল্যাণকে দেখতে চাইলেন। মুহূর্তের দুর্বলতায় সুভাষ বোস চিরদিনের জন্য জাতি ও জনের স্মৃতি থেকে মুছে যাবেন চিরতরে,—এই কথাটি সব চাইতে বড় নয়,—শতবর্ষের পর যে বৃহৎ সম্ভাবনা জাতির ভাগ্যে অকস্মাৎ প্রসন্ন হয়ে দেখা দিল, তাও তো যাবে ধূলিসাৎ হয়ে। সর্ব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন না হয়ে এবং সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেয়ে সুভাষ বোস নিজের গোপন পরিচয় উন্মুক্ত করতে পারেন না। যদি ব্রত পূর্ণ নাই হয়, ম্যাজোটা নিঃশেষ হয়ে যাবেন এইখানেই। কিন্তু ভারতবর্ষের সুভাষ থাকবেন বেঁচেই।

বড়ই ক্লান্ত ম্যাজোটা। বিশ্রাম চাই। চাই ভাববার অবকাশ। ম্যাজোটা ঢুকলেন ৬নং সোফেনট্রাসের বাড়িতে। এখানেই একদা ছিল বৃটিশ দূতাবাস।

১৯৪১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর জহরলাল নেহেরু ও আবুল কালাম আজাদ দণ্ডকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আজাদ-নেহেরুর মনে জাগল আবার আপোসের আশা। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তির কল্পনায় ওঁরা পুলকিত হতে থাকলেন এবং অধীর আগ্রহে সুযোগের প্রতীক্ষাও করতে লাগলেন। বিলেতের 'দি টাইম্‌স্‌' মন্তব্য করল যে, ওঁদের মতি-গতি আশাপ্রদ। (The statement of the congress president, on the other hand, held out the hope of settlement). 'ডেইলি নিউজের' ভাষাও ছিল অনুরূপ।

গান্ধীর এ-সব কথা অজানা ছিল না। যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে এরা,—এতকাল যারা তাঁর ভক্ত বলে, অনুরাগী ও অনুগামী বলে বাজার মাত্‌ করেছে—ইংরেজ-অনুগ্রহের সামান্যতম ইঙ্গিতে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, এতে গান্ধীর সংশয় ছিল না এবং এদের স্বরূপও, তাই, আর তাঁর কাছে অজানা রইল না।

পূর্বে এবং অনেকবার গান্ধীও আপোস চেয়েছেন। বস্তুত গান্ধিবাদের মূল দার্শনিক অংশ আপোসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কিন্তু গান্ধীর চাওয়া আপোস আর আজাদ-নেহরুর আপোস ধর্মে ও রূপে স্বতন্ত্র। গান্ধীর আপোসও আপোসই,—তবু তা একটা উচ্চ মানস ও লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তুলে একে খণ্ডন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু এর গাম্ভীর্য ও গভীরতা অনপেক্ষ। কিন্তু আজাদ-নেহরুর আপোস নিছক আত্মসমর্পণ। তাই গান্ধী, বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে, তাঁর অনুগামীদের এই আপোস-মনোভাবে শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি।

তিনি জানলেন আরও একটি কথা নতুন এবং ভালো করে: ইংরেজের মতিগতি। এই বণিক-তনয়রা দুঃখ ও দুর্দশার দারুণ বিপত্তিকালে অথবা নিজের স্বার্থ ও মতলব হাঁসিলের মোক্ষম-ক্ষণে দুরন্ত প্রতিপক্ষের পাদোদকও-যে নিরতিশয় ভক্তিভরে গলাধঃকরণ

করতে বিলক্ষণ লালায়িত হয়ে ওঠে, এবার তাও গান্ধী জানলেন নতুন করেই।

রাশিয়ার সদাশয়তা ক্রয় করবার জন্য ইংরেজ মরিয়া হয়ে উঠেছে, এ তথ্য গান্ধী জানতে পেরেছেন। অথচ এই ইংরেজ রাশিয়ার কী শত্রুতাই না করেছে জীবনভোর। রাশিয়া সম্পর্কে একটি ভালো মন্তব্যও সে সহ্য করেনি। রাশিয়া ফেরৎ যে-কোন মানুষকে সে দেখেছে জঘন্য অপরাধী বলে। সেই ইংরেজ আজ রাশিয়ার বন্ধু হতে চায়।

মানুষ, তথা জাতি কবে সত্য করে সত্যের মর্যাদাই-বা দিল,—এ-প্রশ্নও গান্ধীর মনে দোলা দিয়েছে। সত্য নয়—স্বার্থ। ব্যক্তির স্বার্থ, জাতির স্বার্থ। স্বার্থের অনুকূল নীতিই সবাই বোঝে, এবং মানেও।

চার্চিলের প্রাইভেট সেক্রেটারী কোলভিল চার্চিলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "আপনার মতো গোঁড়া কম্যুনিস্ট-বিরোধীর রাশিয়াকে সমর্থন করতে আটকাবে না কোথাও?"

"মোটেই না।" উত্তর দিয়েছিলেন চার্চিল। "আমার লক্ষ্য এই ক্ষণে মাত্র একটি: হিটলারের ধ্বংস। এ করতে পারলে আমি বেঁচে থাকবো সহজভাবে। হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে, আমি নরকের দূতের কাছেও সমবেদনা জানাতে দ্বিধা করবো না।" (১)

এই চার্চিল ও তাঁর জাত গান্ধীর কাছে খুব বেশি আর দুর্বোধ্য নয়। গান্ধী দীর্ঘ দিন ইংরেজকে চিনতে চাননি। চিনতেও তাই পারেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির অনেকটা প্রসারতা এনে দিয়েছেন সুভাষ।

১৯২৮। কলকাতা কংগ্রেস। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উঠল সুভাষের কণ্ঠে।

১৯২৯। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু নেহরু-কনষ্টিট্যুশনের বায়নাক্কা ধরে হোঁচট খেতেও তার স্বর সইল না।

(১) চার্চিল প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্ব সমর, ৪র্থ খণ্ড।

১৯৩০। লবণ-সত্যাগ্রহ। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। আবার হোঁচট। রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্স্‌এর নাকানি-চুবানি।

১৯৩২। আবার সংগ্রামের সঙ্কল্প।

১৯৩৩। সংগ্রামের অবসান।

১৯৩৪। বোস-প্যাটেল বিবৃতি।

১৯৩৮। হরিপুরা কংগ্রেস। সুভাষচন্দ্রের দাবী সোচ্চার। বিশ্লেষণ পরিস্ফুট এবং সুদৃঢ়।

১৯৩৯। ত্রিপুরী। দ্ব্যর্থহীন ও নিঃসংশয় সংগ্রামের ঘোষণা।

১৯৪০। রামগড়। আপোসহীন সংগ্রাম শুরু। অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্কল্প-পরাঙ্মুখ নৈষ্কর্মের স্তব্ধতা।

কংগ্রেসের অবলুপ্তি রোধ করতে এবং আজাদ-নেহরু-রাজাগোপালের চক্রান্ত বানচাল করে দিতে গান্ধী নামমাত্র ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অমিতবীর্য আপোসহীনতা সেদিন গান্ধী ও কংগ্রেসকে অনুপ্রাণিত করেছিল কতখানি ও কী প্রকারে, তার পরিধি ও স্বরূপ অজানা না থাকলেও প্রকাশ্য স্বীকৃতি সেদিন ছিল না। কিন্তু অস্পষ্ট রইল না ১৯৪০—৪১-এ। এমন কি চার্চিলও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সুভাষ বোস পরিচালিত চরমপন্থীরাই শুধু প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ছিল। এবং তারাই কামনা করত অক্ষশক্তির বিজয় (…only a small extremist section in Bengal led by men such as Sabhas Bose, were directly subversive and hoped for an axis victory…) (১)

গান্ধীও জানতেন এ-কথা। অকুতোভয় বীর্য-ধন্য এই দেশপ্রাণ ব্যক্তিটি দেশ ও তার মুক্তির জন্য নিজের জীবন ও জীবনের সব-কিছু একান্ত অবহেলায় বিসর্জন দিতে-যে পরাঙ্মুখ নন, গান্ধীর কাছে এ-কথা আর অস্ফুট রইল না। এবং সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর থেকে তাঁর

(১) চার্চিল প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্ব সমর, ৪র্থ খণ্ড।

নবতম এই দুর্জয় পরিচিতি সেদিন গান্ধীজিকে শুধু অনুপ্রাণিতই করেনি, পরন্তু তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিচার ও সিদ্ধান্তের ওপরেও এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গান্ধী-জীবনের এই নবলব্ধ প্রজ্ঞা ও বৈচিত্র্য যে ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ করে প্রস্ফুটিত হল, তিনি ছিলেন বিলাতের নবগঠিত মন্ত্রীসভার লর্ড প্রিভিসিল ও হাউস অব কমন্স্-এর লিডার স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্

তিন মাস কেটে যাবার পর মনে হল সমস্যার যেন অনেকটা সমাধান হয়ে এসেছে। বৈদেশিক দপ্তর সুভাষচন্দ্রের কথা শুনেছে খুবই মনোযোগ দিয়ে। তাঁর যুক্তি, পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম ওরা উপেক্ষা করতে পারেনি।

এই নতুন পারিপার্শ্বিকতা ও বাস্তব পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্রকেও কম সজাগ করেনি। জীবন-মরণের এক ভয়াবহ সংগ্রামে মেতেছে সমগ্র জার্মান জাত। এদের কাছে জার্মেনীর স্বার্থই সব চাইতে বড় স্বার্থ; এবং তা হওয়া একান্ত স্বাভাবিকও। ভারতবর্ষের প্রতি কোন বিশেষ মমতা এদের থাকবার কথা নয়, এবং তা-যে ছিল তারও প্রমানাভাব। হিটলার ও তাঁর সরকার যদি কিছু ভারতবর্ষের জন্য করেন, তা করবেন এই কথা ভেবে যে, পরিণাম ও তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর ফলে জার্মেনীর হয়তো কিছুটা সুবিধা হতে পারে।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের নামজাদা জাতীয় নেতা। তাঁর প্রভাব আছে, প্রতিপত্তিও অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভারতবর্ষ ইংরেজের সম্পদ-আকর। জনবল, অর্থ এবং অন্যান্য উপকরণ ভারতবর্ষের কলজে চুষে ইংরেজ নিতেই থাকবে; আর তা দিয়ে সে জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও চালিয়ে যাবে। সেই ভারতবর্ষে সুভাষ বোসের মারফৎ যদি প্রচার-প্রভাব খানিকটাও কার্যকরী করে তোলা যায়,—মন্দ কি?

হিটলারের প্রধান শত্রু ইংরেজ। ইংরেজের শত্রু সুভাষ বোস। এইখানেই হিটলার ও তাঁর বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে সুভাষ বোসের

উভয়ত ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এবং এই সম্পর্কের সুযোগ হিটলার যে নিতে চাইবেন তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন মাফিক, এ-কথাও অত্যন্ত সত্য। সুভাষও এই সুযোগের প্রত্যাশায় ও কল্পনায় জীবনের এত বড় ঝুঁকি ও বিপর্যয় বরণ করে এগিয়ে এসেছেন। হিটলারের কাছে জার্মেনীই সব,—ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই সুভাষ-জীবনের এক ও অনন্য কামনা।

এবং এ-কথা বুঝে নিতে সুভাষচন্দ্রের দেরি হল না যে, তিনি ঠকেননি। বৈদেশিক দপ্তরের ট্রট (Baron von Trott Zusolz) ও তাঁর কতিপয় বন্ধু সুভাষচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার পারম্পর্য এবং বিশ্লেষণ শুধু সমর্থনই করেননি পরন্তু তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, গভীরতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি তাঁদের মুগ্ধও করেছিল। ট্রট ছিলেন বৈদেশিক দপ্তরের প্রাচ্য সমস্যা, বিশেষ করে ভারতীয় সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। (১)

সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় ও ব্যক্তিত্ব-প্রধান ভঙ্গী ও আলাপ-আচরণ জার্মান শাসক গোষ্ঠীর খুব বেশি মতঃপূত হয়নি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই হিটলার ও রিবেনট্রপ সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের দুর্লভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সুভাষের পরিকল্পনা যাতে রূপায়িত হয়ে ওঠে সহজে ও সুস্থভাবে তার জন্য ব্যবস্থাও করেছিলেন অনেকটা দরাজমনেই।

বার্লিনে সুভাষ-পরিকল্পিত আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ (Free India Center) গড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত পরিকল্পনা পেশ করা হল বৈদেশিক দপ্তরে। পরিকল্পনার প্রথম অংশ প্রচার সম্পর্কীয় ও প্রচার-প্রধান। সঙ্ঘের অধীনে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রচার বিভাগ। রেডিও মারফৎ বক্তৃতা হবে নানা ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী এবং আরও কয়েকটি

(১) অধ্যাপক গিরিজা মুখার্জীর বক্তৃতা, নেতাজী রিসার্চ বুরোর বুলেটিনে প্রকাশিত।

ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নানা দেশের সংবাদও বিতরণ করা হবে। দ্বিতীয়টি পুরোপুরী সামরিক ব্যবস্থা। গড়ে তুলতে হবে আজাদ-হিন্দ ফৌজ। ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন (Indian Ligion)।

সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল এই ব্যক্তিটির সহজাত। অতি নগন্য ও ক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর চোখ এড়াল না। গড়ে উঠল এক পূর্ণাঙ্গ ও নিটোল গাঠনিক রূপ। স্বতন্ত্র বেতার কেন্দ্র, সংলগ্ন কারণিক কার্যালয় এবং এতৎসম্পর্কীয় সচিবালয় গড়ে তোলা হল।

কিন্তু প্রধান সমস্যা দেখা দিল কর্মীর। এই বিচক্ষণ ও ব্যাপক পরিকল্পনার রূপকার শিল্পী মিলবে কোথায়? সমগ্র ইওরোপ দাবানলে পুড়ছে। এর ভেতর ভারতীয় কে আছে কোথায় ছিটকে পড়ে, সে সন্ধান কে দেবে তাঁকে? ভারতবাসী ছাড়া কে এবং কারাই-বা এই গুরুদায়িত্ব মাথা পেতে নেবে?

ইওরোপে ভারতবাসীর সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে গ্রেট বৃটেনকে কেন্দ্র করে। ফ্রান্স্, জার্মেনী সুইজারল্যাণ্ড বা আরও দু'চার স্থানেও কিছু ভারতবাসী ছিল। এদের অধিকাংশ ছিল ছাত্র। কিছু ব্যবসায়ীও। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় কারোই ছিল না। যদিই-বা ছিল, চর্চা ও সংযোগের অভাবে সে সব ধুয়ে মুছে গেছে।

তবে কি পরিকল্পনা থাকবে শুধু কাগজেই? দপ্তরের ফাইলে? রূপ নেবে না কোন দিন? স্বপ্ন থাকবে নিছক স্বপ্ন হয়েই?

সুভাষ বোস শুধু স্বাপ্নিক নন। যথেষ্ট বাস্তবধর্মীও। এবং এর পরিচয় যে অভিনব ব্যবস্থায় অচিরাৎ রূপ পরিগ্রহ করে ফুটে উঠল, তা শুধু মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যেই প্রোজ্বল নয়, অনবদ্যও।

যে যেখানে ছিলেন ভরতবাসী ও ভারতবন্ধু তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছে গেল চা-এর নেমন্তন্ন। আমন্ত্রণ জানালেন ম্যাজোটা।

"সেদিনকার কথা আজো ভুলতে পারিনি। একটু বেলা করে উঠেছি। চন্ চন্ করছে রূপোলি রোদ। এলো টেলিগ্রাম। চা-এর

নেমন্তন্ন। বার্লিনে। ঐ দিনই বিকেলে। তারখানা হাতে নিয়ে ভাবছি। ভেবেই চলেছি। নামে তো মনে হয় ইটালীয় কেউ। কিন্তু অকস্মাৎ চা কেন? আর হলোই-বা চা, আমাকে কেন? ইটালীর জানা-শোনা কাউকে জিজ্ঞেস করবো? কিন্তু—

"ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঢুকলেন একজন ভারতীয় বন্ধু। ভদ্রলোক ঢুকেই বলে উঠলেন: 'চলুন না, ঘুরে আসি বার্লিন থেকে।'

"কেন বলুন তো?"

'নেমন্তন্ন।'

"চা-এর?

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?'

"আমারও।

"ভদ্রলোক বের করে দিলেন তাঁর তারখানা। ভাষা প্রায় একই। একটু বেশি গাঢ়। জোর দেয়া হয়েছে যাবার জন্যে। সবটাই দুর্বোধ্য। ম্যাজোটা কে? নেমন্তন্ন কেন? তবু ভেতর থেকে কে যেন ঠেলছে। তাড়া দিচ্ছে যেতে।

"আমাদের না যেয়ে উপায় ছিলো না। গেলাম। গেলাম ঠিক সময়েই।

"ঘরে ঢুকতেই যিনি এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে—

"বিমূঢ় আমরা। দাঁড়িয়েই আছি। আছি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে। খানিকটা অবিশ্বাস। খানিকটা—

"না, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

"অনেকদিন আগে শুনেছিলাম যে, ভারতীয় নেতা সুভাষ বোস ইংরেজের জেলে মারা গেছেন। কিন্তু।

"আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই সুভাষ বোস। ছবিতে দেখা সেই উন্নত-শির দিঘল-দেহী মানুষটি। মুখে মৃদু হাসি। প্রশস্ত ললাট। আর অপূর্ব মর্মভেদী দৃষ্টি।

"অভিভূত হয়ে গেলাম।"

বলছেন একজন অষ্ট্রিয়াবাসী, নাম লিওপোল্ড ফিশার। ভারত-প্রেমে ভরপুর। ভারতীয় দর্শন নিয়ে পাগল। বলেই চলেছেন : "আর ঘরে ফিরিনি। সেই থেকে ওখানেই—আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘে।" (১)

একেই বলে চুম্বক। স্পর্শমণী। যে এসেছে সংস্পর্শে, অনড় হয়ে থেকেছে সাথে। এমনি করেই এল ফ্রান্স্ থেকে, এল সুইজারল্যাণ্ড থেকে। আর জার্মেনীর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। বেশি নয়, প্রথমটা জনা পনের।

আর নিয়ে এলেন ডজনখানেক জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান ছেলে-মেয়ে স্বয়ং শেঙ্কল। এমেলি শেঙ্কল।

টুকিটাকি কাজের কি অভাব আছে? টাইপ করা, চিঠি লেখা, অফিস গোছানো, অতিথিদের সম্বর্ধনা, টেলিফোন ধরা,—হাজারো কাজ।

প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, নাম্বিয়ার, গনপুলে আবিদ হাসান, ডঃ গিরিজা মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ডঃ সুলতান, এম, ভি, রাও, ডঃ মল্লিক, কাস্তরাম প্রভৃতি।

অজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ নয়, যেন ক্ষুদ্র একটি ভারতবর্ষ।

শুরু হল কাজ।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রথম বৈঠক বসল ২রা নভেম্বর, ১৯৪১। আর এই বৈঠকেই অবিস্মরণীয় তিনটি কথার জন্ম হল : জয়হিন্দ্, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ আর নেতাজি।

সুভাষচন্দ্র নেতা ছিলেন। নবজন্ম হল বার্লিনে। তাই হল নব নামকরণ। নেতা থেকে তিনি হলেন নেতাজি।

(১) পরবর্তীকালে ফিশার মিত্রপক্ষের হাতে বন্দী হন। মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বর্তমান নাম অগেহানন্দ। এঁর লেখা 'ওকার রোবস' বই থেকে।

॥ তিন ॥

সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে চমকে উঠল। আমেরিকার সুরক্ষিত নৌঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ করে বসল জাপান। দিনটা ছিল ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১। আর ফাউ হিসেবে জাপান চেপে বসল হংকং, মালয়, গুয়াং, ফিলিপাইন ওয়েক ও মিডওয়ে দ্বীপের বুকে।

আমেরিকা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।

মনে হয় এই সুযোগের প্রত্যাশায় বসেছিল এতদিন আমেরিকা। জাপানের বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জার্মেনী বা ইটালী তার বিরুদ্ধে কিছু করেনি।

আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ ইংলণ্ডের সমরোপকরণ নিয়ে যাতায়াতের মুখে জার্মেনীর টরপেডো ও বিমানাক্রমণে ডুবেছে অনেক, এবং এতে তার খানিকটা ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু নিছক এরই জন্য জার্মেনীর বিরুদ্ধে আমেরিকা ইচ্ছা সত্বেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেনি। কিন্তু এবার তার পথ উন্মুক্ত। ১৯৪০ এর ২৭শে সেপ্টেম্বর বার্লিনে স্বাক্ষরিত হয় ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। এই ত্রিপক্ষ গড়ে উঠেছিল জার্মেনী, ইটালী ও জাপানকে নিয়ে। জাপানের দুষ্কার্যের অজুহাতে আমেরিকা এসে দাঁড়াল তার পুরনো বন্ধু ও বশংবদ মিত্র ইংলণ্ডের পাশে।

সেদিন হিটলার ও আমেরিকার চিন্তাধারার রীতি-বিন্যাসে পার্থক্য ছিল হয়তে কিন্তু অভিলাষ? সম্ভবত তা ছিল অভিন্ন। আন্তর্জাতিক প্রাধান্য-বোধ জার্মেনী ও আমেরিকাকে সমভাবে প্রতপ্ত করে তুলেছিল। ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে হিটলার ইওরোপের বিরাট ভূখণ্ড গলাধঃকরণ করেও তৃপ্ত হলেন না, রাশিয়ার অবলুপ্তিও চাইলেন

নির্বিশেষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বোকামি আমেরিকা ভোলেনি। সেদিন তার আন্তর্জাতিক প্রাধান্য-ক্ষুধা খুব বেশি প্রবল হয়ে উঠেনি। তাই সে ভাগ-বাঁটোয়ারার বেলায় সরেও গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসমরে আমেরিকা অতিরিক্ত সচেতন। তাই সে হিটলারকে এবং তার সঙ্গে এসিয়ার জাপানকে আর বাড়তে দিতে নারাজ। তার বিপুল অর্থবল, উৎপাদন শক্তি এবং জনবল নিয়ে আর সে নির্বিকার থাকতে চায় না। আমেরিকা রাশিয়াকে বাঁচাতে চায়।

চায়, কিন্তু রাশিয়ার প্রতি অনুরাগ বশত চায় না। কম্যুনিজম পছন্দ করে বলেও নয়। চায় নিজের গরজে। নিজের স্বার্থে চায় এবং প্রয়োজনে চায়।

একদিন জার্মেনী, ইংলণ্ড, আমেরিকা,—সবই মিলে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আজ চাইছে বাঁচাতে। রূপ পৃথক। স্বার্থ অভিন্ন।

হয়তো একেই বলে প্রাক্তন। অদেখা বিধিলিপি। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি ওদের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত রোধ করতে পারল না। চুক্তি না করেও ইংরেজ-আমেরিকার মিত্র হওয়া ছাড়া রাশিয়ার গত্যন্তর রইল না।

জাপান সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট করেছিল ১৯৪১-এর ১৩ই এপ্রিল। নিরপেক্ষ চুক্তি। ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতা সত্বেও সেই মুহূর্তে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

কিন্তু অকস্মাৎ আমেরিকার ওপরেই—বা জাপান ক্ষেপে উঠল কেন? বিস্মৃতপ্রায় মৃত অতীত সহসা কি জাপানকে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার দুঃসাহসিক অভিযানে প্রলুব্ধ করেছিল? একদা অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে অতর্কিতে আমেরিকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জাপানের বুকে। এক দুঃসহ অপমানের গ্লানি চাপিয়ে দিয়েছিল জাপানের মাথায়। শতাব্দির মৌন রুদ্ধবাক সাধনা জাপানকে বিলক্ষণ শক্তিশালী করেছে সন্দেহ নেই, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সুযোগের জন্য উন্মুখ

হয়ে ওঠাও তার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিকই,—তবু মনে হয় আন্তর্জাতিক ঘটনার আকস্মিকতাই হয়তো তাকে অসময়ে উত্তেজিত করে থাকবে। ইংলণ্ডের সীমাহীন দুর্গতিও তাকে কম প্রলুব্ধ করেনি।

ইওরোপ, আফ্রিকা ও রাশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড নেবে হিটলার, আমেরিকা নেবে বাকিটা, তার জন্য তবে থাকল কী?

কোন আদর্শের প্রশ্নে কেউই যুদ্ধে নামেনি। নেমেছে নিজ নিজ স্বার্থে। কিন্তু সেই স্বার্থ পরিপূর্ণ করতে জাপান আমেরিকাকে আগে না ঘাঁটিয়ে সবাই মিলে সর্বাগ্রে ইংরেজকে ধ্বংস করল না কেন? যদি করত, কী হত?

যা হত, তা হল না।

সেই অত্যন্ত জানা ও চোখে দেখা ভবিষ্যৎ নিঃশেষ হয়ে গেল। হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার তুষার-পাঁকে ডুবে গেলেন। আর জাপান?

ইংরেজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে সে শুধু এই দিনটির জন্য দেবতার দুয়োরে ধর্না দিয়েছে বার বার। ধর্না তার সার্থক হল। আমেরিকা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অবরুদ্ধ কণ্ঠ-নালীর ভেতর থেকে তার স্বস্তির মৃদু গোংরানি দূর থেকেও শোনা যায়।

সেদিনের চার্চিল নেচে উঠেছিলেন উর্ধ্ববাহু হয়ে। বলেছিলেন চিৎকার করে: "আমরা জিতে গেছি।" (So we had won after all.) ইংরেজের নেতা চার্চিল। নেতার ভেতর দিয়ে সমগ্র জাত কথা বলেছিল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) সিঙ্গাপুরের পতন হল। দীর্ঘ ২০ বৎসর লেগেছিল ইংরেজের সিঙ্গাপুর দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলতে। হারাতে লাগল পুরো দুটো দিনেরও কম।

ইংরেজের গৌরব ও গর্ব 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ও 'রিপালস' মহাসাগরের তলায় ডুবে গেল। সঙ্গে গেল বিরাট নৌবহর। যুদ্ধ নয়, ভোজবাজী। ভেলকি দেখিয়ে দিল জাপান।

জাভা গেল ৮ই মার্চ। ঐ সময়েই রেঙ্গুন। ব্রহ্মদেশের বিরাট ভূখণ্ড জাপানের উদ্যত খড়্গের নীচে। ইংরেজের তাঁবেদার অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ ;—এক সীমাহীন অসহায়তার বোবা দৃষ্টি ফুটে ওঠে ইংরেজের চোখে।

সেদিন ইংরেজের দুচোখেই ছিল অশ্রু। একটাতে কান্নার অশ্রু ছিল, অন্যটাতে আনন্দের। দুঃখ তার অসীম। এবং অসহ্যও। কিন্তু প্রাপ্তিও তার অসামান্য। আমেরিকাকে সে পেয়েছে এই দুঃখের অমানিশায়।

প্রায় একলক্ষ ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্য নিয়ে জেনারেল পারসিভ্যাল জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। দিনটা ছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০। সময় ৮টা ৩০ মিনিট।

রাতারাতি ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল বহুদিনের মতো। মিত্রপক্ষের বড় তরফ আর ইংরেজ নয়। আমেরিকা। আর তাই সে থাকবে বহুকাল।

গান্ধী ও তাঁর ভক্তদের চিন্তাধারার কোন মৌল সামঞ্জস্য প্রায়শই দেখা যেত না। আত্মিক শক্তি, সত্য ও অহিংসাই শুধু নয়, —রাজনীতির ছোট-বড় অনেক গুরুতর বিষয়েও এঁদের মত বিভিন্ন ধারায় ও খাতে প্রবাহিত হত।

বৈদেশিক শক্তির সাহায্য কতটা নেয়া সঙ্গত এবং সত্য ও অহিংসার মনঃপূত, এ-নিয়েও এঁদের মতামতের পার্থক্য ছিল বিভিন্ন ধরনের। গান্ধী ছিলেন এ-বিষয়ে একান্তই উদাসীন। কিন্তু অতি-আধুনিক চিন্তার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত নেহেরু ও তাঁর বন্ধু আজাদ বৈদেশিক শক্তি, বিশেষ করে সেই সময়ের পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার আমেরিকার প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত না করে পারেন নি। এবং এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বিলেত থেকে কৃষ্ণ মেননকে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায়। (১)

(১) বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স।

মেননের তদ্বির হয়তো খানিকটা সহজ করে থাকবে কিন্তু মূলত জাপানী গুঁতোয় সেদিন আমেরিকা ভারতবর্ষের দিকে সদয় দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সরাসরি পত্রালাপ শুরু করেছিলেন চার্চিলের সঙ্গে। আমেরিকার নজির দেখাতে, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিতে এবং বিশেষ করে সেই সময়ের ও ভবিষ্যতের আসন্ন গুরুতর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে রুজভেল্ট ভোলেন নি। চার্চিল উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু আশু প্রতিকারের পরিবর্তে চার্চিলের কথার মধ্যে বেশিই ছিল ইংরেজের ঐতিহাসিক ও সনাতন ধূর্ততার রূপ।

হয়তো একটু সোজা মানুষ ছিলেন এই রুজভেল্ট। লিখে বসলেন যে, ইংরেজ যা যুদ্ধের পর স্বেচ্ছায় দিতে চাইছে, একটু আগে তা দিয়ে ফেলতে আপত্তি কোথায়?

১২ই এপ্রিলের (১৯৪২) চিঠিতে রুজভেল্ট লিখছেন :···"বর্তমান অচল অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট। ওঁরাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে ভারতকে বঞ্চিত করে রেখেছেন"। (···the deadlock has been due to the British Government's unwillingness to concede the right of self Government to the Indians···) (১)

শোন কথা! তাই নাকি দেয়া যায়। সোনার-খনি ভারতবর্ষ গেলে ইংরেজের থাকল কী? চার্চিল ফেটে পড়লেন ক্রোধে। কিন্তু ওটা এই মুহূর্তে প্রকাশ করবার পথে বাধা বিস্তর। চেপে গেলেন চার্চিল। শুধু লিখলেন: "আপনার প্রতিটি কথার গুরুত্ব কত বেশি আমার কাছে, তা আপনার জানা। কিন্তু বর্তমানের এই সাংঘাতিক সময়ে ভারতরক্ষার দায়িত্ব কোনক্রমেই আমার পক্ষে নেয়া সম্ভবপর হবে না, যদি সবই আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হয়।"

প্রেসিডেন্ট চুপ করে গেলেন। চার্চিল নাছোরবান্দা। রুজভেল্ট-এর

(১) দ্বিতীয় বিশ্বসমর, ৪র্থ খণ্ড—চার্চিল।

এই অনধিকার চর্চা ভুলতে পারলেন না চার্চিল। তাঁর বইতে (দ্বিতীয় বিশ্ব সমর) লিখলেন: "আদর্শবাদ ছাড়া মানব-সভ্যতার অগ্রগমন অসম্ভব নিশ্চয়ই; কিন্তু পরের ওপর দিয়ে ওটার পরীক্ষা আর নিরীক্ষা সম্ভবত খুব উচ্চ এবং মহোত্তম পন্থা নয়।"

কিন্তু সমস্যাটা সেদিন খোয়াব ছিল না এবং এই বাদানুবাদের ফলে তার কিছু সুরাহাও হল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীপ্‌স্ এলেন ভারতবর্ষে।

ক্রীপ্‌স্ আগেও একবার এসেছিলেন। এসেছিলেন ১৯৩৯-এ। কিন্তু তখন এসেছিলেন বেসরকারী দূত হিসেবে। এ-ক্রীপ্‌স্ খাস বিলিতি মন্ত্রিসভার লর্ড প্রিভিসিল এবং হাউস অব কমন্‌স্-এর লিডার। শুধু তাই নয়, ক্রীপ্‌স্-এর ভাগ্যচক্রের তুঙ্গে তখন বৃহস্পতি। রাশিয়ায় তাঁর কৃতকর্মতার ইতিবৃত্ত জানা না গেলেও তাঁর রাষ্ট্রদৌত্য থাকা কালেই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। ফলে ওদের মিতালি খান খান হয়ে ভেঙ্গেও যায়। একেই বলে কাকতালীয় সংযোগ।

২২শে মার্চ (১৯৪২) ক্রীপ্‌স্ দিল্লী পৌঁছোলেন।

জহরলাল আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহানুভূতি কিম্বা মহানুভবতার ওপর খুব বেশি ভরসা রাখতে পারেন নি। অনন্যোপায় হয়ে তিনি একটু ঘোরা পথে আমেরিকার প্রভাব কার্যকরী করবার ফিকিরে ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার সময় জহরলাল চীনে গিয়েছিলেন এবং চিয়াং কাইসেক-দম্পতির সঙ্গে নিবিড় সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। চিয়াং-পত্নী আমেরিকায় শিক্ষিতা, বিদুষী, ধনী এবং সুন্দরী। এঁদের ওপর আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তিও ছিল অসীম। সর্বোপরি চিয়াং-এর চীন জাপান বিরোধী। সহসা চিয়াং-দম্পতি ভারত দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

জাপানের আক্রমনে চীনের তখন নাভিশ্বাস। নিজের দেশের এই বিপর্যয় সত্ত্বেও অকস্মাৎ চিয়াং-দম্পতি ভারত প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিলেন এবং সত্যি সত্যি একদিন দিল্লীতে এসে পৌঁছেও গেলেন। (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

দিল্লীর লাট-ভবনে নেহেরু ও আজাদ চীনা-দম্পতির সঙ্গে মুলাকাৎ করেন, দীর্ঘ আলোচনার পর প্রভূত প্রীতিলাভান্তে ম্যাডামের স্বহস্ত-তৈরী চা-পানে পরম সন্তোষ লাভ করে ফিরে আসেন। ওঁরা দিন কয়েক বাদেই কলকাতায় শুভাগমন করেন এবং বিড়লা পার্কে গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে ভারতীয় সমস্যার বিভিন্ন আলোচনায় রত হন।

কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও গান্ধীকে করায়ত্ত করা চীনা-দম্পতির পক্ষে সম্ভব হয়নি। গোপন কক্ষে গান্ধী এই চৈনিক ফিল্ড্‌মারশালটিকে কী বলেছিলেন, তার সঠিক বিবরণ কোনদিনই জানা যাবে না, কিন্তু জহরলাল নেহেরু গান্ধীর অচরণে যে পরিতুষ্ট হতে পারেন নি, এ বারতা গোপনও রইল না। আজাদ তাঁর পুস্তকে লিখলেন: "এই সময়ে সব বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে জহরলাল একমত হতে পারেন নি। এ-বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে বেদনাকর।" (১)

না, মৌলানা আজাদের পক্ষে তা বলা সঙ্গতও নয়। জহরলাল নেহেরু আজাদের বন্ধু।

১২ই এপ্রিল ক্রীপ্‌স্‌ বিদায় নিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতায় তিনি যৎপরোনাস্তি ম্রিয়মান হয়েছিলেন নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর সকল ক্ষয় ও ক্ষতি উশুল হয়ে গিয়েছিল জহরলাল নেহেরুর আশ্বাসে। নেহেরু সেদিন স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন: "জাপানকে আমরা রুখবোই। আক্রমনকারীর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করবো না। অতীতে যাই ঘটে থাক,—ভারতবর্ষে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা কোন প্রকারে বিঘ্নিত হতে আমরা দেবো না।" (…The Japanese must be resisted. We are not going to surrender to the invader. In spite of all that has happened, we are not going to embarrass the British war effort in India…) (২)

(১)+(২) ইণ্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রীডম—আজাদ

চার্চিলের মন্তব্য : "কিন্তু নেহেরুকে সমর্থন করবার দ্বিতীয় লোক নেই। তিনি একা।" (১)

গান্ধী ১০ই মে তাঁর হরিজন পত্রিকায় লিখলেন : "জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ আদৌ করে, ইংরেজ ভারতের ওপর প্রভুত্ব করছে বলেই তা করবে। ইংরেজ যদি ভারত ছেড়ে চলে যায়, জাপানের ভারতাক্রমণের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। তবু যদি জাপান আক্রমণ করেই বসে, স্বাধীন ভারতবর্ষ এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পেছপাও হবে না। নিখাদ অসহযোগিতা সেদিন অবাধে প্রচলিত হবে।" (চার্চিল কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বসমর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে উদ্ধৃত)।

এই গান্ধীকে দেশ এতকাল খুঁজে পায়নি। এক আনকোরা নতুন গান্ধী তাঁর সবল ও সোচ্চার কণ্ঠে ভারতবর্ষের বাণী বিশ্বকে শুনিয়ে দিলেন। এ-গান্ধী অনাবৃত। নিঃসংশয়।

সহসা সাগরপার থেকে বজ্র গর্জে উঠল। চমকে উঠল সারা ভারতবর্ষ। তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল বহুজনের দেহে। দীর্ঘ প্রায় এক বৎসর প্রতীক্ষার পর দেশজননীর প্রিয়তম হারিয়ে যাওয়া পুত্রের সন্ধান মিলেছে। তিনি সুস্থ আছেন। তিনি আছেন অক্ষত। সর্বোপরি চিরশত্রুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করা সংগ্রাম তিনি পরিত্যাগ করেন নি।

অধীর দেশবাসী অপেক্ষা করে সূর্য অস্ত যাবার। অপেক্ষা করে তিমির রাত্রির। অন্ধকার গৃহের নিরুদ্ধ কক্ষে দেশের ব্যাকুল নর-নারী শ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকে। সহসা রেডিওর শব্দ হয়। বলে : "আমি সুভাষ।" কথা নয় মন্ত্র। দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। রুদ্ধবাক অধীর শ্রোতা। নিরন্ধ্র স্তব্ধতা ভেদ করে একটি শান্ত সুন্দর স্তব গুঞ্জন করে ওঠে। "আমি সুভাষ।"..."জয় হিন্দ।" রেডিও চুপ করে। সম্মোহিত শ্রোতা বসেই থাকে। সেই পরমক্ষণে মনে হয় ভারতবর্ষও বুঝি স্বাধীন হয়ে গেছে।—So we had won after all.

(১) দ্বিতীয় বিশ্বসমর,—৪র্থ খণ্ড—চার্চিল

এ-মন্ত্র ধ্বনিত হয় গান্ধীর কানে। শোনেন জহরলাল। শোনেন আজাদ। আর শোনে দেশের শতকোটি সন্তান। (১)

গান্ধীর রূপান্তর হতে থাকে।

ক্রীপ্‌স্‌-এর সঙ্গে গান্ধী কথা বলেন। পরম শান্ত গান্ধীর কণ্ঠেও কচিৎ ঝাঁজ দেখা দেয়। পরক্ষণেই হেসে ওঠেন বালকের মতো। বলেন: "আলোচনার কী আছে? কথাটা একান্ত বস্তুতান্ত্রিক এবং স্থুল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।"

ক্রীপ্‌স্‌ বলেন: "সেটা তো আগেই জানতাম। প্রথম বারেই আপনি আমাকে বলেছিলেন।"

"তাই নাকি?" চোখ মিট মিট করে বলেন গান্ধী; "ভুলে গেছি। একটা কথাই শুধু মনে আছে। আমি আপনাকে নিরামিশ খেতে বলেছিলাম।"

চুপসে যান ক্রীপ্‌স্‌। এ-গান্ধী তো সে-গান্ধী নন। এ-গান্ধীর চোখে নতুন আলো। কণ্ঠে এঁর নতুন ব্যঞ্জনা।

গান্ধী আবার বলেন: "দেখবেন, পাগলা ঘোড়ায় চেপেছেন। লাগামটাও ধরেছেন আলগা করেই। পড়ে না যান।"

"না, পড়বো না।" হাসতে হাসতে বলেন ক্রীপ্‌স্‌,—"আমিও পাকা সওয়ার।"

জহরলাল নেহেরুর কপালের শিরা ফুটে ওঠে মোটা হয়ে। চোখের কোণের কুঞ্চন-রেখা আরও স্পষ্ট হয়। (Jaharlal was deeply troubled—Azad)

আর সবাই শুধু চেয়ে থাকে গান্ধীর দিকে। (As for other members of the working committee, most of them had no set opinion about the war). (২)

সবাই বোঝে গান্ধীর মনে দোলা লেগেছে। হারু ইংরেজের

(১) বাঞ্চ অব ওল্‌ড্‌ লেটার্স

(২) গান্ধী-ক্রীপ্‌স সাক্ষাৎকারের সবটাই আজাদের বই থেকে।

প্রতিনিধি ক্রীপ্‌স্। ওঁর কথার কি দাম আছে? থাকলেই-বা কতটুকু?

ক্রীপ্‌স্ মানুষটি একই, কিন্তু ভেতরটা পালটে গেছে ওঁরও। উনি আর শুধু শ্রমিকদলের সভ্য নন, কোয়ালিশন (সর্বদলীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট) পার্টির মন্ত্রীও। তাই। ইংরেজের সেই বহু পুরনো বায়নাক্কা ওঁর কণ্ঠেও শোনা যায়। চিরকালের রসিকতা। 'যুদ্ধে তোমরা নামো। যুদ্ধের পর তোমাদের কথা আদপেই ভুলবো না। খুসি করে তখন বকশিশ দেবো।'

যুদ্ধের পরই বটে! ততদিন তোমরা টিকেই থাকবে? আবার জিতবেও? দুরাশা কম নয়। গান্ধী মুখে বলেন না। বুঝিয়ে দেন প্রকারান্তরে (Gandhiji by now inclined more to the view that the allies could not win the war.—Azad)

গুঞ্জন উঠে চারদিক থেকে। নানা ভাবের। নানা ধরনের। কেউ বলে গান্ধী ক্রীপ্‌স্-এর মুখের ওপর বলেছেন যে 'ডিস্‌অনারড চেক' দিয়ে তিনি কী করবেন। আবার কেউ বলেন যে, ঠিক ভাষাটা তা ছিল না। গান্ধী বলেছিলেন: "পোষ্ট ডেটেড্ চেক অন ক্র্যাসিং ব্যাঙ্ক।"

"আমি কিন্তু গান্ধীকে বুঝি।" বলছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, "সুভাষ বোসের এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবার প্রভাব গান্ধী-মনে কতটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে, আমি তা জানি।" (I also saw that Subhas Bose's escape to Germany had made a great impression in Gandhiji···and now I found a change in his outlook.—India wins freedom)

"আমি বুঝি কেমন করে গান্ধী রূপান্তরিত হয়ে চলেছেন। সুভাষ বসুর বীরত্ব, অসীম সাহস আর তাঁর কর্মকুশলতা গান্ধীকে মুগ্ধ করেছে। অনুপ্রাণিতও কম করেনি।" (many of his remarks convinced me that he admired the courage and

resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India.—Azad)

সহসা বাজ ভেঙ্গে পড়ে ভরতবর্ষের মাথায়। সুভাষ মারা গেছেন। টোকিওতে হয়েছিল সমগ্র প্রাচ্যের এক সম্মেলন। প্রাচ্যের, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন অনেক প্রতিনিধি। সুভাষ যাচ্ছিলেন বার্লিন থেকে। পথে প্লেন ভেঙ্গে পড়ে।

পাণ্ডুর হয়ে গেল দিনের আলো। ছিদ্রহীন জমাট আঁধারের বুকে একটিমাত্র জ্যোতিষ্ক আলো ছিল। নিভে গেল। হাহাকারে ভরে গেল দেশের আকাশ। আর্তনাদে ছেয়ে গেল বুকের অন্তস্থল। সুভাষ নেই।

চোখের জল মুছে কাঁপা হাতে গান্ধী টেলিগ্রাম লিখে পাঠালেন মা জননীর নামে।

আমরা সেদিন মা জননীর পাশেই ছিলাম। চোখে নেমেছিল মায়ের বৃষ্টির ধারা। ওষ্ঠে স্মিত হাসি। বেদনা আর গৌরব চলেছে পাশাপাশি। সুভাষ জননী। মা।

কথা ফুটল অনেক পরে। বললেন: "আমি বিশ্বাস করিনে। সুভাষ মরতে পারে না।"

বস্তুত পুরো ঘটনাটিই ছিল ইংরেজের কারসাজি। ওরা একটিলে ছুটি পাখি মারতে চেয়েছিল। সুভাষ বোস ঠিক কোন স্থান থেকে রেডিও মারফৎ বক্তৃতা দেন, এটা প্রথমটায় ওরা বুঝতে পারেনি। এই সংবাদে ব্যস্ত হয়ে সুভাষ আর কারও জন্য না হলেও মায়ের জন্য অন্তত তাঁর নিরাপদ অবস্থান-তথ্য জানিয়ে দেবেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইংরেজ এ-পথ অবলম্বন করেছিল। তাছাড়া, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, সুভাষের মৃত্যু-সংবাদ কী প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেটা জানাও সম্ভবত ওদের প্রয়োজন ছিল।

ফল কিন্তু উল্টোই হল। দূর বিদেশের অনাত্মীয় পরিবেশে নিজের মৃত্যু সংবাদে প্রথমে খানিকটা বিমূঢ় তিনি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন কিন্তু

ভালোও তাঁর কম লাগেনি। স্বতোৎসারিত শোকোচ্ছ্বাস বেরিয়ে এসেছিল প্রতিটি ভারতবাসীর বুকের ভেতর থেকে। সবাই হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কিন্তু দেশবাসীর মৌনমূক বেদনার গুপ্ত ও সুপ্ত উপচার ভাষা হয়ে বেরিয়েছিল গান্ধীর কণ্ঠে। তিনি তা শুনতেও পেয়েছিলেন।

গান্ধী! এ কী অপরূপ রূপ গান্ধীর? এই গান্ধী বলেছিলেন যে অহিংসা তাঁর ভগবান? "হিংসার বিনিময়ে যদি স্বাধীনতা আসে সে স্বাধীনতা আমি চাইনে।"—একথা কি এই গান্ধী বলেছিলেন? সর্বোপরি এই গন্ধীই কি সেই গান্ধী, যিনি বলতে পেরেছিলেন যে, আর যাই হোক সুভাষ দেশের শত্রু নয়?

কোন্ জাদুকরের সম্মোহন নতুন করে গান্ধীর এই রূপান্তর ঘটাল।

কিন্তু বেদনায় নীল হয়ে গেলেন ক্রীপ্‌স্। অহিংসার চিরপূজারী গান্ধীর কণ্ঠে কেন বামাচারীর এই বাণী? গায়ে ওর হিংসার রক্ত না? সুভাষের প্রতি এই সীমাহীন শ্রদ্ধার তর্পণ কোন্ স্বাক্ষর রেখে যাবে অনাগত ইতিহাসের বুকে? গান্ধীও সুভাষের সশস্ত্র অভিযান সমর্থন করেছিলেন?

একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই ক্রীপস্ নিয়ে যেতে পারেন নি ভারতবর্ষ থেকে।

দুঃখের দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সুভাষ বেঁচে আছেন।

সুভাষ চিরজীবী। সুভাষ চির যুবা।

অমরত্বের জয়টিকা স্বয়ং বিধাতাপুরুষ এঁকে দিয়েছিলেন ঐ পূত শুভ্র ললাটের মধ্যভাগে।

সুভাষ জিন্দাবাদ। নেতাজি জিন্দাবাদ।

ঘরে ঘরে সেদিন মঙ্গল শঙ্খ বেজেছিল।

বার্মা-রণাঙ্গণের ভার দেয়া হল জেনারেল আলেকজেণ্ডার-এর ওপর। ইংরেজের বিখ্যাত ও বিচক্ষণ সেনাপতি এই আলেকজেণ্ডার। ডানকার্কের সময়কার জেনারেল।

বার্মার ভাগ্য ইংরেজের কাছে আর অজানা নয়। যেদিন রেঙ্গুন গেছে, সেইদিনই বাদবাকি বার্মার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়েছে। আমেরিকার ষ্টীলওয়েল ও ইংরেজের আলেকজেণ্ডার সম্মিলিতভাবে পালিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা দেখাতে লাগলেন।

১৭ই মে আলেকজেণ্ডার এসে পৌছোলেন ইম্ফলে। পথে পড়ে রইল অগণিত নর, নারী, শিশু, বৃদ্ধ। মৃত্যু, মহামারী, গুণ্ডার অমানুষিক হৃদয়হীনতার সে এক পৈশাচিক সমারোহ।

একটা শতাব্দীর লুণ্ঠন ও শোষণের ইতিহাস বৈদেশিক আর এক শত্রুর আক্রমণে নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের নজির তুলে ইংরেজ শাসন করেছে সর্বত্র। ঔপনিবেশিক বর্বরতার হিংস্র ও লোভাতুর আচরণের ওপর থেকে অসার ও মেকি সভ্যতার জীর্ণ পলস্তারা খসে পড়ল চোখের পলকে। কোথায় থাকল ইংরেজের ষ্টীল ফ্রেম? হাতে গড়া আই, সি, এস? তার গভর্ণর? তার ল্য-এ্যাণ্ড-অর্ডারের ইস্পাত কাঠামো পুলিশ? আর রক্ষা-কর্তা সামরিক বাহিনী? সব ফেলে, সব খুইয়ে ইংরেজ পালিয়ে এল ;—তার নিজের দেশে নয়,—ঐ বার্মার মতোই আর একটা উপনিবেশ,—ভারতবর্ষে।

পার্ল হারবারের ওপর জাপানী আক্রমণ শুরু হয়েছিল ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১), আর মালয়, বার্মা, সিঙ্গাপুর, সমগ্র ভারত-মহাসাগরের পূর্ব উপকূল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপনিবেশগুলি ইয়াঙ্কি ও ইংরেজ শাসন-শূন্য হয়ে গেল ১৭ই মে (১৯৪২)। অর্থাৎ সামান্য পাঁচটি মাসে একটি বিরাট ভূখণ্ডের শ্বেতকায় প্রভুত্ব টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

বিংশ শতাব্দির সূচনায় (১৯০৫) রাশিয়াকে হারিয়ে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র প্রাচ্য দেশ সমগ্র এশিয়ার বুকে নবতম স্পন্দন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সেদিনও জাপানের কোন

সম্পর্ক ছিল না। তবু ভারতবাসী,—বিশেষ করে বাঙালি সেদিন পুলকিত না হয়ে পারেনি। গায়ের রং-এর সাদৃশ্য ও ভৌগলিক নৈকট্য হয়তো ইন্ধন কিছুটা জুগিয়েছিল, কিন্তু তার চাইতেও এই কথাই সেই পুলকের ভেতর দিয়ে ভারতবাসী বলতে চেয়েছে যে, তার স্বাধীনতার শ্বেতকায় অপহরণকারীকে সে দণ্ড দিতে পারেনি তার অপারগতার জন্য, কিন্তু অপহরণকারীর ওপর তাই বলে তার না ছিল প্রশ্রয়, না ছিল প্রেম। ছিল না বলেই শ্বেতকায় প্রভুত্বের পরাজয়ে সে উল্লাস প্রকাশ করেছে।

বিদ্বেষ সর্বথা নিন্দনীয়,—উত্তম আদর্শ ও উপদেশ নিঃসন্দেহে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, মানুষ সর্বদেশে ও সর্বকালে একে প্রশ্রয় দিয়েছে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে। এবং দিয়েছে নিজের গরজে আর প্রয়োজনে। ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল তাই অনায়াসে বলতে পেয়েছিলেন: "যে-কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি নাৎসি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে বা তারাই আমাদের সাহায্য পাবে। যে কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি হিটলারের সঙ্গী হবে, সে বা তারাই হবে আমাদের শত্রু…"। এই দার্শনিক তত্ত্বের মহিমায় চিরশত্রু কম্যুনিষ্ট-রাশিয়াকে বুকে টেনে নিতে ইংরেজের আটকাল না কোথাও।

পাশ্চাত্য-প্রেমিক জহরলাল পর্যন্ত এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সেদিন এসিয়ার শ্বেতকায় প্রভুত্বের অবসানে দেশের অভ্যন্তরে বিলক্ষণ আনন্দ দেখা দিয়েছিল। এই জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য জনিত আনন্দোচ্ছ্বাস এ-দেশবাসীর অন্তরে উদয় হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে, সন্দেহ নেই; কিন্তু ওদের অর্থাৎ শ্বেতকায় প্রভুদের অন্তর্দাহ ও গাত্রজ্বালা নেহায়েৎ কম হয়নি। এবং তার উদাহরণও দিয়েছেন জহরলাল নিজেই। তিনি বলেছেন: "ইংরেজ তরফেও এই জাতিগত ভাবপ্রবণতা দেখা দিতে কসুর করেনি। পরাজয় ও অবর্ণনীয় ক্ষয় ও ক্ষতি এমনিতেই হয়েছিল মারাত্মক; কিন্তু ওর দাহ আরো বেড়ে গিয়েছিলো এই কথা মনে করে যে, ওটা ঘটলো এসিয়ার একটা বর্ণ-খাটো জাতির হাতে।

"একজন বেশ উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ কর্মচারী আরো একটা খুলেই বলে ফেলেছিলেন যে, 'প্রিনস অব ওয়েলস্' আর 'রিপালস্' জাহাজ দু'খানি জাপানীর হাতে না ডুবে যদি জার্মেনীর হাতে ডুবতো, তাঁদের তবু একটু সান্ত্বনা থাকতো।" (১)

জাপানের জয়ে, তাই, ভারতবাসী এবার উল্লসিত না হয়ে পারেনি।

সেদিনকার জাপানের মনোভাব চমৎকার ফুটে উঠেছে তার সামান্য একটু ইঙ্গিতে। জাপান বলেছিল: "একদিন আমরা তোমাদের কাছে আমাদের প্রাচীন চারু ও কারু শিল্পের এবং কৃষ্টির অনবদ্য উপহার পাঠিয়েছিলাম। তা দেখে তোমরা আমাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছিলে। হেসেওছিলে। তারপর আমরা গড়ে তুললাম বিরাট নৌবহর আর সৈন্যদল। তাদের সজ্জিত করলাম মারাত্মক অস্ত্র-সম্ভারে। তোমরা সভ্য বলে আমাদের স্বীকার করে নিলে।" (২)

১৯৪১-এর নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ রেডিওর শুভারম্ভ হয়। প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত, তারপরই নেতাজির বক্তৃতা। জীবনের সে এক অভাবনীয় মুহূর্ত। এই প্রথম প্রাণ খুলে মহিমান্বিতা জন্মভূমির কথা তিনি বিশ্বের কাছে বলবার অবকাশ পেলেন। কথা নয়, ছন্দ-বদ্ধ কবিতা। মহাকাব্য রূপ নিয়ে ধরা দিল নেতাজির কণ্ঠে। সাথী গনপুলে বলেছেন: "স্বভাবতই নেতাজি ছিলেন স্বল্পবাক ও অচঞ্চল। এ-দিনের চাঞ্চল্য তিনিও রোধ করতে পারেন নি। সেদিন প্রাণে তাঁর জেগেছিল একটা অনাস্বাদিত পুলক। উত্তেজনাও কি কম হয়েছিল?"(৩)

সত্যই তিনি ছিলেন অসাধারণ। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ছিল তাঁর চাইতেও অসাধারণ। শুধু একটি স্টেশনের আজাদ হিন্দ রেডিও নিয়ে

(১) ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া—জহরলাল

(২) ভয়েস অব জাপান—চার্চিলের 'দ্বিতীয় বিশ্বসমরে' উদ্ধৃত।

(৩) নেতাজি ইন জার্মেনী।

তিনি সন্তুষ্ট নন। অনতিবিলম্বে শুরু হল আরও ছুটি। কংগ্রেস রেডিও এবং আজাদ মুস্লিম রেডিও।

কংগ্রেসের দোমনা মনোভাব নেতাজির অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাঁর প্রিয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নামে কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মীর কানে তিনি আপোসহীন সংগ্রামের বাণী শোনাতে চান। শোনাতে চান বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মুক্তির ইতিহাস। নব্য তুর্কীর নব জন্মদাতা কামাল আতাতুর্ক কেমন করে মরা তুরস্কের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, বহু শতাব্দীর অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তুরস্কের নরনারী এই একটি বিপ্লবীর স্পর্শে কেমন করে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে,—সেকথা তিনি শোনাতে চান তাঁর দেশের মুশলিম জনতাকে। সর্বোপরি সাবধান করতে চান সবাইকে ধূর্ত ইংরেজের ফাঁদে পা না দিতে।

হাতে গোনা সামান্য কয়েকজন কর্মী। তাও আনকোরা নতুন। এ-কাজে কেউই দক্ষ নয়। কেউ এসেছে কলেজ ফেলে, কেউ চাকুরী। অসমাপ্ত জীবনের অসম্পূর্ণতা ছাড়া তাদেরও বেশি কিছু দেবার মতো সঞ্চয়ই কি ছিল? হয়তো ছিল না। কিন্তু যা ছিল, তা-যে অসামান্য। আশ্চর্য। ছিল অকুতোভয় দেশপ্রীতি। ছিল অবারিত মুক্তি-প্রেম। আর ছিল তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাজির প্রতি অখণ্ড ও অলৌকিক আনুগত্য ও ভালোবাসা।

সংসার ছিল। ছিল সংসারের সহস্র চাওয়া ও কথা। ছিল কিন্তু আর রইল না। সবই পেছনে রইল পড়ে। কী এক ভয়ঙ্কর উল্লাসে সবাই মেতে উঠল ঐ রুদ্র পূজারীর ডাকে।

বক্তৃতার বিষয়বস্তু লেখা, তাও বিভিন্ন ভাষায়, নানাদেশের কথা আর সংবাদ সংগ্রহ করা, অনুবাদ করা, তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় মতো বলা। বিরামহীন কাজ। অবকাশহীন কর্ম-তালিকা।

সবাই প্রায় যৌবনের প্রথম ধাপে। কুরি থেকে ত্রিশের কোঠায়। দু-একজন একটু ভার-ভারিক্কি। সবাই কেন,—কেউই জীবন শুরু করেনি নাঙ্গা সাধুর আওতায়। আর সকলের ন্যায় এদেরও প্রাণে

ছিল ভিন্নতর স্বপ্ন, কল্পনা, আশা। ঘর বাঁধবার, সুখ ও শান্তির মুখ দেখবার, দেহের ও মনের ও পেটের ক্ষুধার উপযুক্ত খাদ্য দেবার। ছিল কিন্তু গেল কোথায়? দিনান্তেও আর সে-কথা মনে কারও জাগল না। ডুবে গেল সবাই এক নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহে।

সব সংগ্রহ করে, প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে আসতে হবে রোজ। নিয়মিত সময়ে। এক নাগারে কাজ চলবে তিন ঘণ্টা। বিরাম নেই, নেই ছেদ। পুনরাবৃত্তি চলবে না। চলবে না বাসী বা বাজে খবরের পরিবেশন। সব চাই টাটকা। চিত্তাকর্ষক।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় যুদ্ধের রূপ চলেছে পরিবর্তিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যও না? কে জানে আগামীকাল কোন রূপে ভাগ্য ধরা দেবে? তাছাড়া, শেষ পরিণাম? উপসংহার? অজানা একটা বিপুল ভাষাহীন অবয়বহীন বিস্ময় শুধু প্রত্যক্ষ হয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন ঐ মানুষটি চলতে থাকেন তাঁর সাধনার মশাল বর্তিকা জ্বালিয়ে নিত্য নতুন পথের সন্ধানে। নিজের আলোয় উনি পথের আঁধার দূর করেন। প্রাণের ঐকান্তিক তপস্যা দেখিয়ে দেয় আদর্শ আর লক্ষ্যের দিব্য মূর্তি।

সব খুঁটিনাটি ভেবে আর খতিয়ে নেতাজি দেশত্যাগ করেননি। এখানে এসেও নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু স্থির করবার অবকাশ তিনি পাননি। প্রতিকূল পরিবেশে কী কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধি, বিচার,—সর্বোপরি অটুট সঙ্কল্পের যথার্থ প্রয়োগ-নৈপুণ্য থাকলে এই অল্পদিনে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, প্রত্যক্ষ না করলে তা বিশ্বাস করাই কঠিন। পদানত নানাদেশের নানাধরণের এক-একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্র-নায়ক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে তাদের না ছিল সমাদর, না ছিল শ্রদ্ধা। ইতিহাস তাদের কথা ভুলে যাবে। এবং গেছেও।

কিন্তু বিদ্রোহী ও বিপ্লবী সুভাষ বোসকে ইতিহাস ভোলেনি,

শুধু এই কথাটিই যথেষ্ট নয়,—সুভাষ বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় সমরের অন্যতম ইতিহাস স্রষ্টা, একথাও ইতিহাস বুকে ধরে রাখবে।

অশান্ত সুভাষ। সুভাষ অক্লান্ত। অল্পে তুষ্টি নেই। সামান্য তাঁকে আকর্ষণ করে না। কল্পনার অগাধ ও অবাধ বিস্তৃতির সঙ্গে অপূর্ব এক বাস্তবধর্মিতার বিস্ময়কর সমন্বয়।

আগামী কালের স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চান শিল্পী স্বাধীন দেশের দৃষ্টান্তে। অসামরিক আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ গড়তে-না-গড়তে মনে জাগে ভিন্নতর স্বপ্ন। আগামীকালের কত দুরূহ সমস্যাই-না প্রতীক্ষায় আছে স্বাধীনতার দিকে চেয়ে। শোষিত ভারতের অর্থনৈতিক রূপ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। নতুন ভারত গড়ে উঠবে শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষি-সম্পদে। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই রক্ষীবাহিনী। ফৌজ। ওরা না থাকলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে কে? যুগে যুগে সোনার ভারতকে রক্তাক্ত করেছে এরই পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে।

সিদিবারানি, তব্রুক আর মারসামাট্রুতে রোমেল বিস্তর ভারতীয় সৈন্য বন্দী করেছেন। আফ্রিকার রণক্ষেত্র মূলত ছিল ইটালীর অধিনায়কত্বে। তাই বন্দীরাও আসত প্রথমে ইটালীতেই। এদেরই একটা অংশ, সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার, আনা হয়েছিল জার্মেনীতে।

জনা-কয়েক করে ভারতীয় বন্দীকে নিয়ে আসা হত বার্লিন রেডিও স্টেশনে। বক্তৃতা করাতে এবং প্রয়োজন মতো ওদের দিয়ে হিন্দী বা উর্দু ভাষায় নানা কথা অনুবাদ করিয়ে নিতে। ওদের সঙ্গে নেতাজির আলাপ হয়ে গেল একদিন।

সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে উঠল কল্পনার নবতম রূপ,—ফৌজ। আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারতীয় লিজিয়ন।

কিন্তু রেডিও স্টেশন পরিচালনা করা কিম্বা অসামরিক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আর লিজিয়ন তৈরী করা এক নয়। এক-যে নয়, একথা নেতাজিরও অজানা নয়।

চিরজীবনের স্বপ্ন : একটি মিলিশিয়া। ফৌজ।

আর তাই নিয়ে গ্যারিবল্ডি কিম্বা ওয়াশিংটনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর বুকে। ছিনিয়ে আনবেন অপহৃত স্বাধীনতা। সেই দিন এল। সত্যিই কি এল ?

এল। জার্মেনীর আন্নাবুর্গ্ ক্যাম্পে বন্দী জীবন যাপন করছে ভারতীয় বন্দী সৈনিকেরা। স্বপ্ন গাঢ় হয়ে ওঠে নেতাজির চোখে।

তৎক্ষণাৎ বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। এবং সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে খুব বেশি সময়ও লাগল না। একবার কোন নতুন ভাব বা কথা মাথায় ঢুকলে হল। তখুনি ছুটতে হবে তার সমাধানে। ছুটলেনও তাই। ছুটলেন বন্দী-শিবিরে।

রাশিয়ায় প্রাথমিক সাফল্য সমগ্র জার্মান জাতকে মাতাল করে তুলেছে। ঠিক এই মোক্ষম সময়ে গেল নেতাজির প্রস্তাব। জার্মানরাও কিছু কাজ এর পূর্বে নিজে থেকেই শুরু করেছিল। বিশেষ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল কতক ভারতীয় বন্দীকে। নেতাজির এই প্রস্তাবে ওদের আর দ্বিধা করবার কিছুই রইল না।

হাজার হাজার ভারতীয় বন্দী। এদের নিয়ে যদি বিরাট একটি বাহিনী সত্যিই গড়ে তোলা যেত। আর সেই বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ পেতেন শত্রু ইংরেজের বুকে,—এই সময়ে। নেতাজির কল্পনা ছাড়িয়ে যায় মাটি,—অনেক অনেক উর্ধ্বে ওরা উড়তে থাকে।

কিন্তু তাঁর সে সম্পদ কই ? কে দেবে তাঁকে এই অতুল ঐশ্বর্য ? অফুরন্ত ধনভাণ্ডার ? এতো তাঁর দেশ নয়। নির্বান্ধব পুরীর এক নবাগত অতিথি তিনি। হিটলারের দাক্ষিণ্যের ওপর তাকিয়ে সত্যিই কি তা করা যায়। তাছাড়া স্বাধীন ভাবে কোথায় তিনি ইংরেজকে আঘাত হানবেন ? পূব দিকে চলেছে যুদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে। প্রথম থেকেই নেতাজি এই আক্রমণ অনুমোদন করতে পারেননি।

গোয়েবল্‌স্ আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে নেতাজিকে অনুরোধ করেছিলেন। নেতাজি রাজী হননি।

প্রথম থেকেই ওদের কানের কাছে একটা কথা নেতাজি স্পষ্ট করে বলেছিলেন। যত ইচ্ছা হিটলার যুদ্ধ করুন এবং ইচ্ছা মতো ও পছন্দ-মাফিক প্রতিপক্ষও বেছে নিন,—নেতাজি ওতে নেই। শত্রু তাঁর মাত্র একটি। ইংরেজ। এবং তাঁর সংগ্রাম চলবে শুধু তারই বিরুদ্ধে।

প্রত্যক্ষভাবে কোন ফ্রন্টেই ইংরেজের পাত্তা নেই, এক আফ্রিকার ফ্রন্ট ছাড়া। ইংরেজ এ-ফ্রন্টে বিপুল ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত করেছে। এদের বিরুদ্ধে নেতাজি এই মুহূর্তে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ পাঠাতে রাজী নন। এই অবস্থায়, তাই, বৃহদাকারে জাতীয় বাহিনী তিনি গড়তে চান না। অল্প সংখ্যক সৈনিককে তিনি বর্তমান রণনীতি ও কৌশলে দক্ষ করে তুলতে চান। এরাই হবে স্বাধীন ভারতের রক্ষী বাহিনীর পথিকৃৎ।

ইংরেজ অতি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে ভারতীয় বাহিনী গঠন করত না। পদোন্নতি ছিল সীমিত। আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যা শেখাতে এবং উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করতে ভয় পেত। মেঠো কুচ-কাওয়াজ, রাইফেল ছোড়া, হাতাহাতি যুদ্ধে সঙ্গীন ব্যবহার ; কিছু হালকা মেশিনগান ও কামান ছোড়া,—এই ছিল ভারতীয় সৈন্যের সামরিক দৌড়। এবং এদের কাজও ছিল তথৈবচ। সামান্য কিছু আধা ওপরের কর্মচারী ছাড়া সবাই ছিল মৃতের সংখ্যা বাড়াবার উপাদান। মরতে ভারতীয় সৈনিক,—আবার বন্দী হতেও তারাই।

নেতাজি ভাবেন আগামী দিনের কথা। স্বাধীন ভারতবর্ষ রক্ষার দায়িত্ব নেবে কারা? ইংরেজের ভাড়া খেটে যাদের জীবন গেল কেটে, দাস মনোভাব যাদের মূলধন,—তারা কি বৈদেশিক আক্রমণ,—যদি কোনদিন ঘটেই,—প্রতিহত করতে পারবে? না, তাদের সে-যোগ্যতাই আছে?

শিক্ষিত লোক সেনাদলে নেয়া ইংরেজের পছন্দ নয়। গেঁয়ো সরল চাষী-মজুরদের টাটকা ও তাজা জওয়ানরাই ওদের শিকারের

লক্ষ্য। কিছু টাকা বর্তমানে, আর ভবিষ্যতের স্থায়ী পেনশন। ব্যস। ওরা দেশ চেনে না। বোঝে না দেশের স্বার্থ। স্বাধীনতা কী,—তাও কি জানে? ইংরেজ দেড়শো বছর ধরে যে-কথা ওদের শেখাল, তাই শুধু ওরা জানে। এবং মানেও।

অফিসার তৈরী করতে ইংরেজ কজা করে একেবারে বাচ্চা শিশুদের। গড়ে-পিটে ওদের মানুষ করে তোলে। ভারতবর্ষে ওদের কারখানা আছে। এবং আরও মজবুত ও মনোমতো ভৃত্য তৈরী করতে পাঠিয়ে দেয় স্যাণ্ডহারস্ট্-এ, খাস বিলিতি কারখানায়।

ইংরেজের দুটি প্রধানতম হাতিয়ার, আই, সি, এস, আর স্যাণ্ডহারস্ট্ ফেরতা জঙ্গী অফিসার। এরা ইংরেজ রাজত্বের দুটি নিরেট স্তম্ভ। এরাই অটল রাখল ইংরেজের সাম্রাজ্য দেড়শো বছর।

স্বাধীন ভারত এদের নিয়ে নয়; স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবে নতুন শিল্পী। নব পরিকল্পনার নব রূপায়নে গড়ে উঠবে নবভারতের ধ্যানমূর্তি।

সে ভারতে থাকবে না 'আমি,' সব হয়ে উঠবে 'আমরা'। ব্যক্তি নয়,—সমষ্টি। পরিবার হবে সমগ্র দেশবাসী।

ইংরেজের হাতেগড়া ঐ ভৃত্যের দল,—তারা কি চিনবে এই ভারতকে?

এই ভারতের জন্য, তাই, চাই একটি কুশলী ফৌজ। যাদের চোখে থাকবে আগামী দিনের স্বপ্ন। বুকভরা থাকবে দুর্জয় সঙ্কল্প। আর বাহুতে অমিত বীর্য।

হুড়মুড় করে মুখস্থ বুলি নেতাজি বন্দীদের কাছে উদ্গীরণ করেন নি। বেশ কয়েকদিন ধরে ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশলেন। শুনলেন ওদের কথা। শুনলেন ওদের অভাব, অনটন, দেহ আর মনের দুঃখের কাহিনী।

ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন দেশের কথা। জাতির দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কাহিনী। বললেন নিজের কথাও কিছু কিছু। ওরা শুনল।

চুপ করে থাকল প্রথমটায়। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত চেতনার পর্দায় ভেসে উঠতে চাইল অস্ফুষ্ট একটা অনুভূতি। দেশ···জাতি···হিন্দুস্থান। সঙ্গে একটা নাম,—সুভাষ···নেতাজি।

নিজ দেশের বন্দী-জীবনের স্বল্প পরিসর গণ্ডী অতিক্রম করে যে-মানুষটি নিজের কথা না ভেবে, সারাজীবন নিজের জন্য কিছু না চেয়ে ছুটে এল এই দুস্তর পারাবারে, এবং এখানে এসেও যার সমগ্র এবং একমাত্র চিন্তা দেশ ও তার মুক্তি,—কতক্ষণ থাকা যায় তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে? বরফ গলতে থাকে। মৌন মূক সৈনিকের প্রাণে লাগে দোলা। এগিয়ে আসে কাছে। তাকায় মুখের পানে। চোখের কোণ ওদের চিকচিক করে ওঠে।

রক্ত আকর্ষণ করে রক্ত। উঠে দাঁড়ায় একজন। পেছনে আর একজন। তার পেছনে আরও। গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ। স্বপ্নের লিজিয়ন।

পনের জনের ছোট্ট দল। প্রথম যাত্রা হবে ওদের ফ্রাকেনবুর্‌গ্‌-এ। লিজিয়নের হেড-কোয়ার্টার ফ্রাকেনবুর্‌গ্‌। সারা বার্লিন সহরের ভারতীয়েরা এল সম্বর্ধনা সভায়। চোখভরা সকলের অশ্রু। বুকে আনন্দের শিহরণ। অনাগত স্বাধীন ভারতবর্ষের নব-গঠিত বাহিনার প্রথম অভ্যর্থনা।

পনেরজনের দশজন ছিল পড়ুয়া ছাত্র। বাকি পাঁচজন বন্দী জওয়ান। খুবই অনাড়ম্বর আয়োজন। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। কিন্তু অন্তর কানায় কানায় ভরা।

একটা বিশেষ দিন। বিশেষ একটি ক্ষণ। যে-ব্যক্তিটি বিদেশ-বিভূঁই-এর আগুন-ঘেরা ব্যূহমুখে দাঁড়িয়ে এই অসাধ্য ও অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বাস্তব করে তুললেন, জনতা নির্নিমেষ নয়নে দেখছে শুধু তাঁকেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজ। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্মদাতা নেতাজি।

জনতা গর্জে ওঠে। আক্রমনোদ্যত বাঘ-আঁকা ব্যাজ ওদের বুকে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা চলে ফৌজের আগে। ওরা মার্চ করে। সেলাম জানায় ওদের অধিনায়ককে। নেতাজিকে।

সামান্য কয়েকটি কথায় নেতাজির বক্তব্য শেষ হয়ে গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ চুপ হয়ে গেল সহসা। সৈনিকের মৌনবাণী কথা বলে সৈনিকের কানে। বহ্নি বন্যায় জ্বলে ওঠে প্রাণ।

অন্যতম সাথী গিরিজা মুখার্জি লিখছেন: "কেমন করে জনতা তাঁর কথায় সম্মোহিত হয়ে গেল, আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।... কথা তাঁর শেষ হয়। প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে রূপান্তরিত মনে করে। প্রাণে জাগে প্রতিটি মানুষের নতুন প্রেরণা। আর নবতম উল্লাস।" (১)

(১) অধ্যাপক গিরিজা মুখার্জি প্রণীত 'দিস্ ইওরোপ'

॥ চার ॥

আনন্দ হয়েছিল বৈকি। সবাই-এরই হয়েছিল। হয়েছিল গোটা ভারতবর্ষের। চতুর ইংরেজের ধাপ্পায় এ-দেশ ভোলেনি। ভুলতে দেননি তার নেতা—গান্ধী।

খুসিতে ভরপুর নেতাজিও। সারা অঙ্গে খুসি। মনের খুসির অবধি নেই।

মে মাসের (১৯৪২) প্রথমেই আজাদ হিন্দ রেডিও গর্জে উঠল : "আমার বোনেরা আর ভাইরা, ইংরেজের জঘন্য প্রস্তাব তোমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। সাবাশ।

"কিন্তু তোমাদের মধ্যে আজো গুটিকয়েক লোক আছে, যারা অহরহ পরিচয় দেয় নিজেদের কংগ্রেসের সভ্য বলে। তারা কিন্তু এর পরও ইংরেজদের সঙ্গে সর্তাধীন সহযোগিতার কথা ভাবছে। এরা কংগ্রেসের আদর্শ ভুলে গেছে।···একথাও ভুলে গেছে যে, ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে এর পূর্বে অনেক কংগ্রেসকর্মীর বিচার হয়েছে। সাজাও পেয়েছে তারা। (১)

"ইংরেজ-প্রেমের এই নব প্রণয়ীরা সম্ভবত ইংরেজের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্য দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছে। বহিরাক্রমণ এরা রুখতে চায়। কিন্তু তারা কি একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ? ইংরেজের আক্রমণ দেশবাসী প্রতিরোধ করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে ; সেই আক্রমণের অবসান ঘটবে কেমন করে ?

"ইংরেজের আজকের এবং অদূর ভবিষ্যতের সমস্ত প্রচার কৌশল সত্ত্বেও প্রতিটি চিন্তাশীল ও প্রাজ্ঞ ভারতবাসীর মনে দিবালোকের

(১) এম. এন. রায়, ডাঃ সত্য পাল প্রভৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি কথা : ভারতবর্ষের শত্রু মাত্র একটি, যে-শত্রু শতবর্ষেরও অধিক ভারতকে শোষণের হিংস্রতায় অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে। শুষে নিয়েছে ভারতজননীর ধমনীর রক্ত। সেই শত্রু, সেই একমাত্র শত্রু আর কেউ নয়,—ইংরেজ।

"আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। কিম্বা ওদের সমর্থন করা আমার পেশাও নয়। ও-কাজ ওরা নিজেরাই করবে। এবং তা করবার ক্ষমতাও ওদের আছে যথেষ্ট। আমার মাথাব্যথা একমাত্র ভারতবর্ষের জন্য। আর তার মুক্তি। ইংরেজের পরাজয় মানে ভারতবর্ষের মুক্তি। স্বাধীনতা। পক্ষান্তরে যদি ইংরেজ এবারও জিতেই যায়,—যদিও সে সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত,—অনাগত বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষের পরাধীনতা থাকবে অনড় হয়ে। দুটো পথ ভারতবর্ষের সম্মুখে প্রসারিত : স্বাধীনতা আর পরাধীনতার পথ। একটা তাকে বেছে নিতেই হবে।···

"বন্ধুগণ, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, কী অপূর্ব কৌশলে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই-এর নামে ইংরেজ ভারতবর্ষে আমেরিকার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে। আমেরিকার কূটনীতিবিদ, বনিক আর সৈনিকরা ভারতের বুকের ওপর জেঁকে বসে গিয়েছে এবং এর যদি আশু প্রতিকার না ঘটে, আর একটি নবতম সাম্রাজ্যবাদী ভারতের মাটিতে শেকড় দাবিয়ে বসে যাবে। আমেরিকার ওয়াল্ স্ট্রীট আর হোয়াইট্ হাউস্ ইংরেজের আসন কেড়ে নিয়েছে।"

আজকের,—১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কথা নয়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। সেদিন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে একটি নিপীড়িত মুমুক্ষু প্রাণ ভারতবাসীকে এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম। মনে রাখিনি। ভুলে গেছি। কিন্তু ইতিহাস ভোলেনি। ভুলবেও না। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রতিটি ভারতবাসী ভাবতে বাধ্য যে, ইংরেজের স্থান পুরোপুরি গ্রহণ করতে আমেরিকার আর লাগবে ক'দিন ?

বিপ্লবীর চোখে বর্তমান মায়া নয় ; কিন্তু বর্তমানই সব নয়।

প্রত্যক্ষ বর্তমানের অনতিদূরে রয়েছে ভবিষ্যৎ। সে জানে আগামীকাল গতকাল হতে লাগে কয়েকটা মুহূর্তমাত্র।

তবু বিপ্লবী স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নের গায়ে থাকে আশার আলো। মর্মে তার অস্পষ্ট কুহেলিকা। বুকে তার অপূর্ণ কামনা-পূরণের অশান্ত আকুতি।

তাই ছিল নেতাজির। তাই থাকে প্রতিটি দুর্লভ মানব প্রধানের। ভারতবর্ষের অনেক অনেক যুগের পর পাওয়া এক স্বয়ংসিদ্ধ বিপ্লবী। নেতাজি।

নেতাজি বলেই চলেছেন: "বন্ধুগণ, শুধু শেষ সংগ্রামের জন্যই আমরা তৈরী হইনি। অনাগত দিনের ভারতবর্ষ কোন্ বিচিত্রতায় অপরূপ হয়ে ফুটে উঠবে, সে কথাও আমরা মনে রেখেছি। মুক্তি যোদ্ধারা, ঝাঁপিয়ে পড়ো সংগ্রামে। মুক্ত করো দেশ-জননীর বন্ধন শৃঙ্খল। তারপর এমন ভারতবর্ষ গড়ে তোলো যার ভবিষ্যৎ হবে সর্ববন্ধনহীন। যার সকল ব্যবস্থার একচ্ছত্র মালিক হবে সে নিজে। আর কেউ নয়।

"মুক্ত ভারত এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যার ভিত্তি হবে চিরন্তন ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অম্লান আদর্শ।"

সুভাষ বোস ফ্যাসিষ্ট। কিন্তু বিশ্বের কোন্ সাম্যবাদী এর চাইতেও গম্ভীর ও মহোত্তম সাম্যের উদাত্ত বাণী উচ্চারণ করেছে?

কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে জহরলাল ও আজাদ এ-কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, জাপান ছাড়াও আর কেউ আক্রমণকারী,—এ্যাগ্রেসর, থাকতে পারে। ইংরেজও-যে এ্যাগ্রেসর, এ-কথা এঁরা জানতেন, কিন্তু ভিন্নতর প্রয়োজনের তাগিদে তা ভুলেও গেলেন।

ইংরেজের দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণে সর্বদা অথবা সকল ক্ষেত্রে হয়তো প্রকাশ্য রূঢ়তা ও বর্বরতার ঝাঁজ ছিল না, কিন্তু তাই বলে ইংরেজ আদৌ এ্যাগ্রেসর নয়, এ-কথা কি সত্য? অথচ নানাভাবে দীর্ঘদিন ইংরেজের

সঙ্গে থেকে ও ইংরেজের সুকৌশলী কুট-নীতির কলাণে এঁরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ভেবে নিয়েছিলেন যে, ইংরেজ এ্যাগ্রেসর নয়।

দীর্ঘ পরাধীনতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। ও থাকে ও আছেও, কিন্তু বুঝতে দেয় না। ঘুম পাড়িয়ে রাখে। অফিমের ঘুম। এর সঙ্গে আসে বিজয়ীর কৃষ্টি-প্রভাব। কালচারাল কংকোয়েস্ট। বিজয়ীর ভালোকে মনে হয় ভালো বলে। প্রিয়কে প্রিয়তম।

জাপানকে রুখতে হবে উত্তম কথা, কিন্তু ইংরেজ? তার দেড়শো বছরের আক্রমণ-কথা ভুল হল কেমন করে?

বার বার জহরলাল নেহেরু এই ইনভেশন বা এ্যাগ্রেশনের কথা বলে চলেছেন। "ভারতবাসী বাইরের আক্রমণ সহ্য করবে না" ......"আক্রমনের সম্ভাবনা ক্রমশই বাড়ছে";......"আক্রমণ-সময় আসন্ন হয়ে উঠেছে";—এমনি ঝুরি ঝুরি আক্রমণ-বিভিষিকা জহরলাল নেহেরু নিপুনভাবে দেশবাসীর চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত বই-এতে। পড়েই মনে হবে যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের ওপর যেন একটা নতুন আক্রমনের উদ্বোগ চলছে। আর একটা কথাও হয়তো অনেকের মনে সেদিন জেগেছিল,—ঐ কথাগুলি সত্যিই কি জহরলাল নেহেরুর নিজের, না, তাঁর বন্ধু ইংরেজের?

কিন্তু জাপান আক্রমণ নাও করতে পারে, কিম্বা যদি করেই, কেন সে তা করতে চাইবে,—এ-কথার আলোচনা জহরলাল একবারও করেন নি। কিন্তু করেছেন গান্ধী। ইংরেজ দেড় শত বৎসর ধরে ভারতবর্ষের বুকের ওপর নিছক গায়ের জোরে বসে আছে, এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় জাপান ইংরেজকে এসিয়ার একটি বৃহত্তম ভূখণ্ড থেকে তাড়াতে চায় (হয়তো ইংরেজের স্থান গ্রহণ করবার লালসা থেকেও) এবং ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে জাপান আক্রমণ নাও করতে পারে,—একথা বলেছেন গান্ধী।

জহরলাল নেহেরুর অভিলাষ হয়তো ছিল সেই উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মচারীর মতোই; যদি পরাধীন থাকতেই হয়,

খর্বকায় ঐ এসিয়াবাসী জাপানী অপেক্ষা দীর্ঘকায় এবং উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ইংরেজের অধীনে থাকাই শ্রেয় ও শোভন।

হয়তো জাপানীরা ইংরেজের চাইতেও ভয়ঙ্কর, হয়তো আরও নিষ্ঠুর, আরও ক্ষমতামদগর্বীও কিন্তু জাপানের এ-পরিচয় ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অজানা।

জহরলাল নেহেরু স্বীকার না করলেও গান্ধীর এ-কথা অজানা ছিল না। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন: "যদি জাপান আক্রমণ করেই বসে, জনসাধারণ যে দুঃসহ পরিবেশে এসে পৌঁছেছে, এর চাইতে খারাপ কিছু হবে না। ভারতবাসীর ভুল হতে পারে, কিন্তু অজানা শয়তানের চাইতে চিরদিনই জানা শয়তানকে সবাই ভয় করে বেশি।" (In that case the masses would have to stand something no worse than they know already. Indians may be wrong, but they hate the devil they know more than the devil they don't know.) (১)

শ্যাম ও কূল দুটোই নেহেরু অনেকদিন রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু একটি বৃহৎ বিপর্যয়ের মুখে তিনি অনাবৃত হয়ে গেলেন পুরোপুরি। তিনি এবং তাঁর মতো দেশভক্তদের ইঙ্গ-আমেরিকার অভয় পক্ষপুট ছাড়া-যে কোন অস্তিত্ব একান্তই অবাস্তব, এ-কথাটাও তাঁরা জানতেন বিলক্ষণ। তাই, ইংরেজ বা মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যে-কোন কথা বা আন্দোলন নিজেদের বিপদ ও আপদ বলে ধরেও নিয়েছিলেন। এবং যথাসর্বস্ব দিয়ে ও যথাসাধ্য তা রুখতে হবে, এ-কথা বলতে কদাচ দ্বিধা করেন নি।

খোলাখুলি তাই জহরলাল নেহেরু বলতে পারলেন: "আমরা জনসাধারণকে এই কথাই বলতে থাকলাম যে, ইংরেজের ওপর বিরক্তি

(১) ম্যাডাম কুরীর কন্যা ঈভ কুরীর সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই 'জার্নি এ্যামোং ওয়ারিয়ার্স'-এ এবং এই বিবরণ গান্ধী নিজে দেখে অনুমোদন করেছিলেন।

থাকে থাক্, তাই বলে কোন ক্রমেই তারা যেন এমন-কিছু না করে যাতে করে ইংরেজ ও তার মিত্রদের সমরাভিযানের পথে বাধা হতে পারে। তা করলে আক্রমণকারী শত্রুকে অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হবে।" (We told them that inspite of their indignation against British Policy they must not interfere in any way with the operations of the British or allied armed forces, as this would be giving indirect aid to the enemy aggressor.) (১)

অর্থাৎ জহরলাল নেহেরুর কাছে ইংরেজ আর শত্রু নয়, (এ্যাগ্রেসর তো নয়ই),—শত্রু সেই, যে আদৌ ভারতবর্ষ আক্রমণ করল না।

স্বভাবত শান্তিপ্রিয় জহরলাল সেদিন সম্ভাব্য জাপান আক্রমণের কল্পনায় খানিকটা প্রতপ্তও হয়ে উঠেছিলেন। এবং প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে, এ-কথা ভেবে বিলক্ষণ রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন। (At the back of mind I was in a sense attracted to this coming of war···) (২)

উত্তপ্ত মস্তিস্ক শীতল করতে নেহেরু হিমালয়ের পথে রওনা হলেন। থামলেন শান্তি-ঘেরা কুলুতে।

কিন্তু গান্ধী ?

চিরদিন গান্ধী শান্ত। গান্ধী অচঞ্চল। জীবনের সুদীর্ঘদিন অতিক্রম করে সহসা এই স্থিতধী মানুষটির প্রাণে জেগে উঠল সত্যিই এক অভাবনীয় চাঞ্চল্য।

কোনদিনই গান্ধী চরমপন্থী ছিলেন না। ভারত-রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাব-কালেও না, পরেও না। মাঝখানে সামান্য কয়েকটি দিনের জন্য চরমপন্থীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন গান্ধী। ১৯২১-এ। প্রথমটায় তিলক ছিলেন চরমপন্থীদের নেতা, পরে সুভাষ। কিন্তু

(১)+(২) ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়া—জহরলাল নেহেরু

এইক্ষণে একটা আনকোরা নতুন ভাব-প্রবাহে গান্ধীর সকল চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এবং গেল অতিক্রুত এবং সবেগে।

গান্ধীর কানে বাজে অহরহ একটি গান। সামগানের মতোই তার তান। গীতার মতোই তার নবতম সুর। গান্ধী রেডিও শোনেন: "ভারত-মুক্তি-যুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক, জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তোমরা আজ শপথ গ্রহণ করলে। সেদিন আগত প্রায়, যেদিন দিল্লীর লালকেল্লায় সবাই মিলে এ-পতাকা তোমরা প্রণাম করবে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে যেয়ো না,—স্বাধীনতা পেতে হলে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েই তা তোমাদের পেতে হবে। ভিক্ষা মেগে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। নষ্ট স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে অপহারকের হাত থেকে। মূল্য এর রক্ত। কোন বৈদেশিক শক্তির কাছেই আমরা ভিক্ষা চাইবো না। আমরা স্বাধীনতা লাভ করবো এর মূল্যের বিনিময়ে। রক্তের বিনিময়ে।"

মৃত্যুহীন এক জ্যোতির্ময় প্রাণ মূর্ত হয়ে দেখা দেয়। দিঘল ঋজু দেহ, সুঠাম ভঙ্গী, স্ফুরিত অধর, উন্নত শির। সৈনিকের চঞ্চল কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে অতিক্রম করে বন্ধুর পথ।

নিজের চারপাশে যারা ভিড় করে এসেছিল আর থেকেছিল অতি দীর্ঘদিন, সবাইকে মনে হয় বড় দীন, হীন আর ভীরু। গান্ধীর চোখ আতিপাতি করে খোঁজে। কাকে?

১৯৩৯ থেকে ১৯৪২। দীর্ঘ তিনটি বৎসর। চলে গেছে দেখতে দেখতে। না জানিয়ে। অবহেলায়। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেস। সুভাষ সভাপতি হয়েছিলেন। না, গান্ধী জাননি ত্রিপুরীতে।

গোটা ত্রিপুরী ভেসে ওঠে গান্ধীর চোখের ওপর। সেদিন সুভাষ সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন চরমপত্রের কথা। সে-কথা কেউ তাঁরা কানে তোলেন নি। কিন্তু আজ?

১৯৪২। সংগ্রাম ছাড়া আর কোন পথই-তো গান্ধীর চোখে পড়ল না। কিন্তু ওঁরা কি রাজী হবেন? জহর? আজাদ? রাজাজি?

কিন্তু ওঁদেরই-বা দোষ কোথায়? তিনিও কি এই কথাই তিন

বছর ধরে বলেন নি? দুর্বিপাকের মধ্যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে নেই, এই-না ছিল তাঁর গোড়াকার কথা? তবে?

সেদিনের সুভাষ আর এইক্ষণের সুভাষ কি একই মানুষ? সুভাষের এ-রূপ তবে তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকল কেন? কেমন করেই-বা থাকল?

এ-সুভাষ অজানা।

না। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের অজানা।

সহসা গান্ধী তাঁর হারানো সংবিৎ ফিরে পেলেন।

এবং সেই মুহূর্তে অবলীলায় সিদ্ধান্ত তাঁর স্থির হয়েও গেল।

আজাদ বোঝালেন। নেহেরু তাঁর আন্তর্জাতীয়তার অব্যর্থ থিয়োরী শোনালেন নানা ছন্দে। কিন্তু গান্ধী রইলেন অচল অটল।

রাজাগোপাল আর ভুলাভাই দেশাই ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদে ইস্তাফা দিতে বাধ্য হলেন। গান্ধীর অভিপ্রেত-যাত্রা চলতে শুরু করেছে। (১)

গান্ধীর মুখে একটিমাত্র কথা: "জাপান ভারত আক্রমণ করবে না, যদি ইংরেজ চলে যায়। জাপান ভারতবাসীর শত্রু নয়, শত্রু ইংরেজের।" (He told me in unqualified terms that if the Japanese army ever come into India, it would come not as our enemy but as the enemy of the British.) (২) (Gandhi felt "Convinced that the British presence is the incentive for the Japanese attack.)" (৩)

সমগ্র দেশ উগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে গান্ধীর দিকে। মুক্তির অগ্রদূত সুভাষ দেশান্তরে। জহরলাল নেহেরু বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করেছেন। নির্ভর করবে দেশ কার ওপর?

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—সীতারামাইয়া

(২) ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম—আজাদ

(৩) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—সীতারামাইয়া

দুর্বোধ্য গান্ধীর নেতিবাদ তাকে বিভ্রান্ত করেছে বার বার।

কিন্তু এবার?

এবার গান্ধী সবাই-এর আগে না?

সমগ্র জাতির ঈপ্সা আজ রূপ পরিগ্রহ করে ফুটে উঠেছে গান্ধীকে ঘিরে।

মুক্তি-পাগল ভারতবর্ষের গান্ধী-প্রতিনিধি একক।

গান্ধী তার নেতা।

কিন্তু গান্ধীও যদি ছিটকে পড়েন? যদি হটেন পিছু?

আর সে কারও জন্যই অপেক্ষা করবে না। এগিয়ে যাবে। মৃত্যুর মুখোমুখী একবার দাঁড়িয়ে দেখবে। বাঁচতে চেয়ে একবার দেখবে মরে। (···mood of the country changed; and from a sullen passivity it rose to a pitch of excitement and expectation.) (১)

কংগ্রেস যদি সঙ্গে থাকে, উত্তম। না থাকে যদি,—তবু সে ভয় পাবে না। সে এগিয়েই যাবে।

কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। প্রস্তাবের জন্য, তাই, আর সে অপেক্ষাও করবে না। (Events were not waiting for congress decision or resolution···they were moving onwards with their momentum.) (২)

৫ই জুলাই, ১৯৪২। ওয়ার্ধায় বসল ওয়ার্কিং কমিটির সভা।

এক দিকে গান্ধী একা।

অন্যদিকে প্রকাশ্যে জহরলাল নেহেরু ও আবুল কালাম আজাদ। অন্তরালে রাজাগোপাল ও ভুলাভাই দেশাই। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চান ওঁরা ওয়ার্ধায়।

ইংরেজের এই চরম বিপর্যয়ের মুখে গান্ধীর কথা শোনা মানে

(১)+(২) ডিস্‌কভারী অব্‌ ইণ্ডিয়া—জহরলাল নেহেরু

ইংরেজের চোখে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। জহরলাল তা পারেন না। আজাদের পক্ষেও অসম্ভব। গান্ধীকে ওঁরা বোঝাতে চান। কিন্তু ভালো করেই ওঁরা জানেন যে, গান্ধী বুঝতে না চাইলে কেউ তাঁকে বোঝাতে পারে না।

গান্ধী দুর্জয়।

বড় খেদে জহরলাল নেহেরুর লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে: "গান্ধী আন্তর্জাতিক সমস্যা উপক্ষো করেছেন। এবং তাঁর সমগ্র দৃষ্টি-কোণ জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিত। (Gandhiji's general approach also seemed to ignore inportant international considerations and appeared to be based on a narrow view of nationalism.) (১)

আর আলোচনা নয়। আলোচনা হয়ে উঠল সংঘর্ষ। গান্ধী পত্র দিলেন আজাদকে এই মর্মে যে, তাঁদের এক সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। উভয় পক্ষের মতবাদ ও সমঝোতার ভেতর রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। (Things reached a climax when he sent me a tetter to the effect that my stand was so different from his that we could not work together.) (২)

পত্রে এ-কথাও পরিস্ফুট করে লিখতে গান্ধী দ্বিধা করেন নি যে, যদি প্রস্তাবিত আন্দোলন তাঁকে পরিচালিত করতেই হয়, আজাদ ও নেহেরুকে পদত্যাগ করতে হবে। (If Congress wanted Gandhiji to lead the movement, I must resign from the presidentship and also withdraw from the working committee. Jawaharlal must do the same.) (৩)

(১) ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়া—জহরলাল নেহেরু

(২) ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম—আজাদ

(৩) ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম—আজাদ

প্রশান্ত যোগীরাজ সহসা যেন রুদ্ররূপে জেগে উঠলেন। নয়ন-বহ্নি কি জাতির সকল পাপ ও কলুষ পুড়িয়ে খাক করে দেবে?

এত তাপ, এত জ্বালা, এত বাষ্প জমেছিল কবে?

কেমন করে?

কেন?

বিস্ময়ে সবাই বোবা হয়ে গেল।

কিন্তু জহরলাল, আজাদ, রাজাগোপাল বোকা নন। তাঁরা জানেন খুব ভালো করে যে, ঐ নগ্নপ্রায় কৃষতনু মানুষটির পৃষ্ঠ-পোষকতা ও সাহচর্য ছাড়া তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একান্তই তুচ্ছ। ওঁরই শক্তিতে তাঁরা এতদূর এসেছেন ও উঠেওছেন। যেদিন আর যে-মুহূর্তে দেশবাসী জানবে যে, গান্ধী তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন, ইংরেজের শত সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁরা হাওয়া হয়ে যাবেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে মুছে যাবেন নিশ্চিহ্ন হয়ে। ইংরেজ শত চেষ্টা করেও তাঁদের বাঁচাতে পারবে না।

গান্ধী পরিত্যাগ করেছিলেন সুভাষকেও।

কিন্তু পরিত্যাগ করেছিলেন এই জন্যই যে, সুভাষের সঙ্গে তিনি ছুটতে পারেন নি।

কিন্তু এঁরা?

এঁরা নিজেরাই শুধু পেছনে পড়ে নেই,—গান্ধীকেও টেনে নিতে চান সঙ্গে। পেছনে।

পাদমেকং ন গচ্ছামি। গান্ধীর শেষ কথা।

উপায়হীন নেহেরু, আজাদ, রাজাগোপাল আর ভুলাভাই ফিরে আসেন। কিন্তু ফিরে এসেও তাঁদের পরিকল্পনা কি তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন? সামনা সামনি গান্ধীকে এঁটে উঠতে ওঁরা পারেন নি সত্য কথা; কিন্তু সম্মুখের ঐ পথ ছাড়াও ভিন্ন ধরনের পথ ওঁদের জানা ছিল। ওঁরা চললেন সেই পথে।

১৪ই জুলাই (১৯৪২) ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবই পরবর্তীকালে পরিচিত হল 'ভারত-ছাড়ো' (Quit India)-প্রস্তাব নামে।

দেশ ও জাতি এ-কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না যে, গভীর রাত্রির কৃষ্ণকালো অন্ধকারে একটা গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে গান্ধীর মূল প্রস্তাব রূপান্তরিত হয়ে গেল বর্তমান রূপে। এবং যার ফলে ইংরেজ ও মিত্র পক্ষের সম্ভবপর যাবতীয় সমর প্রচেষ্টা ও অবস্থান অত্যন্ত হঠাৎ এবং অত্যাবশ্যকীয় রূপে স্বীকৃতিও পেল। (১)

ইংরেজ ও তার মিত্রদের সৈন্য, সামন্ত, রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র, যোগানদার, খিদমদগার, পিওন, চাপরাশি, হাসপাতাল, কনট্রাকটার আর তার শতকোটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা থাকবে এদেশে, থাকবে শান্তি রক্ষার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, থাকবে বহাল ভবিষ্যতে সবই, থাকবে তাদেরই কর্তৃত্বাধীনে ; এবং কংগ্রেস সানন্দে তাতে সম্মতিও দেবে। এ-কথাও বিশদ ও বিস্তৃত করে বলা হল যে, ইংরেজদের সবাইকে অথবা কাউকে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবার বাধ্য বাধ্যকতার ইঙ্গিত এ-প্রস্তাবে নেই।

শুধু একটি কথাই স্পষ্ট করে বলা হল না যে, কে বা কারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে।

এ-সত্ত্বেও বিলেতে গান্ধীর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল।

এখানকার ভাইসরয় লিনলিথগো আর বিলেতে এ্যামেরি রীতিমতো ক্ষেপে উঠলেন। পঞ্চাশ হাজার শব্দ সম্বলিত এক শ্বেত-পত্র ছাপিয়ে গান্ধী ও কংগ্রেসকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। বিচলিত ও ক্রোধান্ধ চার্চিল বক্তৃতায় বললেন : "বৃটিশ সাম্রাজ্য দেউলে করবার জন্য রাজার প্রধান মন্ত্রীত্ব আমি গ্রহণ করিনি।"

(১) ইণ্ডিয়ান ষ্ট্র্যাগল—সুভাষচন্দ্র বসু। (ডঃ সীতারামাইয়া [প্রকাশ্যে] গান্ধীর মূল প্রস্তাবের উল্লেখ করেননি,—কিন্তু পরোক্ষে অস্বীকার করতেও পারেন নি।)

সব চাইতে বিস্মিত হল ওরা এই কথা ভেবে যে, জহরলাল নেহেরুর মতো মানুষও গান্ধীর কথায় সায় দিয়ে বসলেন।

অধ্যাপক ক্যুপল্যাণ্ড (Coupland) বেশ তীক্ষ্ণ হয়েই মন্তব্য করলেন : "অনেকের মতে গান্ধীর মুসাবিদার অধিকাংশ ছিল জাপানের সমর্থন সূচক এবং এ-ধারণা তাতে পরিস্ফুট যে, অক্ষশক্তিই জয়লাভ করবে ; পণ্ডিত নেহেরু এর প্রতিবাদ করেছিলেন।" (১)

কিন্তু নেহেরু-আজাদ-রাজাজিদের বিরোধিতা সীমিত করবার পর গান্ধীর নিজের মনেই এক প্রতিকূল মনোভাব ও দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা অনুধাবন করতে গান্ধীর বিলম্ব হল না যে, তাঁর নিজের মতবাদ ও আদর্শ অনুযায়ী চলবার সাধ্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর নিজেরই নেই।

গান্ধীজি বিপ্লবী, কেউ তাঁকে এ-কথা বললে শোনবামাত্র তিনি পুলকিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু বিপ্লব ও বিপ্লবী শব্দের তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা এবং ইংরেজের নিকট ঐ শব্দ দুটির গুরুত্ব গান্ধী তখনও সম্যক ধারণা করতে পারেন নি।

জহরলাল নেহেরু তাঁর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব সম্পর্কে একদা মত প্রকাশ করে ফেলেছিলেন এই বলে যে, ঐ প্রস্তাবটি নাকি ভয়ানক বিপ্লবাত্মক। গান্ধী লুফে নিয়েছিলেন কথাটা। ১৫ই জুলাই (১৯৪২) একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন যে, যদি ঐ আন্দোলন আদৌ প্রবর্তিত হয়ই, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এ-আন্দোলন হবে একটা বিপ্লব। অবশ্য কথাটা বলেই টীকায় এ-কথা বলতে ভোলেন নি যে, বিপ্লব হলেও সেটা অবশ্যই হবে অহিংস বিপ্লব। (২)

কথাটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে বেশি সময় ব্যয় করতে হল না গান্ধীর। এবং এই শব্দটি ব্যবহার করা যে খুব যুক্তিযুক্ত হয়নি, এ-কথা ভেবে গান্ধী তৎক্ষণাৎ মিস স্লেড (মীরা বেন) কে বড়লাটের

---

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—সীতারামাইয়া

(২) ইণ্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম—আজাদ

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রেরণ করেন। বিপ্লব মানে সত্যি সত্যি বিপ্লব নয়, এই সত্য কথাটা বোঝাতে হবে বড়লাটকে। কিন্তু বড়লাট মিস স্লেড-এর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে ও আর কোন পথ না পেয়ে বড়লাটের সেক্রেটারীকে খুব ভালো করে এবং অনেক সময় ধরে মিস স্লেড বোঝাতে চাইলেন গান্ধী-ব্যবহৃত 'বিপ্লব' শব্দটির নির্গলিতার্থ। সেক্রেটারী সাহেব বিনীত ভাবে মিস স্লেডকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, বিদ্রোহের হুমকি যে-গান্ধী দেখান তাঁর সঙ্গে বা তাঁর প্রেরিত কোন লোকের সঙ্গে বড়লাট কোন ক্রমেই দেখা করবেন না।

সামান্য একটা শব্দ যে এমন ভয়ানক ফ্যাসাদ টেনে আনতে পারে, এ-কথা গান্ধী ভাবতে পারেন নি। শেষ চেষ্টা হিসেবে গান্ধী তাঁর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে তাঁর প্রকৃত মনোভাব ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি দিতে নির্দেশ দেন। মহাদেব অদ্বৈত ব্যাখ্যাসহ বিবৃতি দিলেন যে, গান্ধীজি কোন ক্রমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন নি। (He said that it was not correct to say that Gandhiji had decided to launch an open non-violent rebellion against the British.) (১)

৭ই আগষ্ট, ১৯৪২। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বম্বে-অধিবেশনে 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব উপস্থাপিত হল এবং প্রস্তাব গৃহীত হল ৮ই আগষ্ট। নেতারা সমারোহে ইংরেজের নির্দিষ্ট প্যালেসে ও ফোর্টে চলে গেলেন ৯ই আগষ্ট।

একটি বিরাট সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

ইংরেজের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যেত ১৯৪২-এ। কিন্তু ইংরেজ-প্রসাদ-প্রত্যাশী নেহেরু-আজাদ-রাজাজির সূক্ষ্ম বুদ্ধি সেই সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে এক সঙ্কীর্ণ, স্বল্পকাল স্থায়ী ও বিক্ষিপ্ত

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—সীতারামাইয়া ও ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম—আজাদ

আন্দোলনে রূপান্তরিত হবার সুযোগ দিয়ে অলক্ষ্যে সুরক্ষিত ইংরেজ বন্দী-নিবাসে সরে পড়লেন। ফলে 'ভারত-ছাড়ো'—আন্দোলন হয়তো ইংরেজের পক্ষে খানিকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকবে, কিন্তু ভারত-ছাড়া দূরের কথা, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজ নিজেকে বিন্দু পরিমাণ দুর্বলও ভাবেনি।

তবু ১৯৪২ সাল এসেছিল। এসেছিল একটা আশ্চর্য সুন্দর ছটা নিয়ে। এসেছিল বিদ্রোহ ও ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। গান্ধী বা নেহেরুর কথা জাতি সেদিন ভাবেনি। ভেবেছিল পরাধীনতার হীনতার কথা। পেয়েছিল অন্তর ভরা বেদনার অসহ্য যন্ত্রণা। জেগেছিল প্রাণে প্রতিশোধের কামনা। স্বপ্ন দেখেছিল মুক্তির। তাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল থানা, পুলিশের ব্যারাক। উপড়ে ফেলেছিল হাজার হাজার মাইল রেল লাইন। ছিঁড়ে ফেলেছিল টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের তার।

দীর্ঘ একশো বছরের মধ্যে কেউ জাতিকে ভারত-বিদ্রোহের কথা শোনায় নি। বিদ্রোহের স্বরূপ সে চেনে না। কাকে বলে বিদ্রোহ তাও কি জানে? কেমন করে বিদ্রোহ করতে হয়, তাও ছিল তার অজানা। শুধু প্রাণভরা ছিল আকাঙ্ক্ষা। ছিল সঙ্কল্প। তাই সম্বল করেই সে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

অজানা একটা চাওয়া সমগ্র অন্তর ভরে জেগে উঠেছিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল মনের গভীরে। তারই ধাক্কায় ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল সামনের বাধা, আর ক্ষত-বিক্ষত করেছিল নিজেকে। কোনদিনই মুখে তার ভাষা নেই। মৌন-মূক কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে একটা বোবা অভিশাপ বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।

কাণ্ডারীহীন নির্দেশহীন জাতি আপন খেয়ালে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুকের ভেতরকার আগুন বাইরে এনে জ্বালিয়েও দেয়। কিন্তু সে-আগুনের গায়ে দাবানলের শক্তি ছিল না। দপ্ করে জ্বলে উঠে অকালে তাই নিভেও গেল।

রুজভেল্ট-প্রতিনিধি উইলিয়াম ফিলিপ্স্ ১৯৪৩-এর ১৯শে এপ্রিল

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট পাঠালেন প্রেসিডেন্ট্-এর কাছে: "চমৎকার আরামে দিন কাটিয়ে চলেছে ইংরেজ। স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার কাজে ইংরেজ অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছে। স্বাধীনতার সামান্যতম সম্ভাবনাও ইংরেজ দমন করেছে অদ্ভুত কৌশলে।" (১)

(১) ডিপ্লোমাটিক ডকুমেন্ট্স্ কভারিং ১৯৪৩; কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত।

সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন নেতাজি ভারতবর্ষের দিকে। অনেক সাধ্য সাধনা করেও ভারতবর্ষে থাকাকালে গান্ধীকে তিনি রাজী করাতে পারেন নি। প্রধানত ওঁদের এই সংগ্রাম পরাঙ্মুখতার জন্যই তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। গান্ধী ও তাঁর অনুবর্তীরা সেদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে সর্বাধিক তৎপরতা ও অদম্য দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। ইংরেজ-স্বার্থ-সংরক্ষণে অতবেশি তৎপরতা ও দরদের পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতার কথা যদি তাঁরা সেদিন ভাবতেন, হয়তো তাঁকে দেশ ছেড়ে আসতে হত না।

হোক না দেরিতে, হোক সীমাবদ্ধ, তবু সংগ্রাম শুরু হয়েছে। রূপ-যাই হোক,—অনাগত ইতিহাস এ-কথা বলবে না যে শত্রুর অত বড় দুর্যোগে অলস ও নির্বিকার দ্রষ্টার ভূমিকায় কাল কাটানো ছাড়া ভারতবাসী আর কিছু করেনি।

কে দেখতে যাবে প্রস্তাবের ভেতরকার অলি-গলি? দেশের কানে বেজে উঠবে ঐ কথা দুটি,—'কুইট ইণ্ডিয়া'। মারাত্মক দুটি শব্দ। বজ্রগর্ভ। ইংরেজ দূর হয়ে যাও ভারত থেকে। মুখে বলা তো দূরের কথা, কোনদিন কেউ ভাবতেও কি পেরেছে? প্রস্তাবের ভেতরে নাই-বা থাকল ওর স্থান,—দেশবাসীর বুক জুড়ে ও স্থান করে নিয়েছে। দূর হয়ে যাও ইংরেজ। ভারতবর্ষে তোমার স্থান নেই।

কত দীর্ঘদিন পর ভারতবাসী এই কথাটি বলতে পারল। জহরলাল ভাষ্য দিয়ে একে ঢাকতে থাকুন, কূটবুদ্ধির ব্যাখ্যা দিয়ে একে ভিন্ন খাতে ও পথে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়; কিন্তু অগণিত নরনারী ওঁদের কথার কোন তথ্যই গ্রহণ করবে না। তাদের কাছে শুধু ঐ কথাটির সম্মোহন সব চাইতে বেশি। কংগ্রেস ইংরেজকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে,—জুজু

হয়ে ছিল একটা গোটা শতাব্দি যার ভয়ে। শিরা আর উপশিরার রক্ত প্রবাহ অনেক বেগে ছুটছে। আর হৃদপিণ্ডে শব্দ হয়ে চলেছে ঢুম ঢুম করে। ইংরেজ-শূন্য ভারতবর্ষ; এক অভাবনীয় কল্পনায় সত্যিই দেশ,—গোটা ভারতবর্ষ মাতাল হয়ে উঠেছিল না?

এ-সময়ে ভারতে থাকলে কী হত? তিনিও সমস্ত বিভেদ ভুলে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন?

না। ইংরেজ তাঁকে সে-অবকাশ দিত না। আটকে রাখত। কারাগারের দেয়ালের পর দেয়াল তুলে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখে দিত। দেয়ালে মাথা ভাঙ্গা চলত, কিন্তু তাতে ইংরেজের মন গলত না।

স্বদেশ ছেড়ে এসে এই নতুন পরিবেশেও তাই তাঁর পক্ষে কত সহজে ভারতের মুক্তি-যুদ্ধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হল। ইংরেজের দীর্ঘ আর বর্বর লোমশ মাংসাশী হাত এসে এতদূরে পৌঁছোবে না। এখান থেকে খোলা হবে তাঁর দ্বিতীয় রণাঙ্গন। স্ট্যালিন মিত্রপক্ষকে ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলবার জন্য বলেই চলেছেন। মিত্রপক্ষের ভয় কাটেনি। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়ে গেল।

এখান থেকে অনর্গল এবং অনবরত তিনি বলে চলবেন ইংরেজের বর্বরতার কাহিনী। তাতিয়ে তুলবেন দেশকে এবং দেশের জন-মানসকে। দীর্ঘদিনের প্রভুভক্ত সৈনিকদের কানের কাছে ধ্বনিত হবে প্রতিদিন শেষ বিদ্রোহের বাণী।

দ্বিগুণ উৎসাহে নেতাজি মেতে ওঠেন।

সামান্য এক বছরেই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' শিক্ষা ও সংখ্যায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পনের জন দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম বাহিনী; সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫০০। আরও বহু বন্দী ভারতীয় সৈন্য ফৌজে যোগ দিতে চায়, বন্দী-শিবির শূন্য করে দেয়া আজ আর কঠিন নয়।

কিন্তু সংখ্যা বাড়ানো আর চলবে না। খরচা বড়ই বেশি। মাইনে, পোষাক, খাওয়া, সব দিতে হয় জার্মান সৈন্যের মতোই। আর এই

অর্থ নেতাজি ধার বলে নেন জার্মান সরকারের কাছ থেকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে কড়াক্রান্তি হিসেব করে ধার শোধ করা হবে।

ইটালীর বন্দী-শিবিরে ওদের দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। নিজের বলতে ওদের কিছু ইটালিয়ানরা রাখেনি। কেড়ে নিয়েছে। পোষাক-পরিচ্ছদ কেড়ে নিয়ে বাধ্য করেছে বন্দীর পোষাক পরতে।

পরদেশী প্রভু ইংরেজের ভাড়াটে সৈনিক বলে এমনিতে ইজ্জৎ বলে ওদের কিছু ছিল না। কথায় কথায় নিদারুণ উপেক্ষা, উপহাস ও অপ্রীতিকর অপমান ওদের ভাগ্যে জুটত নিত্যদিন এবং নিয়মিত।

তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায় ওরা বদলে গেছে আমূল। বন্দী হবার পূর্বে ওরাও ছিল স্বাধীনই; কিন্তু নামেই স্বাধীন। সেখানেও শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দাপট তাদের কম ম্রিয়মান করে রাখত না। কিন্তু আজাদী ফৌজের যেন কথাই আলাদা।

আক্রমণোদ্যত বাঘ-আঁকা ব্যাজ বুকে এঁটে ওরা যখন হাত বাড়িয়ে বলে 'জয়হিন্দ', বুক দশহাত আপনা থেকেই ফুলে ওঠে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটা সার্বভৌম দেশের গর্বিত সৈনিক ওরা। তেমনি চলা-ফেরা। তেমনি কথা।

ফৌজের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র হল কোয়েনিগ্‌স্‌ব্রুয়েক-এ (Koenigsbrueck), স্যাকসনী প্রদেশের নামকরা স্থান। বিরাট ব্যারাক। পার্শ্ববর্তী ঘন বন রহস্যে ঘেরা। অদূরে ছোট ছোট টিলা। শীতের সকালে তুষারের কিরীট পরে ওরা ঝলমল করতে থাকে প্রভাত-সূর্যের আলোর পরশে।

কত নতুন অস্ত্রই-না ওরা দেখল। প্রয়োগ কৌশলও ওরা শিখছে। নানা ধরণের মেসিনগান, মরটার, হ্যাণ্ডগ্রীনেড,—এসব তো মামুলি। কেমন করে ট্যাঙ্কের কসরৎ দেখাতে হয় ও ট্যাঙ্ক নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করতে হয় তাও ওরা শিখে ফেলবে। শিখছে ট্যাঙ্ক ঘায়েল করবার বিদ্যেও। বিমান ঘায়েল ও ধ্বংস করবার কলাকৌশল আর ওদের

কাছে আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তড়িৎ আক্রমণের পাঠও ওরা নিতে শুরু করেছে, আর নানা ধরণের বিমানাক্রমণের শিক্ষা।

সব চেয়ে বড় কথা মানসিক পরিবর্তন। যখন ইংরেজের দালালরা ওদের সৈন্যদলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তখন এই কথাই ওদের মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল যে, ওরা হিন্দুস্থানের সৈনিক। ভারতবর্ষের জন্য তারা বাঁচবে এবং দরকার হলে মরবেও। যেদিন একান্ত অনিচ্ছার বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের ঠেলে পাঠিয়ে দিল আফ্রিকার মরু-বুকে, সেদিন এই জাজ্বল্যমান মিথ্যার প্রতিবাদ তারা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। ভয় পেয়েছে। কথায় কথায় কোর্ট-মার্শাল চোখ লাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত না ?

সামরিক শিক্ষার চাইতেও বড় শিক্ষা ওরা পেয়েছে। আজাদী ফৌজে যোগ না দিলে ভারতবর্ষ কাকে বলে তা কি তারা জানত ? বুঝত কি স্বাধীনতার মর্ম ? ইংরেজ দেড়শো বছর ধরে কী করেছে, আর কী করেনি, তাও তাদের জানতে বাকি নেই। ইংরেজকে হাড়ে হাড়ে তারা চিনে ফেলেছে। দেখতে পেয়েছে ওর সত্যিকারের রূপ।

সবচেয়ে বড় পাওয়া ওদের নেতাজি। মানুষের বেশে দেবতা। আজাদী ফৌজে না এলে এমন মানুষের দেখা কি তারা পেত ? না, কাছেই ঘেঁষতে পারত ? হাজার মানুষের মধ্যে একটা নতুন মানুষ। সেই মানুষটি ওদের কম্যাণ্ডার। ইংরেজ কম্যাণ্ডারকে ওরা দূর থেকে দেখেছে। কিন্তু নেতাজি আর ঐ রাঙ্গা-মুখো ইংরেজ! কীসে আর কীসে।

ওরা জানে যে ইংরেজের কাছ থেকে আর তারা মাইনে পাবে না। পাবে না পেনশনও। কিন্তু ভিক্ষের ঐ কটা টাকা কি এই মুহূর্তের গৌরব দিতে পারত ? না, দিতে পারত ইজ্জৎ ?

তা'ছাড়া স্বাধীনতা, আজাদী। স্বাধীন তারা হবেই। তাদের নেতাজি বলেছেন এ-কথা। মরতেই-তো তারা এসেছিল। কিন্তু এসেছিল ইংরেজের জন্য মরতে। এবার তারা মরবে নিজেদের দেশের

জন্য। মুলুকের জন্য। আর তার আজাদীর জন্য। নিজেরা না দেখুক,—তাদের পুত্র-কন্যা? ভাই-বেরেদার? ভবিষ্যৎ? আজ যদি কিছু লোকসান হয়ই, সেদিন সব ক্ষয় আর ক্ষতি যে সুদশুদ্ধ উসুল হয়ে যাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাষা।

এ-ভাষা ও কথা নেতাজি বোঝেন। তিনিই বুঝিয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি আসেন। কালো আচকান আর চুড়িদার পরে তিনি যখন ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকেন, তাঁর কথা ওরা ভালো করে শুনতেই পায় না। শুধু তাঁকে ওরা দেখে। রক্ত-ভাঙ্গা ঠোঁটের পাশ দিয়ে যখন সোনা মাখা হাসি গড়িয়ে পড়ে,—ওদের মনে হয়,—কী মনে হয়?

মনে হয়: "বুঝি-বা কোন দেবদূত কথা কইছে। তেমনি পবিত্র। তেমনি মিষ্টি।" (গণপুলে)

নেতাজির ভাষণ শেষ হয়। আচমকা ওদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে, "নেতাজি জিন্দাবাদ।" কিন্তু ওরা টেরই পায় না যে, চোখের জলে কখন ওদের বুক ভিজে গিয়েছে।

হাসতে হাসতে চোখ মুছে ওরা সমস্বরে গেয়ে ওঠে: "হামে সুখ কো আব্ ভুল জানা পড়েগা।"

সুখ ভুলতে হবে। আরামের বিলাসিতা কোনদিনই ছিল না। আজ-তো থাকবেই না। আজ শুধু দেশ। শুধু আজাদী। আর, "হুকুম নেতাজিকা বাজানা পড়েগা।" নেতাজির হুকুমে প্রাণ তো খুবই ছোট, স—ব ওরা দিতে পারে। ওদের সব গানের ধুয়ো।

কী অসহ্য অজ্ঞানতার বোঝাই-না বুকের ওপর এতকাল চেপে বসে ছিল জুজুর মতো, পাথরের মতো। শতধা বিচ্ছিন্ন মানুষ। এক দেশ, জাতি এক, এ-কথা শুনতে পায়নি। ভাষা পৃথক, পৃথক পোষাক-পরিচ্ছদ, পৃথক হেঁসেল, আহার্যও পৃথক। সব থেকে বড় লজ্জার কথা, ওদের ভগবানও ছিল পৃথক।

কিন্তু আর তারা পৃথক নয়। এক। একান্ন-পরিবার গড়ে তুলেছেন নেতাজি। বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী—এ-পরিচয় তারা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, না বৌদ্ধ। তাদের একমাত্র পরিচয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। একই সঙ্গে তারা বলে, "জয় হিন্দ"। এক সঙ্গে বসে, খায়। এক গান গায়। এক ভাষায় কথা বলে। সবাই তারা হিন্দুস্থানী ভাষা শিখে ফেলেছে। তারা নামাজ পড়ে, ভজন গায়, প্রার্থনা-পূজোও করে। কিন্তু এ-কথা তারা বুঝে নিয়েছে ভালো করেই যে, তাদের সকল পূজো সেই একই ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়।

কিন্তু এ-সবই বাহ্য। ভগবান, সমাজ ও ছোটখাটো সমস্যার বন্ধন তারা সহসা এক জাদুকরের স্পর্শে কাটিয়ে উঠেছে। নির্মোক মুক্ত এক নতুন জাতি। নতুন এর সাধনা। নতুন মন্ত্র। নতুন অনুভূতি। আর সিদ্ধি? তাও হবে নতুনই।

ব্যক্তি ছিল। ছিল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও। সবই ছিল বাইরে। অন্তরে সবার কাছে সত্য হয়ে উঠল শুধু দেশ। আজাদী। (This had great effect and in courseoftime it was not 'gods' that mattered but the Nation and 'Jai Hind' that ruled the heart of men.) (১)

চির অশান্ত ও উদ্দাম এই লোকটির কর্মতৃষ্ণা কি কোন দিনই মিটবে না? সারাদিন ছোটাছুটি লেগেই আছে। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ, পররাষ্ট্র দপ্তর, বেতার কেন্দ্র,—এতো প্রায় নিত্য দিনের কাজ। এ-ছাড়া হাজারো জনের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা, আলোচনা করা, নির্দেশ দেয়া। ওরই ফাঁকে আবার সভা, সম্মেলন কিম্বা প্রেস কন্‌ফারেন্‌স্। ঘড়িতে দেখে সময় ভাগ করা। কাঁটায় কাঁটায় সব কাজ সাঙ্গ হয়।

মাত্র একবার নেতাজি দেখা করেছিলেন হিটলারের সঙ্গে। তাও

(১) নেতাজি ইন জার্মেনী—শ্রীগণপুলে

প্রথা মাফিক। এবং একবার রিবেনট্রপের সঙ্গে। গায়ে পড়ে বড়দের গা-ঘেষা এ-মানুষটির ছিল ধর্মবিরোধী। গোয়েবোল্‌স্‌-এর সঙ্গে কাজের খাতিরে মাঝে-মধ্যে দেখা করতে হত। কিন্তু সব সময়ের বন্ধু ছিলেন ট্রট। (পরবর্তীকালে হিটলারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হয় এবং অভিযুক্ত হন ট্রট। ট্রটকে ওরা মেরে ফেলে।)

গভীর রাত্রি কেটে যায় বিনিদ্র। চিঠি লেখেন। বক্তৃতা লেখেন। লেখেন নানা বিষয়ের প্রবন্ধ। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাতে লিখতে হত। ইংরেজীতে আবার জার্মেনীতেও।

নিজের বলতে কি এই মানুষটির কিছুই নেই? সুখ? সাধ? আয়াস? একদিন হয়তো কিছু-কিছু ছিল। সবই কি নিঃশেষ হয়ে গেল? এ কী অমানুষিক দুস্তর তপস্যা? এমনি মানুষকেই কি লোকে বলে ভাবোন্মাদ? মিষ্টিক?

কিছুই কি মনে জাগে না? দেশের কথা? মায়ের কথা? আর সেই সব হতভাগ্য সহকর্মীদের কথা, যারা একদা ওঁর সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়ে দিয়েছিল?

আরও একজনের সদা-সতর্ক দৃষ্টি আর মমতা-সিক্ত পরিচর্যা ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ। শেঙ্কল। ঠিক আগের মতোই নিরলশ, সজাগ, অকৃপণ। এই অবুঝ আর উদাসী লোকটিকে কেউ একজন না দেখলে বাঁচবে কেমন করে?

এই অফুরন্ত কাজের ফাঁকেই সহসা দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। চেয়ে থাকেন আনমনে আকাশের দিকে। মুখে কথা নেই। দেহে স্পন্দন নেই। ঐ আকাশেই বুঝি ভেসে ওঠে তাঁর দেশ-মাতৃকার প্রিয়তম রূপ। তাঁর ভারতবর্ষ। শত কোটি অভাব আর দৈন্যদশায় ভরা, নিত্যদিনের হাহাকার আর নাই-নাই রবে ছাওয়া। শিক্ষা নেই, অন্ন নেই, স্বাস্থ্য নেই। অনন্ত 'নাই' সম্বল করে এই জাতটা বাঁচল কেমন করে? আর এতদিন?

চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই প্ল্যানিং কমিটি। ভেসে ওঠেন

চোখের ওপর বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা, কে. টি. সাহা। আরও একখানি মুখ,—গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। ফিরে যেদিন যাবেন, এঁদের দেখা পাবেন তো?

একটু ফাঁক পেলেই ছুটে যান হামবুর্গ-এ। তন্ন তন্ন করে দেখেন ওখানকার সংগ্রহশালা। (WELTWIRTCHAFTSARCHIV) ভারতবর্ষের অর্থনীতি সম্পর্কে কত গবেষণা। ভারতীয় কৃষি, বন, গৃহপালিত পশু-পাখির কথা এবং নানা ধরণের শিল্প সম্বন্ধে কত আলোচনা। আর এই সম্পর্কে বই-ই-বা কত। দেখেন, পড়েন, গোগ্রাসে গিলিতে থাকেন। ওদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অধ্যাপকদের বলেন, কোন কোন বিষয়ে প্ল্যান করে দিতে। যাবার সময় এইসব নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন ভারতকে নতুন করে সাজাতে হবে না?

কিন্তু খালি বই পড়ে কি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়? ছুটে যান আবার হল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে, রুমানিয়ায়। ছোট-বড় ফার্ম দেখেন। কেমন করে ওরা কাজ করে আর চালায়, নিজের চোখে দেখে মনের মধ্যে গেঁথে নেন। তাঁর দেশ। হতভাগ্য, লক্ষ্মী ছাড়া দেশ। সবাই মিলে লুটে পুটে শ্রীহীন সম্পদহীন শ্মশানে পরিণত করেছে। যদি—

ফুঠে ওঠে চোখের ওপর আর এক অপরূপ মহিমময়ী রূপের প্রতিমা। এক অঙ্গে এত রূপ। চোখ ঝলসানো রূপ।

প্যারেড দেখেন ফৌজের। স্বাধীন ভারতের রক্ষী-বাহিনী। পা ফেলে ওরা তালে তালে। শেখায় মস্ত বড় জার্মান অফিসার। দেখেন আর সমস্ত বুকখানা ফুলে ফুলে দুলে ওঠে। তাঁর মানস-সন্তান। আজাদ হিন্দ ফৌজ।

কিন্তু অস্ত্র? এদের হাতে দেবার মতো অস্ত্র ভারতবর্ষে মিলবে কেমন করে? একটি কারখানাও নেই। আছে শুধু গুটিকয়েক রাইফেল তৈরীর কারখানা। কিন্তু শুধু রাইফেল দিয়ে কি আধুনিক যুদ্ধ চলে?

ফিরতি পথে নেমে পড়েন চেকোস্লোভাকিয়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন স্কোডা। বিখ্যাত আর নানাধরনের অস্ত্রের কারখানা এই স্কোডা। আর যান ব্রুয়েন-এ (Bruenn)। ব্রেনগান তৈরী হয় এখানে। ওখানেই দেখতে যান বেনজাইন ফ্যাক্টরী। বিরাট ব্যাপার। পাঁচ লক্ষ টন বেনজাইন তৈরী হতে পারে এই ফ্যাক্টরীতে। সামরিক বিমানের মস্ত বড় খাদ্য এই বেনজাইন। সময় খানিকটা লাগবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মোটেই দুরাশা নয়। একদিন ভারতবর্ষেও এ-সব চালু হবে।

সমস্যার তো অবধি নেই। তার মধ্যে দুস্তর সমস্যা মনে হয় ভাষা। এত বিভিন্ন ভাষা নিয়ে কি জাত গড়া যায় ? তর্কের খাতিরে রাশিয়া, ক্যানাডা, সুইট্জারল্যাণ্ড-এর নাম করা যায় ; কিন্তু এ-কথাও তো সত্য যে, ওদের একটা ভাষাই প্রধান। রাষ্ট্রের ব্যাপারে, বৈদেশিক কাজে ঐ প্রধান ভাষার কথাই সকলের মনে পড়ে।

ভারতবর্ষেরও তাই চাই। থাক না অনেক ভাষা। ওরা আঞ্চলিক ভাষা হয়েই থাক। তাই বলে সকলের বোঝবার মতো আর রাষ্ট্রের কাজ চালাবার জন্য একটা ভাষা থাকবে না ? চিরদিন ইংরেজের ইংরেজীই দেশের প্রধান ভাষা হয়ে থাকবে ? দেড়শ' বছরের পরাধীনতায় যদি ইংরেজীকে প্রাধান্য দিতে হয়, তবে পারসী আর আরবী দোষ করল কোথায় ? ওরাও তো রাজভাষাই ছিল।

মুষ্টিমেয় ইংরেজী-জানা ভারতবাসীর এও এক মোক্ষম চাল। ওরা সুযোগ মতো ইংরেজী শিখে নিয়েছে আর ভালো করে শেখায় ওদের ছেলেমেয়েদের। ওরা চায় এই বিদ্যের জোরে সারা দেশ ও সমাজের ওপর চিরদিন প্রাধান্য অটুট রাখতে। ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা তারাই চায়, যারা চিরদিনের জন্য আইন-সভা, পারলিয়ামেণ্ট এবং সরকারী চাকুরীগুলি নিজেদের দখলে রাখবে বলে স্থির করে রেখেছে।

তা'ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে কটা লোক ইংরেজী জানে ? ভাষা প্রথম শেখাবার সময় ইংরেজী না শিখিয়ে সহজ হিন্দী শেখালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সহজ হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

কিন্তু হরফ ওর বদলাতে হবে। পুরনো হরফে চলবে না। রোমান হরফে হিন্দী শেখা সহজ হবে।

স্বাপ্নিক সুভাষ বোস। স্বপ্নই দেখেছেন বৈকি। কিন্তু বিচিত্র স্বপ্ন। এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা, এক আশা, এক পরিচ্ছদ, এক অভিবাদন,—সব হয়ে উঠবে এক। হিমালয় থেকে কুমারিকা, এক সূত্রে গাঁথা হবে। সেই প্রাণ-সূত্র হবে স্বাধীনতা।

কল্পনার সীমা নেই। পরিকল্পনারও বিরাম নেই। চলেছে একটার পর একটা। ফৌজের মেডাল তৈরী করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নানা শিল্পীর ডাক পড়ে। হরেক রকমের নমুনা এল। বেছে নিয়ে তখুনি অর্ডার গেল অষ্ট্রিয়ার এক নামজাদা কারিগরের কাছে।

তারপর স্ট্যাম্প। ডাক টিকিট। ইংরেজের ঐ রাজাদের কাটা মুণ্ডুই চিরদিন থাকবে নাকি? ইংরেজ যাবে, আর থাকবে তাদের কাটা মুণ্ডু? আবার ডাক পড়ে শিল্পীদের।

চোখ জুড়োনো ছবি চাই। এ-ছবি যাবে সহরে, গ্রামে, ঘরে ঘরে। সবাই দেখবে। নতুন ডিজাইনের ছবি নয় শুধু, ছবি নতুন দিনের বারতা নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে স্বাধীনতার মর্মবাণী। ছাপা হল নানা ধরনের টিকিট।

সময় আর নেই। দেখতে দেখতে দুর্যোগের এই অমানিশা কেটে যাবে। এই মুহূর্তের দুর্যোগই হয়তো সত্য, কিন্তু এর চাইতেও অত্যন্ত আর এক বৃহৎ সত্য অপেক্ষা করছে,—স্বাধীনতা। সর্ববিষয়ের যোগ্যতা নিয়েই-না বরণ করে ঘরে তুলতে হবে ঐ অপার্থিব ধন।

জাপানের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের পর থেকেই নেতাজির চিন্তা ভিন্ন খাতে চলতে থাকে। মান্দালয় আর মেমিও, এদিকে আরাকান আর আকিয়াব। একেবারে ভারতবর্ষের গায়ে গায়ে। ওখান থেকেই দেশের মাটির গন্ধ নাকে লাগে। প্রাণ উতল হয়ে উঠবে না?

অনেকদিন কেটে গেল জার্মেনীতে। আর কোন আশা নেই।

পূর্বদিকের অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে। সাময়িক অনেক হটা ও হারা ইংরেজের ইতিহাসেও নতুন নয়। অনবরত। কিন্তু রাশিয়ার অবস্থা দেখে হিটলারের পশ্চাদাপসরণ সাময়িক বলে মেন হয় না।

গোটা জাতটা ক্ষেপে উঠেছে। বাল-বৃদ্ধ-যুবা এক সঙ্গে। এ-দৃশ্য অভিনব। আশ্চর্য। স্ট্যালিন নয়, নয় কোন রাষ্ট্র-প্রধান বা নেতা। একটা জাতি। জাতির সামগ্রিক সত্তা। এমন করে মরতে না জানলে বাঁচা যায়?

বিপ্লবের এ এক অনিবার্য পরিচয়। পরিণতিও। রূপান্তরণ। আমূল আর সর্বথা। পুরনো, বাসি, পচা বিদেয় করতে হবে। প্রাণহীন, যুক্তিহীন, আদর্শহীন সংস্কার সম্বল করে কোন দেশ বা জাতি বাঁচে না। প্রাণহীন একটা কঙ্কাল। প্রতিমার রং-মাটিহীন কাঠামো। না আছে শ্রী, না জলুস।

নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। নব রূপ, নব ভাব, নব আদর্শ, নবানি গৃহ্ণাতি…

নতুন দিন, নতুন আলো, নতুন মানুষ।

এই নিয়ে নতুন রাশিয়া।

এই রাশিয়া রুখে দাঁড়িয়েছে।

মুগ্ধ না হয়ে উপায় আছে?

বিশ্ব মুগ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু হিটলার এত বড় ভুল কেমন করে করলেন? কেন তিনি রাশিয়া আক্রমণ করতে গেলেন? রাশিয়ার শক্তি বোঝেননি বলে? অথৈ অগাধ মহাসাগরের মতো রাশিয়া। এক মনে নিজেকে গড়ে তোলবার সাধনায় আকণ্ঠ নিমগ্ন ছিল। বুঁদ হয়ে ছিল। অকালে রুদ্রের তপস্যা ভাঙতে গেলেন কেন হিটলার?

নেতাজির মনে এই ছবিই ভেসে উঠেছিল সেদিন আর সেইক্ষণে, যখন হিটলার উন্মাদের মতো পূর্ব রণাঙ্গনে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন

রাশিয়ার বুকে। গোয়েবোল্‌স্‌ হাজার বললেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যাবেন কী করে?

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ শতাব্দির বিরুদ্ধে যাওয়া।

তিনিও এই শতাব্দির সন্তান না?

প্রথম থেকেই এ-কথা হিটলারের কাছে খুব স্পষ্ট ছিল যে, জার্মেনী কোনক্রমেই যেন যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধে না মাতে। জার্মান জাতির অন্যতম স্রষ্টা বিসমার্কের সাবধান বাণী। এ-কথা হিটলার ভুলে গেলেন কেন?

কেউ কেউ বলে যে, ইংরেজের মনে প্রসন্নতা জাগাতেই হিটলার এ-কাজ করে থাকবেন। হেস্‌-এর প্রসঙ্গ তুলতেও তারা ভোলে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কোন প্রমাণ আছে?

আবার কেউ বলে যে, অনায়াস-লব্ধ ইওরোপের জয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে হিটলার আগামীকালের পরম-শত্রু রাশিয়াকে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। হবেও বা। কিন্তু তারই-বা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথায়?

তবে কি নিছক যুদ্ধজয়ের অদম্য প্রলোভন ও লালসাই তাঁকে উদ্দাম, উন্মাদ ও বেপরোয়া করে তুলেছিল?

আলেকজেণ্ডার যা করেন নি, নেপোলিয়ন যা পারেননি, সেই অবিনশ্বর বিজয়ীর কীর্তিই কি তাঁর কাম্য ছিল? হয় তো এ-সবের কিছুই ছিল না। প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে শুধু খেলেই গেলেন এই অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য শক্তিধর মানুষটি। মরা জার্মেনীকে গড়ে তুললেন নিজের হাতে, আবার উন্মাদ খেয়ালে নিজের হাতে খান খান করে তাকে ভেঙ্গে, নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন।

কিন্তু রাশিয়া? রাশিয়া কি এ-শক্তির অধিকারী হত, যদি সে পরাধীন থাকত?

দুর্জয় এই শক্তির জন্মদাতা বিপ্লব। কিন্তু পরাধীন দেশে কোনদিন কি বিপ্লব ঘটেছে? নাতো।

হবে ?

তাই। তাই নেতাজি চান সর্বাগ্রে স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে সে যেয়ে দাঁড়াতে পারত রাশিয়ার পাশে।

তাই নেতাজির কাছে স্বাধীনতা এত বড় আর এত বেশি কাম্য। যেমন করে হোক। যা দিয়ে হোক।

পরাধীনের ধর্ম নেই। অন্য কোন কর্মও নেই। একমাত্র ধর্ম আর কর্ম স্বাধীনতা অর্জন করা।

অস্থির হয়ে ওঠেন নেতাজি।

দেখা করেন জেনারেল ওসিমার সঙ্গে। জাপান-রাষ্ট্রদূত ওসিমা।

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ছিলেন এই ওসিমা। বিচক্ষণও। ওঁরই সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন কর্ণেল য়িয়ামামোতো। নেতাজির সব খবর ওসিমার নখদর্পণে। য়িয়ামামোতো তাঁর সংবাদদাতা।

এ-কথা নেতাজির মনে জাগে সর্বপ্রথম ১৯৪১-এ। ব্রহ্মদেশের পতনের অব্যবহিত পরই। কিন্তু সেদিন জাপানের বৈদেশিক দপ্তর রাজী হয়নি। ওসিমার অন্যতম সহকারী সিনহিগুইতির নিজের কথা : "মিঃ সুভাষচন্দ্র বোস বার্লিনে পৌঁছেই ইংরেজের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। একদিন এলেন আমাদের দূতাবাসে। জাপানে যাবার অভিপ্রায় জানালেন। মিঃ ওসিমা শুনলেন ওঁর কথা। এবং ওঁর কথা জানালেনও জাপানে। কিন্তু ফল কিছু হলো না। উত্তর এল, কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা উত্তর 'এখানে একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী রয়েছেন। আবার আর একজন কেন? বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিটাও সুবিধার নয়।'

"সিঙ্গাপুরের পতন হল ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। মিঃ চন্দ্র বোস আসতেন ঘন ঘন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে। তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাতেন বার বার।

"সেদিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মিঃ বোস এসেই জিজ্ঞেস করলেন : 'বলুন, কোনো খবর আছে?' আমি বললাম :

না। তবে আশা আছে। আচ্ছা, আপনি বিহারী বোসকে জানেন না?

'না'। বললেন মিঃ বোস। 'কিন্তু তাঁর কথা জানি। দীর্ঘদিন তিনি জাপানে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। আর এইটাই বড় কথা। মিঃ রাসবিহারী বোসের অধীনে সামান্য সৈনিকের মতো কাজ করবার যদি আমি সুযোগ পাই, তাই আমি যথেষ্ট মনে করবো। মোদ্দা কথা ভারতের স্বাধীনতা। তাই না? আমার যাওয়াটা আর একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না?'

"সংবাদ এলো: 'নিশ্চয়ই পাঠাবে। কিন্তু তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে সর্বাগ্রে। ওঁর জীবন অমূল্য। যদি নিরাপদে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারো,—পাঠাও।'

"জানুয়ারী মাস, ১৯৪৩। মিঃ চন্দ্র বোসকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। জার্মান সাবমেরিনে ওঁকে পাঠাতে হবে। আর এর জন্য চাই হিটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা একটা ভোজ-সভার আয়োজন করলাম।

"ভোজ-সভায় এলেন কয়েকজন বিশ্বস্ত জার্মান সরকারী কর্মচারী, সিরিয়ার বিশপ, ইরাকের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত আর আমি। মিঃ বোস এসেছিলেন তাঁর সহকারী মিঃ নাম্বিয়ারকে সঙ্গে করে।

"নানা কথার ফাঁকে মিঃ বোস জানিয়ে দিলেন যে, ভিয়েনায় রয়েছেন কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবী। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য একবার ভিয়েনায় যেতে হবে। মাসখানেক বড় জোর তিনি বাইরে থাকবেন।

"সবাই চলে গেলো। থাকলাম শুধু আমরা দু'জন। মিঃ বোস আর আমি। ঘণ্টাখানেক আমাদের কথাবার্তা হলো। তিনি শেষটায় বললেন: 'আমি জানি, আমার যাত্রাপথ খুব বেশি আরামের হবে না। কিন্তু এ-কথাও আমি জানি যে, নিরাপদে আমি পৌঁছেও যাবো।

আমার বন্ধুদের, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আমি সুখী হতুম। কিন্তু সম্ভব হবে কেমন করে? উপায়ই-বা কী? এরা রইলো এখানে। এদের আর এদের সঙ্কল্পের প্রতিনিধি হয়ে আমি একাই যাবো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমাদের একমাত্র কামনা। যদি পথে আমার কিছু ঘটেই, আমার সঙ্কল্পের কথা মিঃ রাসবিহারী বোসকে জানাবেন। এবং এ-কথাও জানাবেন যে, তাঁর ব্রত সার্থক হোক, এই আমার কামনা রইলো। আমার যাবার পর মিঃ নাম্বিয়ার থাকবেন আমার প্রতিনিধি হয়ে। এখানকার কাজ পরিচালনা করবেন তিনি।'

"মিঃ য়িয়ামামোতো এসিয়ায় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তিনিই আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবেন; বললাম আমি। আমাদের কথা শেষ হলো।" (১)

জার্মেনী থেকে কিন্তু খুব সহজে নেতাজির চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। হিটলার প্রথমটায় রাজীই হননি। যুদ্ধের মোড়-যে ঘুরতে শুরু করেছে, এ-কথা হিটলার কি ভাবতে চেয়েছিলেন? মুখে হয়তো কিছু বলেন নি। কিন্তু তিনি বোকা ছিলেন না। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান শক্তি, এবং ভারতবর্ষের রসদ ও সৈন্য-সম্ভার মিত্রপক্ষকে অনেকখানি নির্ভরতা দিয়েছে ও নির্ভয়ও করেছে এবং প্রথম পরাজয়-ধাক্কা মিত্রপক্ষ-যে অনেকখানি কাটিয়েও উঠেছে, এ-কথা স্বীকার না করে উপায় ছিল না। সর্বোপরি রাশিয়া-ফ্রন্টের বিপর্যয়। ঠিক এই সময়েই কি সুভাষ বোসকে হাতছাড়া করা যুক্তিযুক্ত হবে?

বিভিন্ন দেশের বেশ অনেক-কজন ইংরেজ-বিদ্বেষী নির্বাসিত জননায়ক সেদিন জার্মেনীতে ছিলেন। জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফ্‌তি, কিম্বা ইরাকের রসিদ আলীর মতো সুভাষ বোস হিটলারের কাছে কমদামী বন্ধকী মাল নন। এঁদের কথা ও কাজের মূল্য হিটলারের কাছে ছিল, কিন্তু সুভাষ বোসের মতো যথেষ্ট ছিল না।

(১) বিপ্লবী-নায়ক রাসবিহারী স্মারক-গ্রন্থ।

এই ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন বন্ধু ট্রট। নানা অজুহাত দেখিয়ে হিটলারের মন ভিজিয়েছিলেন ট্রট। জাপানকে হিটলার এ-সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য করতে পারেন নি। অথচ মিত্রপক্ষের লোকবল ও সামরিক প্রচেষ্টা এসিয়ায় সর্বাধিক আটকে রাখা জার্মেনীর স্বার্থের জন্য ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। জাপানের অনুরোধ উপেক্ষা না করে সুভাষ বোসকে যাবার অনুমতি শুধু নয়,—সাহায্য করলে জাপান খুসি হবে, এ-কথাটাও হিটলার হয়তো ভেবে থাকবেন।

জার্মেনীতে থেকে যা করতে নেতাজি ব্যর্থকাম হয়েছেন বা সুযোগই পাননি,—বার্মায় সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে শুধু সহজই নয়,—তাঁর একান্ত আয়ত্বাধীনও, বন্ধু ট্রটের কাছে নেতাজি নিশ্চয়ই এ-কথা বলেছিলেন।

নেতাজির সম্মুখে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁরই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাঁর প্রাণ-প্রিয় দুটি বাহু। নির্বান্ধব গৃহহারা জীবনের প্রতিটি প্রহর আর মুহূর্ত দিয়ে গড়া। লালন করা। কত বিনিদ্র রজনীর চিন্তা, কল্পনা, আর স্বপ্ন ওদের গড়ে তুলেছে। সব ছেড়ে, সব ছিঁড়ে, চলে যেতে হবে। যেতে হবে আবার আনকোরা আর এক নতুন পরিবেশে। আবার নতুন পরিস্থিতির সম্মুখে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। উত্তীর্ণ হতে হবে নবতম বাধা ও বিপত্তি। পার হতে হবে দুস্তর পারাবার। নতুন করে গড়ে তুলতে হবে কল্পনার সৌধ।

কেঁদে ওঠে সমগ্র সত্তা। প্রায় দুটি বছর গত হতে চলেছে। কত স্মৃতি, কত আনন্দ, কত বেদনা আর আঘাত ভিড় করে এসেছে,—সবই ঝড়ে পড়ে থাকবে জার্মেনীর এই তুহিন স্তূপের তলায়। তারপর সত্যিই যদি একদিন মিত্রপক্ষ জার্মেনীর বুকের ওপর এসে দাঁড়ায়,—কোথায় থাকবে এদের অস্তিত্ব? ভূমিকম্প বা প্লাবন নয়,—দাবানলও নয়,— রক্তের চাপে হয়তো একদিন সব একাকার হয়ে যাবে।

জীবনের কাঁটাতরুমূলে সবই ঝড়ে পড়ে থাকল। চলার পথের

ভুল-ভ্রান্তি, সুখ-দুঃখ সকল পার্থক্য ঘুচিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিল শুধু অপ্রতিহত চলার গতি-পথে। থাকল শুধু অবিরাম যাত্রা। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। সৌর-জগৎ আর মানব-জগতে পার্থক্য কোথায়? কতটুকু?

লাভালাভৌ-জয়াজয়ৌ-ভাবনার সমাধি-লগ্ন কি দেখা যায়?

কিয়েল থেকে নেতাজি জার্মান-সাবমেরিনে চড়ে বসলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

সঙ্গে থাকলেন একটি মাত্র লোক,—আবিদ হাসান।

আবার যাত্রা হল শুরু।

সেই ভয়ঙ্কর যাত্রার প্রাক্কালে একবারও কি একখানি করুণ শুভ্র অনিন্দিত মুখছবি ক্ষণিকের তরেও চোখের ওপর ভেসে উঠল না? বিদেশের মায়াহীন অনাত্মীয় পরিবেশে যার অনাড়ম্বর ও সজাগ সাহচর্য সব চাইতে জুগিয়েছিল শান্তি ও সান্ত্বনা, তার কথা বারেকের তরেও কি এই উত্তাল ও উন্মাদ অভিসারের পথে মনের কোণে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করেনি?

হায় গোপা, যুগে যুগে এমনি করে বৃহত্ত্বের যূপকাষ্ঠে তোমরা বলি হয়েছ। আর বড়দের ভক্ত ও শিষ্যের দল, জনতার স্রোত, অবহেলার আশ্চর্য দম্ভে তোমাদের শুধু অস্বীকারই করেনি, অপমানও করেছে। কিন্তু তোমরা? চিরদিন ক্ষমা সুন্দর প্রেমের অপার দাক্ষিণ্যে সকলকে দিয়েই এসেছ অপরূপ করুণা। একটিবারও মুখ ফুটে বলতে পারনি যে, তোমরা না থাকলে বিগত জীবনের সেই দুঃসহ দিন আর অন্ধকার রাত্রি আনন্দ ও সান্ত্বনা দিয়ে কে ভরে রাখত? কে তাদের বৃহৎ ও মহৎ নায়ককে করে তুলত কালজয়ী?

কাব্যে উপেক্ষিতার কবি বিস্মৃত প্রায় অতীতের শুধু বিষণ্ণ করুণ অবগুণ্ঠিতা বধূ উর্মিলার দিকে নিবদ্ধ না রেখে আর একটু ধারে কাছেও তো চাইতে পারতেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের ছিদ্রহীন নির্জনতার মধ্যে নবজাত সন্তান বুকে ধরে বধূ গোপা যেদিন ভগবান-তথাগত-হতে-চাওয়া

স্বামীর অন্তর্ধানের পথপানে চেয়ে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, কবি কি তা বারেকের তরেও শোনেন নি? শোনেন নি কি বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার হাহাকার?

আর এক উপেক্ষিতার কথা জেনে জাননি নিশ্চয়ই, কিন্তু জানলেও কবির অমৃত লেখনীর বিন্দু পরিমাণ করুণাও কি এই নবতম মহাকাব্যের নতুন উপেক্ষিতার প্রতি বর্ষিত হত?

মহাসিন্ধুর ওপার থেকে যে-ডাক এল সংগোপনে, তা-ছিল দুর্নিবার।

জল কেটে ছুটে চলে সাবমেরিণ। দূরে মাডাগাস্কার। তারপর?

॥ ছয় ॥

তারপর জাপানের সাবমেরিণে।

এবং সাবমেরিণ এসে থামল সুমাত্রার সাবাং-এ। সেখান থেকে নেতাজি টোকিও পৌছেন বিমানে, ১৩ই জুন, ১৯৪৩।

একান্ত তাচ্ছিল্য ভরে অথবা সহজভাবে হয়তো কথাটা লেখা অথবা বলা আজ কঠিন নয়। সাবমেরিণ যারা দেখলই না জীবন ভোর, যে-দেশের সার্বভৌম রাষ্ট্র কুড়ি বছরের মধ্যে একখানা সাবমেরিণের মালিক হতে পারল না, তাদের পক্ষে এই বিষয়টির প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবার বা গুরুত্ব না দেবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেদিন যুদ্ধরত কোন দেশই তা ভাবতে পারেনি।

সাবমেরিণ যাবে হয় ইংলিশ চ্যানেলের ভেতর দিয়ে, আর না হয় উত্তর সাগর ঘুরে। দুটো পথেই বিপদ ও আপদের অন্ত ছিল না। নেতাজির সাবমেরিণ গিয়েছিল উত্তর সাগর ঘুরে।

বস্তুত পথের দুর্গমতা ও বিপদ সঙ্কুলতার জন্যই এর পূর্বে নেতাজির দূরপ্রাচ্যে যাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সাবমেরিণে রওনা হবার বিলম্ব দেখে তিনি খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বার বার ইটালীতে গেছেন। মাঝে মাঝে ইটালীর দু-একখানা বিমান জাপান এবং দূর প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করত এবং নেতাজিও এ-কথা জানতেন। ঐভাবে বিমানে তিনি ছুটে যেতে চেয়েছিলেন। ইটালী-সরকার এ-ঝুঁকি নিতে রাজী হয়নি।

নব্বই দিন পা টান করে বসবার জায়গা ছিল না। এক কোণে জড়সড় হয়ে নেতাজি আর হাসান ঠায় বসে কাটিয়েছেন। বসে বসেই খেয়েছেন, একটু ঘুমিয়েও নিয়েছেন। ক্রুবা ডুবোজাহাজের মাল্লাদের, মিস্ত্রী, ইনজিনিয়ার, সর্বোপরি ক্যাপ্টেন,—এদের কথা ভাবতে হবে

সকলের আগে। ওরা যাতে একটু আরাম পায়, কাজের ফাঁকে যাতে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে, একটু ভালো খাবার, এর ব্যবস্থা চাই সর্বাগ্রে। ওদের দুশ্চিন্তাও কি কম? নেতাজির পরিচয় ওদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল না। কত বড় দায়িত্ব ওদের স্কন্ধে,—অবহিত ছিল ওরাও।

নব্বই দিন দাড়ি কামান নি। জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল সারা মুখখানা। পরিচ্ছদও ছিল ঐ ক্রুদের মতোই। দু'জনেই ছিলেন ফর্সা। তারপর মুখভরা দাড়ি। মুখে অনর্গল জার্মান বুকনি। হুবহু জাহাজের মাল্লা। যদি দৈবাৎ ধরাই পড়তে হয়, শত্রুপক্ষ ভারতীয় নাও ভাবতে পারে। হয়তো ভাববে জার্মান; না হয়তো ইটালিয়ান। সব দিকে নজর। আঁটঘাট বেধে কাজ। নিখুঁত। পূর্ণাঙ্গ।

অতন্দ্র প্রহরী সর্বক্ষণ পেরিস্কোপের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ রেখেছে ফোঁকরে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান ঘোরে বাঁই বাঁই করে। জলের নিচে শত্রুর সাবমেরিণ। ক্ষুদ্রতম সন্দেহে দেবে চালিয়ে কামানের গোলা। নয়তো টরপেডো। জলের বুকে ঘুরে বেড়ায় সদা-সতর্ক জাহাজ। নানা ধরণের। ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার,—এতো থাকবেই। তা'ছাড়া অসংখ্য ছোট-বড় টহলদারী দ্রুতগামী বোট। ডেপ্তচার্জ তৈরী হয়ে আছে। দেবে দেগে নিঃসারে। এরই ভেতর দিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলেছে সাবমেরিণ।

মুখে কথা নেই। হাসান মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখেন মুখখানা। চিন্তার সূত্র খুঁজতে থাকেন হাসান। থৈ পান না। অতল জলধি নিস্তরঙ্গ ধ্যানে মগ্ন।

সত্যিই, চিন্তা-ভাবনার তো লেখা-জোখা ছিল না। থাকবার কথাও নয়। আবার নতুন করে গোড়া পত্তন। নতুন পরিবেশ। নতুন ক্ষেত্র। ভারতবর্ষের সন্নিকটে বার্মা সত্যিই এবং জাপানও খুব বেশি দূরের নয়। এসিয়ারই। কিন্তু এসিয়ার হলেই-যে জাপান ভারতবর্ষের চাওয়া বুঝতে চাইবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? হিটলার ইওরোপের

হয়েও ফ্রান্‌স্‌কে, পোলাণ্ডকে, আর-আর সবাইকে কি রেহাই দিয়েছেন ?

দেননি। জাপানও কি দেবে ? জগতের জাতি ভাগ ও ভেদের কথায় জার্মেনী, ইংলণ্ড, আমেরিকা আর জাপানের পার্থক্য থাকবে কেন ? ওরা তো একই জাতের। সবাই সাম্রাজ্যবাদী। ওদের সহানুভূতি কিম্বা প্রেম নেই। আছে শুধু প্রয়োজনীয়তা। হিটলার সাহায্য দিয়েছে, দিয়েছে সুভাষ বোসকে, দিয়েছে তার প্রয়োজন ছিল বলে। জাপানও দেবে,—তার দরকার আছে বলে। কেউ প্রেমে দেয়নি, দেবেও না।

অগ্নিযুগের রাসবিহারী আছেন ওখানে। জাপানে। জীবনভোর স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখে গেলেন এই মানুষটি। কত দীর্ঘ আর প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল ঐ জীবনের ওপর দিয়ে। দমাতে পারেনি। নির্ভীতির এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত রূপ।

সাক্ষাৎ কোন পরিচয় নেই ওঁর সঙ্গে। যা জানেন, সবই শোনা। কেমন সম্বন্ধ দাঁড়াবে, কে জানে ? প্রসন্ন মনে তিনি তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন তো ? তাঁর সাদর নিমন্ত্রণ তিনি পেয়েছেন। তবু মনে সন্দেহ জাগে। জাগে ভয়।

মানুষের অন্তর। দুর্জ্ঞেয় তো বটেই, চিরদিনের রহস্যময়ও। এই বুকেই বাস করে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম। আবার এই বুকেই ভিড় করে থাকে ঈর্ষা, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা। বিচিত্র এই সহ-অবস্থান।

তাই, এই যাত্রার পথে আনন্দ আছে, আছে নব আশার হাত দোলানী,—কিন্তু আশঙ্কাও কম নেই। ভাবতে ভাবতে চলেছেন এক মুক্তিকাম অনন্য সাধক। দিনের পর দিন বৈচিত্র্য আর বিস্ময় জমে উঠেছে সীমাহীন হয়ে। বহুজনের চোখের সামনে এই জীবনটি নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে চলেছে অনবরত। নইলে মনে হত গল্প। রহস্যোপন্যাসের যেন কোন নায়ক।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন একবস্ত্রে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর বহু

আকাঙ্ক্ষিত এক অভিনব সংস্থা গড়ে তুললেন জার্মেনীতে। জীর্ণ বস্ত্রের মতো সে-সব পরিত্যাগ করে ছুটে চলেছেন আবার নবতর পথের সন্ধানে। আবার সেই এক বস্ত্রেই।

স্নেহ-মায়া-ভালবাসা,—এ সবই কি এই মানুষটির কাছে একেবারেই অর্থহীন? মিথ্যা? কোন বন্ধনই এঁর জীবনে বড় হয়ে দেখা দিল না কেন? নাম-যশ-খ্যাতি, প্রতিষ্ঠান-সম্পদ-ঐশ্বর্য,—কিছুই বাঁধতে পারল না এই পাগলকে?

অথবা সবই ছিল এঁরও। উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল সব এঁর অগ্নিশুদ্ধ তপস্যায়? গঙ্গার চিরশুদ্ধ অমৃত প্লাবনের বুকে ওরাও থাকল চিরপবিত্র নির্মাল্য হয়েই?

নব্বই দিনে দেহের ওজন কমে গেল চৌদ্দ পাউণ্ড।

নেতাজি বেরিয়ে এলেন সাবমেরিণ থেকে। চড়ে বসলেন বিমানে। নামলেন টোকিওতে। "নেতাজি। সমস্ত অবয়ব সমুন্নত। হালকা বাদামী রং-এর প্যান্ট আর কোট পরিধানে। হাতে গাঢ় বাদামী রং-এর ফেল্ট টুপি। মুখে স্মিত হাসি। মনে হয় সেই হাসিতেই বিশ্ব জয় করে নিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ব যেন ঝরে পড়ছে। সঙ্গে রয়েছে একটু গর্বের ছোঁয়াচ। আমাদের নেতাজি এসে দাঁড়ালেন। পাশে মহানায়ক রাসবিহারী। (১)

সিঙ্গাপুরের সিনেমা হল, ক্যাথে বিল্ডিং-এ সভার আয়োজন হয়েছিল। হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ঠাঁসা। বাইরে অগণিত নরনারী। মানুষের মহামেলা। গৃহ উজার করে সমগ্র সিঙ্গাপুর দাঁড়িয়েছে সভাতলে। এসেছে ভারতবাসী, মালয়বাসী, জাপানী, চৈনিক। এসেছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার নানা স্থানের লোক। আর এসেছে জাতীয় বাহিনীর সৈনিকেরা।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩। মহানায়ক রাসবিহারী তুলে দিলেন দক্ষিণ-

(১) ভারত-বিদ্রোহী কন্যার রোজনামচা—'জয়হিন্দ'

পূর্ব-এসিয়ার আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ আর ফৌজ নেতাজির হাতে। ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী বরণ করে নিল সেই মুহূর্তে তাদের নেতাজিকে।

ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। বিদেশের এক জনতামুখরিত প্রান্তরে ভাবীকালের বক্ষে সঙ্কল্পের শীলা কঠিন সাক্ষরে লেখা হল এক বিচিত্র বারতা। দেড় শতাব্দির ইংরেজ-ইতিহাস সহসা বিবর্ণ হয়ে উঠল। ইংরেজ কি সেদিন একথা জানত?

না, জানত না।

জানত না যে, এইদিনে আর এইক্ষণে তার পরিপূর্ণ অপসারণের আয়োজন রূপ ধরে দাঁড়াল। জানত না আরও একটি কথা,—শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের যূপকাষ্ঠে অতি দীর্ঘদিন পড়েছিল এসিয়ার একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অগণিত আর্ত মানব-আত্মা, তাদের মুক্তির দিনও সমাগত।

সেদিন সেই স্থানেই নেতাজি অস্থায়ী আজদ-হিন্দ সরকার গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিলেন। এ-ঘোষণা আচমকা। অপ্রত্যাশিত। চমকে উঠল সবাই। সঙ্গে সঙ্গে একটা অবারিত আনন্দ উল্লাসেরও অবধি রইল না। স্বাধীন ভারত সরকার,—আর তার সঙ্গে যে-মানুষটি এই সম্ভাবনার ঘোষণা নিয়ে দাঁড়ালেন এসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সম্মুখে, মুহূর্তে অভিভূত হয়ে প্রত্যেকে তাঁকে শুধু অন্তর দিয়ে গ্রহণই করল না,—বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় আর স্বতোৎসারিত মমত্বে তাঁর হাতে নিঃশেষে নিজেকে সঁপেও দিল।

টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে নেতাজির সাক্ষাৎ হয়েছে। আলোচনাও হয়েছে অনেক। এ-কথাও কি হয়েছিল? যদি হয়েও থাকে, এই সর্বনাশা সময়ে জাপান কি প্রসন্ন মনে নেতাজির এ-প্রস্তাবে রাজী হয়েছে?

কথাটা শুনতে বেশ। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার। কিন্তু এর পেছন থেকে যে-সব সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্ন দেখা দিতে চায়, তার সমাধানও কি এতই সহজ? সাধারণ ঘোষণা নয়। এই ঘোষণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী

জড়িত রয়েছে বহু সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমস্যা ও তাৎপর্য।

জাপান নিজে জড়িয়ে পড়েছে জীবন-মরণ সংগ্রামে। পশ্চিম রণাঙ্গনের সংবাদ মোটেই আশাপ্রদ নয়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাকে একা দুটি শ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই পটভূমিকায় নেতাজির এই গভীর অর্থপূর্ণ ঘোষণার যে বিপুল দায়িত্ব জাপানের স্কন্ধে এসে পড়বে, তার পরিণাম ?

শুধু তার নিজের কথাই নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার মিত্রদের প্রশ্নও। তারা কি স্বীকৃতি দেবে ? স্থায়ী হোক, আর অস্থায়ী হোক, —স্বীকার করে নেবার পরমুহূর্ত থেকে এই সরকারকে দিতে হবে একটা পুরোপুরি আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ মর্যাদা, সকল কূটনৈতিক ও রাজনৈতক বিশেষ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা।

এছাড়া প্রটোকল : রীতিমতো দলিল ও দস্তাবেজ সহকারে সকল সম্পর্কের চুল-চেড়া বিধি ও বিধান। জাপানের সম্রাট ও আজাদ হিন্দ সরকারের অধিনায়কের মধ্যে ব্যবহারিক কোন পার্থক্য থাকবে না, জাপানের প্রধানমন্ত্রী থেকে, প্রধান সেনাপতি কিম্বা অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক।

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার (জাপ অধিকৃত) যাবতীয় ভারতীয় নাগরিক আইনত থাকবে স্বাধীন ভারত সরকারের অধীন হয়ে। জাপানের নয়। কোনও জাপানী আইন, সে সামরিক হোক, আর নাগরিক হোক, এদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। হলেও তা ভারত-সরকারের জ্ঞাতসারে এবং অনুমোদন সাপেক্ষ হতে হবে।

কিন্তু কথাটা শুনে সকলের প্রথমেই চমকে উঠেছিল জাপানী হিকারি কাইকান। সংক্ষেপে সংযোগ প্রতিষ্ঠান (Liason office) কিন্তু কার্যত সকল ব্যবস্থার কর্ণধার।

জাপানী ভাষায় হিকারি কাইকানের অর্থ দীপালয়,—অর্থাৎ দিশারী। এ-সব কথা এদেরই সর্বাগ্রে জানবার কথা। কিন্তু এই

সম্ভবত প্রথম, এ-প্রথার ব্যতিক্রম ঘটল। ওরা জানল না, অথচ ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ওরা রাগে ফুলতে লাগল। জাপানীরা রাগে কিন্তু বোঝা যায় না। সেই ভাবহীন, ভাষাহীন পাণ্ডুর মুখ ও চোখ শুধু চেয়ে থাকে পাথরের মতো। থাকলও তাই। আর, সেইদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত সম্পর্ক কোনক্রমেই স্বাভাবিক ও সহজ হবার সুযোগ পেল না।

এই কাইকানের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন য়িয়ামামোতো। ইনিই জার্মেনীতে ছিলেন জাপানী রাষ্ট্রদূতের সামরিক উপদেষ্টা হয়ে। জার্মেনীতেও নেতাজির আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ছিল। ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজও। কিন্তু বিধি ও বিধান অনুযায়ী তার সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রের নিয়মানুগ সম্পর্ক খুব বেশি ছিল না। অনেকটা আধা-সরকারী সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছিল।

এবং এর ফলে বিধিসঙ্গত একটা গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য সুযোগ ও সুবিধারও অভাব ছিল। য়িয়ামামোতো এ-তথ্যের সঙ্গে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এখানেও বড় জোর ঐ প্রকার ব্যবস্থা হলে তাঁর এবং কাইকানের অন্যান্য কর্মচারীদের মনঃপূত হত। অস্থায়ী ভারত-সরকার গঠনের ইঙ্গিতে, তাই, তাঁদের উল্লসিত হবার কারণ ছিল না।

প্রথম থেকেই কাইকানের এই আচরণ নেতাজি অনেকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি এ-কথা জাপানে পা দিয়েই বুঝেছিলেন যে, এই বুরোক্রাসির কাছে একবার আত্মসমর্পণ করলে আর রক্ষা নেই। সর্বদেশে ও সর্বকালে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বড় গলদ এইখানে। নেতাজি তাই প্রথম থেকেই এদের প্রতি একটা চরম উপেক্ষা দেখিয়ে এই কথাটাই এদের বোঝাতে চাইলেন যে, একটা বৈপ্লবিক মানস আর যাই করুক, কোনক্রমেই পরদেশী সরকারের তাঁবেদারি করবে না।

ইংরেজ ও আমেরিকা সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর নবগঠিত সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক আয়োজন খুবই-যে অকিঞ্চিৎ-

কর, এ-কথা নেতাজির অজানা নয়। এবং এ-কথাও তাঁর অত্যন্ত জানা যে, এই আয়োজন কার্যকরী ও সার্থক করতে হলে জাপানের সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু জাপানের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির উপস্থিতি এবং তাঁর সামরিক সাহায্য যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, খুব বেশি উপেক্ষারও অপেক্ষা রাখে না,—নেতাজির বিশ্লেষণ পটু মনে এ-কথা উদয় না হয়ে পারেনি। জাপান এ-বিষয়ে বিলক্ষণ সজাগ ও ওয়াকিবহাল, এ-বারতা নেতাজিরও অজ্ঞাত ছিল না।

বিপুল সৈন্য ও রসদ নিয়ে জার্মেনী ডুবতে বসেছে রাশিয়ার তুষার স্তূপের নীচে। আর আগে নয়। এবার পেছনে। দাঁড়াবার অবকাশ নেই।

হিটলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর দেশকে যে, বড়দিনের উপহার তাঁর দেশকে তিনি দেবেন মস্কো। কুড়ি মাইল দূর থেকেই হিটলারকে পিছু হঠতে হল। স্ট্যালিনগ্রাডের সহরতলি থেকে স্ট্যালিনের গৃহ দেখা যায় না? কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখবার ফুরসৎ কৈ? উদ্যত কিরিচের ফলা বুকে লাগে। পিছু হটে হিটলার বাহিনী।

আর সংশয় নয়। নিশ্চিত পরাজয়। পূর্ব রণাঙ্গণের জয়াশা স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্ট্যালিনগ্রাডে ফিরতি মার যা খেল হিটলার বাহিনী, তা ভোলবার উপায় রইল না। কোমর-ভাঙ্গা জার্মান সৈন্যদল শুধু পিছুই হটে। দাঁড়াতে পারে না কোথাও। রষ্টভ, নভোরসিক্স্ ছাড়িয়ে ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে হটতেই থাকে। খারকভে কি দাঁড়াতে পারবে? ভরসা কৈ?

মস্কোর সামনেও সেই একই বিপর্যয়। প্রথম দিকের ধাক্কায় জার্মান সৈন্য পিছিয়ে এল প্রায় তিনশো মাইল। তারপর ক্রমাগত।

লেলিনগ্রাড। পাহাড় গড়ে উঠল জার্মান সৈন্যের মৃতদেহে। পথ, ঘাট, মাঠ ভরে গেল। তার ওপর ধবল তুষার গড়ে তুলল সমাধি-মন্দির।

১২ই আগষ্ট (১৯৪৩) চার্চিল পৌঁছালেন মস্কো। এই প্রথম। অস্পৃশ্য কমিউনিষ্ট রাশিয়া জাতে উঠল।

হিটলারের আক্রমণে কমিউনিষ্টরা ভদ্রলোকের সমাজে মেশবার যোগ্যতা পেল। জাপানী আক্রমণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পেল স্বাধীনতা।

স্ট্যালিনের সঙ্গে চার্চিলের সলা হল প্রচুর। পরামর্শও কম নয়।

এইখানেই সিদ্ধান্ত হল যে, পয়লা নম্বরের শত্রু হিটলার। দোসরা জাপান। ইওরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতেই হবে। এবং খুলতে হবে দেরি না করে।

রোমেল তাঁবু ফেলেছিলেন এল আলামিনের দ্বারদেশে।

ওয়াশিংটনের সভায় স্থির হয়েছিল যে, রোমেলের পেছন থেকে ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার উত্তরাংশে মিত্র-বাহিনী অবতরণ করে এগিয়ে যাবে। দখল ওরা সত্যই করল এবং এগিয়েও গেল। সম্মিলিত এই বাহিনীর নায়ক হলেন আইজেন হাওয়ার। পরিকল্পনার গোপন নাম হল 'টর্চ'।

স্ট্যালিন চেয়েছিলেন ইওরোপের রণাঙ্গন, কিন্তু ইংরেজ-আমেরিকা সাহস পায়নি। মরুভূমির প্রান্ত ঘেঁষে দ্বিতীয় ফ্রন্টের আক্রমণ শুরু হল। রোমেল পিছু হটলেন। রোমেল পরিশ্রান্ত। রোমেল অসুস্থ। তদুপরি রোমেলের অনেক ট্যাঙ্ক আর বিমান চলে গেছে রাশিয়ার ফ্রণ্টে।

তিউনিশিয়া দখল করে মিত্রপক্ষ চুপ করে বসে থাকল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল সিসিলীর ওপর। এই অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'হাস্‌কি'। ভূমধ্য সাগরের এক তীরে তিউশিনিয়া, অপর প্রান্তে মালটা; মিত্রপক্ষের দুটি সরবরাহের শক্ত ঘাঁটি। সিসিলীর পতন হল ১৯৪৩-এর ১৭ই আগষ্ট।

মুসোলিনির পতন আসন্ন। গোপন ষড়যন্ত্রে ছেয়ে গেছে ইটালীর সর্বত্র; ওঁর জামাতা আর বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কাউণ্ট শিয়ানো

বিরোধী দল ভারী করেছেন। জেনারেল ব্যাডাগ্লিওকে প্রধান মন্ত্রী করে ইটালীর রাজা নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। মুসোলিনি কার্যত বন্দী হলেন। (২৫শে আগষ্ট)

হাওয়াই জাহাজের খেল দেখিয়ে হিটলার মুসোলিনিকে উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু ইটালীর আত্মসমর্পণ অত্যাসন্ন, এ-সংবাদও হিটলারের অবিদিত ছিল না।

ইটালী আত্মসমর্পণ করল ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

ইওরোপ-রণাঙ্গনের এই বিপর্যয় নেতাজি পূর্বাহ্নে যেন নিজের চোখে দেখেই ইওরোপ পরিত্যাগ করেছিলেন। কার্যত এই সংবাদে, তাই, তিনি বিস্মিত বা বিচলিত আদৌ হননি।

দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার রণাঙ্গনে নেতাজির উপস্থিতি যদি পূর্বে ঘটত, পরিণাম কী হত, আজ তা আলোচনা করে লাভ নেই। হয়তো কিছু ভালোই হতে পারত,—কিম্বা হত না।

হিটলার ডানকার্কে যদি ইংরেজ-সৈন্য নির্মূল করতেন, যদি তিনি রাশিয়া আক্রমণ না করতেন, যদি জাপান আমেরিকার ওপর না হামলা করত,—কী হত?

যা হত,—হয়নি।

অপ্রস্তুত পরাজিত ইংরেজ ১৯৪৭-এর অনেক পূর্বেই ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হত। তা হল না। এবং এই কারণেই, যে-প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক, তা সম্পূর্ণ করবার সময় নেতাজি পেলেন না।

তাই বলে চুপ করে তিনি বসেও থাকলেন না। বরং বিনষ্ট সুযোগ ও সময়ের ক্ষতিপূরণের আশায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন আয়োজন ও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে। মুহূর্তকাল বিশ্রাম নেবার কথা তাঁর মনে জাগল না। ক্ষণ বয়ে যায়। নিজের ও জাতির মাহেন্দ্রক্ষণ। উদ্দাম হয়ে উঠলেন নেতাজি।

চ্যান্স্যারী লেনে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের হেড কোয়ার্টার, আর টম্সন্

রোডে ফৌজের। সকল বিভাগের পুনর্গঠন আর নতুন ও ব্যাপক বিস্তারের কাজ চলল বিদ্যুদ্বেগে।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩, নেতাজি-জীবনের একটি বিশেষ দিন আর ক্ষণ। নেতাজি গ্রহণ করছেন ফৌজের প্রণাম। দেখছে পঞ্চাশ হাজার ভারতবাসী।

উদ্বেল জনতা। কল্পনার প্রত্যন্ত আর চোখে পড়ে না। হারিয়ে যায় সংবিৎ। ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস রচিত হল রক্তের সাক্ষরে। জাতীয় সৈনিক। মুক্তি ফৌজ।

তিন রং-এর ছোট পতাকা, নানা ধরনের পরিধেয় আর মুখে বন্দে মাতরম্, এই সম্বল করে ছোট ছোট দলের মিছিল যখন রাজপথ ধরে যেত, ভেঙ্গে পড়ত জনতা পথের দু'ধারে। অলিন্দে দেখা দিত কল্যাণময়ী ভারতনারী। মুখভরা হাসি। বুকভরা প্রসন্ন আশীর্বাদের মিষ্টি মধুর কামনা। সেই পরাধীন ভারতের জাতীয়-সৈনিক। কল্পনা নয়,— বাস্তব, প্রত্যক্ষ। চোখ ভরে জল আসতে চায় যে।

মঞ্চে উঠেই নেতাজি বলে উঠলেন: "সাথিয়োঁ অউর দোস্তোঁ,..."

থর থর করে কেঁপে ওঠে সারা অঙ্গ। এ-কী প্রচণ্ড প্রবাহ? ভাসিয়ে নিতে চায় সবাইকে। এ-ডাক তো প্রতিদিন আসে না। এই অপার্থিব ডাক তারা শুনবে, তাই-ই কি জানা ছিল? বিধাতার আশীর্বাদের মতোই অতি অকস্মাৎ এই পরম ডাক রুদ্ধ চিত্তের দ্বারে এসে সবলে করাঘাত করল। শিউরে উঠল মনের গোপনতম নিভৃত তন্ত্রী। বদ্ধ কবাট খুলে গেল। (One could see with half an eye that a thrill ran through the ranks of the guard of honour at being addressed by such a great man as "Santhion aur doston"—Ayer)

বিবেকানন্দের সেই ডাক: "আমার বোনেরা, আর ভাই-এরা"। দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল একটি ছোট ডাক। দুটি মাত্র শব্দ।

কবির সেই গান: "যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকিতে।"

একদিনে আর ছুটি শব্দে নেতাজি জয় করে নিলেন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া।

নেতাজি বলে চলেছেন: "আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ও গর্বের দিন আজ। শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এ-কথা ঘোষণা করবার অধিকার পেয়ে আমি ধন্য যে, ভারতবর্ষ তার মুক্তি-ফৌজ গড়ে তুলেছে। এই সিঙ্গাপুরেই একদিন ইংরেজের ছুর্ভেদ্য ছুর্গ ছিল। আর আজ এই সিঙ্গাপুরের রণক্ষেত্রেই ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে সজ্জিত। এই বাহিনীই ইংরেজের দাসত্ব থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবে।···বৃটিশ সাম্রাজ্যের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ছোট একটি শিশুও নিঃসংশয়ে এ-কথা বলতে পারে যে, ইংরেজের সাম্রাজ্য অতীতের একটা ছুস্বপ্ন মাত্র।···

"কমরেডস্, আমার নির্ভিক মুক্তি-সৈনিক, আজ তোমাদের কণ্ঠে একটি-মাত্র ধ্বনি গর্জে উঠুক,—'দিল্লী—চলো দিল্লী'। আমি জানিনে আমাদের মধ্যে ক'জন এই সংগ্রামের পর বেঁচে থাকবে। কিন্তু এ-কথা আমি জানি, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর একটি সমাধিস্থান প্রাচীন দিল্লীর লালকিল্লায় যেদিন আমাদের মধ্যেকার জীবিত বন্ধুরা বিজয় উৎসবে মেতে উঠবে, সেইদিন হবে আমাদের প্রারব্ধ কর্তব্যের অবসান।···

"কমরেডস্, ভারতবর্ষের জাতীয় মর্যাদার তোমরাই রক্ষাকর্তা। তোমাদের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠবে ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।···

"নিঃসংশয় কণ্ঠে আমি আজ তোমাদের কানে এই আশ্বাস জানিয়ে যাই, আমি থাকবো চিরদিন তোমাদের ছুর্যোগের অমানিশায় আর সৌভাগ্যের সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের আলোয়। আমি থাকবো ছুঃখ ও আনন্দের সাথী হয়ে, আমি থাকবো জীবন আহুতি দেবার ছুর্জয় অভিযানে আর বিজয়ের উল্লাস মুহূর্তে।"

"আজ আমি রিক্ত। দেবার আমার কিছুই নেই। শুধু তোমাদের

দিতে পারবো অনাহার, বুকফাটা পিপাসা, অনন্ত দুঃখ, অনিশ্চিত অজানা পথের অপরিমেয় কষ্ট আর মৃত্যু।”...

কথা শেষ হয়ে গেছে। কেউ টের পেল না তা। শান্ত স্তব্ধ প্রান্তর বোঝাই জনতা জমাট বেঁধে গেছে। ভাষা খেই হারিয়ে ফেলেছে। দূরাগত এক স্বপ্নপুরীর কোন-এক রাজপুত্র সহসা তাদের কানের কাছে বাঁচবার মন্ত্র, জাগবার মন্ত্র গেয়ে গেলেন। মৃত্যুর মন্ত্র দিয়ে অমৃতের আবাহন;—এ-যে দুর্নিবার। এ-যে কল্পনাতীত।

সেই নীল আকাশ ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুক বোঝাই জনতা নিমেষের মধ্যে নিজেদের পৃথক সত্তা বিস্মৃত হয়ে নেতাজির প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। বিশ্ব-চরাচরের ভৌগোলিক সীমা-রেখা অতিক্রম করে একটি অনাস্বাদিত পুলকের গৌরব মুহূর্ত তাদের সকল মন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ করে দিল। তারা আর পরাধীন নয়। স্বাধীন। বার বার এই মন্ত্র তাদের সকলের প্রাণে ধ্বনিত হতে থাকল।

পরদিন জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো এলেন সিঙ্গাপুরে। একসঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দাঁড়ালেন পাশাপাশি। দুই রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উড়ল এক সঙ্গে। গার্ড অব অনার দেয়া হল জেনারেল তোজোকে।

“নেতাজির বাংলো। সেই ঐতিহাসিক দিনটির দু'দিন পূর্বের কথা। ১৯শে অক্টোবর। রাত্রিবেলা।

“রাতের আহার সবে শেষ হয়েছে। পাশের ঘরে যেয়ে ঢুকলাম। টাইপ রাইটার আর কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে আমি তৈরী। কখন ডাক পড়বে, স্থিরতা নেই। ঘুম পাচ্ছে। ভাবলাম, মেসে যেয়ে ধুতি-কুর্তা পরে শুয়ে পড়ি। ঢলে পড়ি ঘুমের কোলে।

“সহসা ডাক পড়লো। গেলাম। নেতাজির কক্ষ। ছোট্ট একখানি ঘর। দশ ফুট লম্বা আর চওড়াতেও তাই। একখানা টেবল

সামনে। এক পাশে কয়েকখানা চেয়ার। অন্য পাশে নেতাজির আসন।

"লক্ষ্মী এসেছিলেন ছু'মিনিট আগে। চলে গেলেন কথা কয়ে। লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে নেতাজি এগিয়ে এসেছিলেন দোরের কাছে। ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়। দাঁড়িয়েই আছেন। গম্ভীর মুখ। কী ভাবছেন? ফিরে চাইলেন আমার দিকে। খুব নরম গলায় বললেন: 'কী অসাধারণ মেয়েটি; ভগবান ওকে রক্ষা করুন।'

"গভীর রাত্রি। দ্বিপ্রহর।

"সামনা-সামনি আমরা বসে। নেতাজির বাঁ হাতে এক গোছা শাদা কাগজ। ডান হাতে পেনসিল। শুরু হলো লেখা: '১৭৫৭ সাল। বাংলা দেশে প্রথম ভারতবর্ষ পরাজিত হলো ইংরেজের হাতে।—'

"চোখ আর একবারও কাগজ থেকে উঠলো না। একটার পর একটা কাগজ আমার দিকে শুধু এগিয়ে দেন। হাতে তুলে নেন নতুন কাগজ। আবার শুরু হয় লেখা। অনবরত। বিরামহীন। পাশের ঘরে কাগজ নিয়ে ঢুকে বসে পড়ি টাইপ রাইটারের সামনে। আবিদ আর স্বামী এক-একবার এক একজন লেখা কাগজ দিয়ে যান আমার ঘরে। চলছেই। শেকলের মতো। একটায় পিছনে আর একটা। বিশ্রাম নেই। নেই বিরতি।

"একটিবার আগের পাতা দেখতে চাইলেন না। পারম্পর্য থাকলো কিনা, একবারও মনে উঠলো না সে কথা। লেখবার পর পড়া নেই। কোন শুদ্ধির প্রয়োজন নেই। একটা কমা বা সেমিকোলনও বদলাবার দরকার নেই।

"সেই গোটা ঘোষণা-পত্রখানা একটানা লিখে গেলেন। একটু ভাবলেন না। থামলেন না ক্ষণকালের জন্য একটুও। সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা-পত্র আর সাধারণ একখানা চিঠির মধ্যে যেন কোন পার্থক্যই নেই। ছুটোই এক। সহজ। সাবলীল।

"টাইপ করা হয়ে গেল। আমি ত্বার পড়ে দেখলাম। নিয়ে গেলাম নেতাজির কাছে। কাগজগুলো একপাশে রেখে দিয়ে আমাকে বসতে বললেন। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো এক টুকরো দুষ্টুমির হাসি। বললেন: 'কে কে মন্ত্রী হবেন, জানতে চাইছো না?'

'না সার।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম।

'তা বেশ কালই জানতে পারবে।'

"পরদিন। ২০শে অক্টোবর। সন্ধ্যায় আমার ডাক পড়লো। একটা চাপা উত্তেজনা থমথম করছিলো। অনেকে এসেছে। অনেকে আসছে। আবার যাচ্ছেও। খাবার ঘরেও অনেক লোক। আহার-পর্ব শেষ হতেই অতিথিরা বিদায় নিলেন। নেতাজি আমাকে নিয়ে গেলেন ওপরে। কাগজগুলো হাতে দিয়ে বলে দিলেন যে, বেশি করে যেন ছাপানো হয় এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘে যেন পৌছে দেয়া হয় সকাল বেলা।

"লেখা কাগজের ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ হয়ে গেছে কতকগুলো নামে। সেগুলো দেখিয়ে বললেন: 'দেখেছো? ঠিক হয়নি?'

"সব ঠিক আছে সার।

'হুঁ।'" (১)

নামগুলোর মধ্যে একটা নাম ছিল, এস, এ, আয়ার; মন্ত্রী, প্রচার বিভাগ।

সেই ঐতিহাসিক দিনটি সত্যিই এল। ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

নিঃশব্দে মহাকাল চলেছে এগিয়ে। চলেছে টিক টিক করে। রূপ নেই, কথা নেই, নেই কোন পরিচয়। অবিরাম চলার গতিবেগে ও আপনি বিভোর। ভ্রূক্ষেপহীন নাচের ছন্দে কদাচিৎ ধরা দেয় অধরা। হয়ে ওঠে মূর্ত। নব সৃষ্টির আনন্দ দোলায় হেসে ওঠে খল খল করে। বেরিয়ে আসে ঐক্যতানের নাদ। গড়ে ওঠে ইতিহাস।

(১) 'আন টু হিম এ উইটনেস'—এস, এ, আয়ার

"সেই ইতিহাসের অপরূপ আলেখ্য ফুটে উঠলো দাই-তোয়া-গেকিজোতে। (Dai-Toa-Gekijo)

"সকাল বেলা। সময় ১০টা ৩০ মিনিট।

"সাজানো হয়েছে চমৎকার করে মস্ত বড় মঞ্চ। ফুলে, পাতায়, ফেস্টুনে। পেছনে মাহাত্মা গান্ধীর বড় একখানা আলেখ্য। তাঁর মাথার ওপর বিরাট জাতীয় পতাকা।

"সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া যেন ভেঙ্গে পড়েছে সভাস্থলে। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নামে সভা ডাকা হয়েছে।" (১)

"আমি সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ কোটী দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য আমি জীবনান্ত পর্যন্ত মুক্তি-সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।"

"ধীর অচঞ্চল মধুর কণ্ঠ সহসা থেমে গেল। সারা মুখে রক্ত ভেঙ্গে পড়েছে। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে গণ্ড বেয়ে। নিজেকে সংবরণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল দুকুল। ভেঙ্গে পড়লেন নেতাজি।

"গুমরে ওঠে বুকের ভেতর। অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনিতে সভাস্থল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সম্মুখে প্রদীপ্ত ভাস্কর নেতাজি দাঁড়িয়ে আছেন। স্তব্ধ। নীরব। শ্বেত পাথরের বিগ্রহের মতো। ওষ্ঠ সজোরে চেপে ধরা। দুটি চক্ষু নিমীলিত। দেহ ঋজু ও কঠিন।

"কয়েকটা মুহূর্ত। ধীরে আবার উচ্চারিত হতে থাকলো বাণী। সামগান।" (২)

"চিরদিন আমার জীবন হইবে ভারতের সেবকের জীবন। ভারতবর্ষের আটত্রিশ কোটি নর-নারীর শুভ ও কল্যাণ কামনা হইবে আমার ব্রত, আমার জীবনের মহোত্তম ধর্ম।

(১) ভারতের বিদ্রোহী কন্যার রোজ নামচা—'জয়হিন্দ'
(২) ভারতের বিদ্রোহী কন্যার রোজ নামচা—'জয়হিন্দ'

"স্বাধীনতা অর্জনের পর আমার স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি আমার হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু দান করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।"

ভারতবর্ষের নবতম ইতিহাস। সহস্র বৎসরের জরাজীর্ণ ইতিহাস থমকে দাঁড়াল। শুরু হল নতুন লেখা ওর সাদা পাতায়।

যজ্ঞাগ্নির প্রদীপ্ত শিখার মতো এই পবিত্র শপথ বাণী যে অনুপম দু'খানি ওষ্ঠ ভেদ করে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল,—তপঃ-শুদ্ধ সনাতন ভারতবর্ষের তাই শাশ্বত বাণী। বেদ মন্ত্র।

একে একে হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ-এর মন্ত্রীরা এগিয়ে আসেন। শপথ গ্রহণ করেন ভগবান ও জন্মভূমির নামে। নতজানু হয়ে আনুগত্য জানান তাঁদের অধিনায়ক নেতাজির সম্মুখে।

তাঁদের সর্বাধিনায়ক। সিপাহ্‌সালার।

সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে দপ দপ করে জ্বলছিল।

এই অনুষ্ঠানে নেতাজি যে ভাষণ দেন, তাতেই উল্লেখ করেন যে, বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এবং এ-দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ জনিত নয়, পরন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে যেয়ে নির্মম ভাবে দেশের যাবতীয় খাদ্যবস্তু সামরিক শিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে ইংরেজ এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে।

নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকারের নামে এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে, এবং রেডিও মারফৎ ইংরেজের সাহায্য কামনা করেছিলেন। ইংরেজ শুধু রাজী হয় নি, তাই নয়, নেতাজিকে কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করেছিল।

পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীকে ইংরেজ হত্যা করেছিল এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। তবু নেতাজির প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ করে মানুষের জীবন রক্ষা করতে রাজী হয় নি।

নেতাজি এই সভায় আরও বলেছিলেন: "সামনে আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা। এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েও চলেছি। শুধু এতেই

আমরা সন্তুষ্ট নই ; সমরোত্তর পুনর্গঠন কাজেও আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত চলেছে। ইংরেজ ও তার বন্ধু আমেরিকা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশের যে-অবস্থা হবে, তা আমাদের অজানা নয়। এই অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়াবার জন্য আমাদের একটি নতুন পুনর্গঠন বিভাগ খুলতে হয়েছে। এই বিভাগের কর্মীদের দ্রুত শিক্ষণের কাজ এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি চলেছে এরা সামরিক বিভাগের সঙ্গে। স্বাধীনতা অর্জন আর স্বাধীনতা রক্ষণের কাজ আমাদের কাছে অভিন্ন। আমরা এ-কথা মনে রেখেছি এবং উভয় পথে যুগপৎ আমরা এগিয়েও চলেছি।"

ভবিষ্যৎ সফলতার এই নিশ্চিত ইঙ্গিত ও আশ্বাস নেতাজিকে চিরদিন চলার পথে যুগিয়েছে দুর্লভ শক্তি। অখণ্ড ও অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় শুধু বর্তমানকে নিয়ে কোনদিনই তাঁকে তৃপ্তি দেয়নি। তাতে তিনি সন্তুষ্টও থাকতে পারেননি। বর্তমান সাফল্য প্রাপ্তির কিম্বা প্রারব্ধ কর্ম সাঙ্গ হবার পূর্বেই আগামী দিনের নবতম দাবী ও কাজের পরিকল্পনা তাঁর মনে জাগত। দুর্যোগের নিরন্ধ্র অমানিশার অবসান-পূর্বেই, তাই, তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন অনাগত দিনের কথা, সমস্যা ও তার মীমাংসা। আর সেই দূরাগত কল্পনা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার বহু উর্ধ্বে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের নির্জন নিলয়ে। কঠিন ও রূঢ় বাস্তবিকতা তাঁকে আঘাত করেছে বার বার, কিন্তু কোনদিনই তিনি হার স্বীকার করেন নি। পরাজয় মানেন নি। নিজের মানস-মর্মে ও কর্মের বিপুল প্রকাশ-ভঙ্গীতে সেই অনবদ্য বস্তুতান্ত্রিক স্বপ্ন চিরদিন থাকল অম্লান ও অপরূপ হয়ে।

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী উদ্বোধন করলেন ২২শে অক্টোবর। ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন অধিনেত্রী নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্মী আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রীও ছিলেন।

২৩শে অক্টোবর নিপ্পন সরকার আজাদ হিন্দ সরকারকে বিধিমতে স্বীকার করে জানিয়ে দিলেন : "ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

পরিপূর্ণ করতে জাপান-সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাবে প্রসন্ন মনে।”

এর পরই স্বীকৃতি এল জার্মান, ইটালী, ক্রোটিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, জাতীয় চীন, ফিলিপাইন ও মানচুরিয়া সরকারের। একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। আন্তর্জাতিক বিধি ও বিধান, প্রীতি ও উপঢৌকন, সহযোগিতা ও পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং সর্বোপরি একটি বিধিসঙ্গত রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

২৫ অক্টোবর, ১৯৪৩। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার ও প্রকাশন বিভাগ লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে দিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিও ঘোষণা করে চলল বিশেষ একটি বার্তা: “আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভা তার দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রচার ও প্রকাশন বিভাগকে উহা প্রচার করিতে অনুরোধ জানাইতেছে: ‘আজ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার বৃটেন ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছে’।”

উন্মাদ কলরোলে অশান্ত জনতা ছুটে বেরিয়ে পড়ল সিঙ্গাপুরের পথে। জমা হল পেডাং-এ। মিউনিসিপ্যালিটির বিরাট অট্টালিকার সন্মুখে সেই উত্তাল জনসমুদ্র থেকে থেকে হুঙ্কার দিতে লাগল ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজি জিন্দাবাদ।

স্মরণাতীত কালের অপূর্ণ কামনা সহসা মূর্ত হয়ে উঠল। বিদেশী আক্রমন এসেছে সেই অন্ধকার যুগ থেকে। তারা জয় করেছে ভারতবর্ষের জনপদ। লুঠ করে নিয়ে গেছে ধনৈশ্বর্য। হত্যা করেছে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ। নারীর সতীত্ব ধরার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ভোগ্য সামগ্রীর মতো লুণ্ঠিত নারী নিয়ে গেছে নিজের দেশে অথবা ভারতবর্ষে বসে নিজের ইচ্ছামতো ভোগ করেছে নারীদেহ। প্রতিবাদ ওঠেনি। সারা ভারত ক্ষেপে ওঠেনি। নিখিল ভারতবর্ষের কোন গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে নামেনি। মরে নি। মারে নি।

এই প্রথম। স্বাধীন ভারতবর্ষের নামে এই প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা।

নেতাজি এসে ধীর পায়ে দাঁড়ালেন বেদীর ওপর। পরনে খাকি রং-এর সামরিক পরিচ্ছদ। হাঁটু ছোঁওয়া বুট পায়ে। মাথায় সৈনিকের টুপি।

বেজে উঠল সামরিক বিগ্‌ল্‌। মুহূর্তে অশান্ত জনতা স্থির হয়ে গেল।

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা-বাণী পাঠ করে শুধোলেন জনতার মতামত। নিমেষে গর্জে উঠল জনতার উল্লোল। কণ্ঠের হুঙ্কারে ওদের বাজের আওয়াজ; চলো দিল্লী। হাত তুলে এবং সমস্বরে ওরা সমর্থন জানাল।

আজাদ হিন্দ বাহিনী উঁচু করে তুলে ধরে হাতের রাইফেল,—মাথার কিরিচ ঝক ঝক করে উঠে।

দুর্জয় অঙ্গীকার ভেসে ওঠে সবার মুখে।

মৃত্যুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা গেয়ে ওঠে অমৃতের জয় গান: "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—"

মঞ্চের ওপর থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শিপাহ্‌সালার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে চলেছেন: "ঐ যে দূরের নদী-বন-পর্বত, ওরই ওপারে রয়েছে আমাদের চির প্রিয় মাতৃভূমি। ওরই কোলে আমরা জন্মেছি। ওরই কোলে এইবার আমরা ফিরে যাবো।

"শোনো শোনো, মা আমাদের ডাকছেন। ডাকছে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী। আর ডাকছে কোটি কোটি ভারতবাসী। রক্ত ডাকছে রক্তকে। সাড়া দাও। দেরি কোরো না। হাতে অস্ত্র নাও। তোমাদের সম্মুখে ঐ প্রসারিত পথ,—মুক্তির পথ,—নির্মান করে গেছেন আমাদের পূর্বগামীরা। ঐ পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাবো। শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবো। অথবা ভগবানের নির্দেশে আমরা সহিদের মৃত্যু বরণ করে নেবো।

"মায়ের কোলে অন্তিম ঘুমে ঢলে পড়বো আমরা মায়ের পায়ের

মাটি চুম্বন করে। যারা বেঁচে থাকবে তারা যেয়ে দখল করে নেবে দিল্লী।

"দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

* * *

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ বাংলোয় নেতাজি বসে। চার পাশে গুটি-কয়েক সাথী।

বার বার করে পড়তে থাকেন সেই মধুর বার্তা। তাঁর প্রিয় আয়র্লণ্ড পাঠিয়েছে। জীবনের তমিস্রায় যে-আয়ার্লণ্ড আলো দেখিয়েছিল। যৌবনে দেখিয়েছিল স্বপ্ন। সেই আয়র্লণ্ড। আইরীর সেই এমারেল্ড্ দ্বীপ। (Emerald Isle of Eire)

ধীর নীচু গলায় বলে চলেন কাছের মানুষদের কাছে: "কত স্মৃতিই-না জড়িয়ে আছে ঐ আয়র্লণ্ডের সঙ্গে। সহিদদের স্পর্শে যে-সব স্থান পবিত্র হয়েছে, সেখানে গেছি। দেখেছি। প্রণাম জানিয়েছি।"

একটু থামেন। পরক্ষণেই বলে ওঠেন: "আমরাও জিতবো। যেমন করে আয়র্লণ্ড স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনি করে আমরাও পাবো।" (১)

৮ই নভেম্বর। নেতাজি চড়ে বসেন বিমানে। যোগ দিতে হবে বৃহত্তর দক্ষিণ-পুর্ব-এসিয়ার সম্মেলনে। সম্মেলন বসবে টোকিওতে।

দক্ষিণ-পুর্ব-এসিয়ার প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। কিন্তু নেতাজি গেছেন শুধু দর্শক হিসেবে, প্রতিনিধি হিসেবে নয়। গেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন সবই,—কিন্তু কথা বলেন নি। আজাদ হিন্দ সরকার অস্থায়ী,—স্থায়ী সরকার গঠিত হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের নিয়ে। তারাই নির্ধারণ করবে তার রূপ, তার আদর্শ, তার রীতি ও নীতি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা খুব জোর দিয়ে বললেন বার্মার ডঃ বা ম্ব এবং জাপানের ডঃ ওকাবা।

(১) ভারতের বিদ্রোহী কন্যার রোজ নামচা—'জয় হিন্দ'

সাক্ষাৎ হল জেনারেল তোজোর সঙ্গে। তোজো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই সময়ে এবং সানন্দে নেতাজিকে একথা জানিয়েও দিলেন যে, জাপ সরকার প্রীতির নিদর্শন হিসাবে এ-দুটি দ্বীপ অস্থায়ী ভারত সরকারের হাতে তুলে দিলেন।

প্রেস কনফারেন্স্-এ নেতাজি বললেন: "এই সর্ব প্রথম ভারত সরকারের হাতে এলো বৃটিশ শাসন মুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ড। আর তা আন্দামান ও নিকোবর হওয়ায় সত্যিই ভারতবাসী আনন্দিত। সত্যি সত্যি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট জাতীয় সরকারের বাস্তব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো তার নিজ ভূমিতে।...

"ফরাসী বিপ্লবের প্রথম কাজ হয়েছিল ব্যাস্টীলের দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ দরজা খুলে দেয়া। বন্দীদের মুক্ত করা। এই আন্দামান দেশ-প্রেমিক সংগ্রামী বন্দীদের রক্তমাখা স্মৃতি বিজড়িত। ভারত মুক্তি-যুদ্ধের প্রথম প্রাপ্তি আন্দামানের স্বাধীনতা।"

আন্দামান। ভারতের অদ্বিতীয় তীর্থভূমি আন্দামান। মুক্তিকাম ভারত-আত্মা ঐ সাগর-মেখলা আন্দামানের প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে। স্বাধীনতার প্রথম পূজারী মৃত্যুঞ্জয়ী দেশভক্তদের রক্তের অবগাহনে আন্দামান পবিত্র।

নেতাজি আন্দামানে পৌঁছোলেন ৩০শে ডিসেম্বর।

সুনীল জলধি আঁজলভরা নীল জলে প্রতিনিয়ত ধুয়ে দেয় শ্যামলা মেয়েটির তন্বী দেহ বল্লরী। বনরাজী নীলাঞ্চল ঘেরা ওর অতুল অথৈ রূপের সমুদ্রে নেতাজি স্তব্ধ নেত্রে মুগ্ধ হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চেয়ে দেখেন দিগন্ত বিতত সাগর ছোঁয়া অস্পষ্ট দূরের ছায়া। কতদূরে তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমির মূল তট রেখা? তাঁর মা? ভারতবর্ষ?

অঝোর ধারায় ঝরে পড়ল অশ্রু মহাসাগরের বুকে।

আন্দামান থেকে ফিরে এসে নেতাজি আরও চঞ্চল আরও উদ্দাম হয়ে উঠলেন। গতি যেন বিদ্যুতের। বিরাম বিহীন তৎপরতায় সমাপ্ত করতে হবে অনন্ত অসমাপ্ত কাজ। হাতে মোটে গোনা কটা দিন।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত হতে জানল না। ছুটে চলল আপন মনে। কক্ষ হতে কক্ষান্তরে।

বিভাগের পর বিভাগ গড়ে উঠেছে। প্রশাসন, অর্থ, প্রচার, গুপ্তচর, সৈন্য সংগ্রহ, সামরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ, মহিলা-মহল, জাতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি, পুনর্গঠন, সরবরাহ, বৈদেশিক দপ্তর, আবাস ও পরিবহণ,—সব-শুধ্য উনিশটি বিভাগ।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের শাখা খোলবার এক বিপুল সাড়া জেগে উঠল। ঝড়ের বেগে সংগঠনের কাজে সবাই উঠল মেতে। প্রত্যিটি ভারতবাসীর কানে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তির এই দুর্বার ডাক। একটা সামগ্রিক অনুষ্ঠান চাই। চাই ঐকান্তিক আর অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

অবিশ্রাম সফর আর বক্তৃতা চলল নেতাজির। গেলেন মালয়, থাইল্যাণ্ড, বার্মার বিভিন্ন অঞ্চল, ফিলিপাইন ও ইণ্ডোনেশিয়ার সর্বত্র। সভায়, সম্মেলনে, ঘর-ঘরে, জনে-জনের কাছে চলল তাঁর কথা। এ-ছাড়া রেডিও।

২রা জুলাই থেকে ২১শে অক্টোবর। একশোটি দিন। এই সামান্য কয়েকটা দিনে এক বিরাট ও বিশাল ভূখণ্ড, জাপান থেকে ইণ্ডোনেশিয়া,—গোটা দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার ভারতবাসী মন্ত্র বলে জেগে উঠল। দু'হাতে চোখ রগড়ে ওরা আঁখির ঘুম তাড়িয়ে দিল।

ঘুম ভাঙ্গা একটা নতুন জাত। চোখে এদের নতুন স্বপ্নের ছোঁয়াচ। প্রাণে অকুতোভয় প্রেরণা। অন্তর ও দৃষ্টির বিস্ফারতায় ওরা নিজেরাই চমকে ওঠে।

॥ সাত ॥

আন্দামান থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে নেতাজি রেঙ্গুন পৌঁছোলেন নতুন বছরের প্রথমেই। (৭ই জানুঃ ১৯৪৪) আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ, গভর্ণমেণ্ট এবং ফৌজের দ্বিতীয় হেডকোয়ার্টার খোলা হল রেঙ্গুনে। বার্মার সীমান্ত ভারতের গায়ে গায়ে। প্রায় অঙ্গাঙ্গী। রেঙ্গুন থেকে ভারত-সীমান্তের দূরত্বও খুব বেশি নয়। এখান থেকে সৈন্য পরিচালনা, রসদ ও অন্যান্য বিষয়ের পরিবহণ এবং সামরিক অবস্থানের পর্যবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ। অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজের সামরিক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালানো সিঙ্গাপুর অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধাজনকও।

রেঙ্গুনে দ্বিতীয় ঘাঁটি মনোনয়ন করবার আরও একটি কারণ ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্য সম্মিলিত ভাবে ভারত-যুদ্ধে যোগদান করবে, এ-সিদ্ধান্ত পূর্বাপর স্থির থাকা সত্ত্বেও ইম্ফলের যুদ্ধে আজাদী সৈন্য যাতে যোগ না দেয়, এমনি একটা অভিপ্রায় জাপানী সামরিক বিভাগের কেউ কেউ প্রকাশ করে ফেলেছিল। নেতাজি এ-কথা জানতে পেরে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই রেঙ্গুনে ঘাঁটি নিলেন এবং আরাকান ও ইম্ফলের যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলেন দ্রুততর গতিতে।

রাজুর চিন্তার আর অবিধ নেই। ঘোরেন, ফেরেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেনও,—কিন্তু না পান কূল, না পান কিনারা। এই মানুষকে সামলানো তাঁর কাজ নয়। অথচ এই খেয়ালী, কর্মচঞ্চল ও বেহিসেবী মানুষটির ভালোমন্দের দায়ীত্ব নাকি তাঁরই ওপর ন্যস্ত। রাজু,—কর্ণেল রাজু, নেতাজির নিজস্ব ডাক্তার।

না করেছ, না মরেছ। ঝোঁক চেপে যায় সর্বাগ্রে আর বেশি করে সেইটেই করবার। পই পই করে' রাজু না করেই চলেছেন

আর সে না ভাঙ্গবার বা কানে না তোলবারও বিরাম নেই। ভেঙ্গেই চলেছেন একটার পর আর একটা।

মানুষ এত সুপোরি খেতে পারে? মুঠো মুঠো। এ যেন চানাচুর বা এলাচদানা। খেয়েই চলেছেন। তাও খালি সুপোরি নয়,—বেশ মুখরোচক করে ওটাকে তৈরী করাতে হবে। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি মিশিয়ে একটু অল্প আঁচে ভেজে নিতে হবে। তারপর সিগারেটের টিনে বন্দী করে রেখে দাও টেবলের পাশে। তারপর থেকে চলবে অবিরাম খাওয়া।

বাইরে বেরোবার সময় ফাইলের সঙ্গে ওটাও চলবে সাথে সাথেই। অন্য কথা ভুল হলেও ওটার কথা ভুল হয় কদাচিৎ। (আড়ালে-আবডালে কেউ কেউ কটকে জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে এই সুপোরি-প্রিয়তার সম্বন্ধ নিয়ে চোখ টেপাটেপি করতে ছাড়ত না।)

রাজু বলেন: "সার অত সিগারেট—"; আর বেশি এগুতে পারেন না রাজু। কিন্তু ওতেই তো বোঝা উচিৎ। বুঝবেই বা কে, কেই-বা ও-কথা কানে তুলছে? খেয়েই চলেছেন সিগারেট। একটার পর আর একটা।

রাজু নিষেধ করেছিলেন বেশি ব্যাডমিনটন খেলতে। সেই একই ফল। যদিই-বা গোটা ছয় দানে আগে খেলা শেষ হত, নিষেধ করবার পর সেটা যেয়ে দাঁড়াল আট কিম্বা নয়।

সময় সময় রাজু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। নিজের মনেই ঠোঁট কামড়ান আর কাছে কাছেই ঘুর ঘুর করেন। না পারেন বলতে, না পারেন সইতে। চুপ করে থাকলেই সব ঝামেলা হয়তো মিটে যায়। কিন্তু তা' পারেন কৈ? নেতাজি যে।

বেশ আরাম করে আর গভীর আয়েসে দিনের প্রথম সিগারেটটি ধরাবেন সকাল ৮টার পর। তারপর থেকেই চলবে একটার পিছু পিছু আর একটা। যাকে বলে 'চেন'। সারাদিন কম করেও ত্রিশ থেকে চল্লিশ। সেটা আবার নির্ভর করত দিনের বৈচিত্র্য বা গুরুত্বের ওপর।

জাপানী বা অন্য কোন বৈদেশিকদের সঙ্গে কথার বেলায়, কোন অসাধারণ বিষয়ের আলোচনাকালে, মাত্রা একটু বেড়ে যেত। শেষ সিগারেটটি জ্বলে উঠত সচরাচর রাত একটায়। তারপর আর একটাও না। কিন্তু কাজের চাপে প্রায়শই রাত কাবার হয়ে যেত। সিগারেটও পুড়তে থাকত রাত ভোরই।

সিগারেট খাবারও আবার বিশেষ ধরন ছিল। এমনিতে বেশ ধীরে ধীরে। আয়েসে আয়েসে। কিন্তু সময় বিশেষে হয়তো একা বসে আপন মনে তন্ময় হয়ে গেছেন কোন বিশেষ চিন্তায়, অথবা একরাশ চিন্তা মগজে হুড় হুল্লোর বাধিয়ে বসেছে,—দুটোই বোঝা যায় মুখখানা দেখলেই,—অচঞ্চল দৃষ্টি আর ঐ থমথমে মুখ,—সব জানিয়ে দেয়; আর জানিয়ে দেয় সিগারেটের টান। এই অবস্থার টান হবে জোর আর ঘন ঘন। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ফুরনো চাই। ধরানো চাই আর একটা নতুন। শেষ টুকরোটিও বৃথা নষ্ট করা চলবে না। কেমন কায়দা করে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীতে চেপে শেষ পর্যন্ত একটা টান। হাতে অবশিষ্ট পড়ে রইল সাদা একরত্তি কাগজ।

যাকে বলে প্রাতরুত্থান, ধাতে ওটা কোনদিনই ছিল না। শয্যা ছেড়ে উঠতেন বেশ একটু বেলা করে। ঘুম ভাঙ্গত আগেই। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েই গীতাখানা সর্বাগ্রে খুলে ধরতেন চোখের সামনে। তারপর হাতে উঠত মালা। চলত খানিকক্ষণ জপ। তারপর ওঠা। ছটার পূর্বে কদাপিও নয়,—আবার সাতটাও পেরোয় নি কোনদিন। বাথরুম স্নান সেরে প্রাতরাশ খাওয়া হত আটটায়। বসবার পৃথক ঘর ছিল না, আফিসের কাজ আর শোওয়া হত একই ঘরে।

গোটা তিনেক আধ সেদ্ধ ডিম আর পেয়ালা তিনেক চা,—নেতাজির প্রাতরাশ। তারপরও চা চলত। চলত অবিরাম। যখন তখন। কাছে যারা থাকত, তাদেরও খেতে হত। না খেয়ে উপায় ছিল না।

য়া করেতন, তাই তো হওয়া চাই নিখুঁত। মাঝে মাঝে মকরধ্বজ

খেতেন। খলে গুঁড়ো ঢেলে সন্তর্পণে দিতেন শিশি থেকে ফোটা কয়েক মধু। ঘুঁটতে থাকতেন তন্ময় হয়ে। ' যেন এ-কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজই নেই। তারপর ঘুঁটনিটা বেশ করে চুষে নিতেন। তাও কয়েকবার। একটুও যেন না থাকে লেগে। তারপর মধ্যমা দিয়ে একটু একটু করে চেটে চেটে খাওয়া। সে দেখবার মতো। শেষ কাবারে একটু দুধ মিশিয়ে বেশ করে আঙ্গুল খলে ঘষে সেটুকু মুখে ঢেলে দেয়া।

দু'চক্ষের বিষ ছিল অগোছালোপণা। যাকে বলে বিশৃঙ্খলা। সে টেবল গোছানোই হোক, আর কুচকাওয়াজই হোক। সবই হতে হবে পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি। সর্বাঙ্গসুন্দর।

প্রাতরাশের পরই সোজা মোটরে বেরিয়ে পড়বেন। প্রথমেই যাবেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘে। সেখানে বেলা এগারটা পর্যন্ত। তারপর সৈন্যাধ্যক্ষের হেডকোয়ার্টার। কাটে ঘণ্টা খানেক। সর্বত্রই চা-এর সরঞ্জাম থাকে একেবারে তৈরী। চলতে থাকে দু'কাপ। কখনও চার কাপ। বেলা গড়াতে থাকে। ঘোরাঘুরির অন্ত নেই। সব বিভাগে রোজ যাওয়া সম্ভব নয়। এক এক জায়গায় এক একদিন। ভুল হয়ে যায় খাবার কথা। রাওয়াৎ ও সমশের সিং (নেতাজির দুই এ, ডি, সি) এবং কর্ণেল রাজু এদিক ওদিক চান। তারপর চুপিসারে গোগ্রাসে গিলে নেন কয়েক খাবা ভাত আর তরকারী। এত চা,—ওঁদের গা গুলিয়ে ওঠে।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো। খেতে বসে সবাই। নেতাজির নিজস্ব কর্মচারীরা আর বাড়তি অতিথিরা, সবাই বসে পড়ে খেতে, একসঙ্গে। একই টেবল-এ। অনাড়ম্বর খাদ্য। ভাত, পাতলা ডাল, একটু দই, আর একটা কলা। শেষটায় বেশ মৌজ করে ধীরে ধীরে খাওয়া হবে এক বাটি কফি। চলবে অনেকক্ষণ ধরে, তার সঙ্গে গল্প বা কোন আলোচনা।

টেবল বয় কালী। কুচকুচে গায়ের রং, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা,

সামনের দাঁত দুটি সর্বক্ষণ বেরিয়েই থাকে। একটা আবার সোনা বাঁধা। কালীর মুখখানায় শিশুর সরলতা উপচে পড়ে। নেতাজি সিঙ্গাপুরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কালী হাজির হয়েছিল নেতাজির সামনে। সেই থেকে নড়েনি। সঙ্গে এসেছে রেঙ্গুনে। এসেছে নতুন বৌকে মা-বাবার কাছে ফেলে। নেতাজির অফুরন্ত উজাড় করা স্নেহে ধন্য হয়ে গেছে কালী। কালীর জীবনে আর কিছু কাম্য নেই। শুধু চায় কালী প্রাণভরে নেতাজিকে সেবা করতে। অভুক্ত হয়ে কালী বসে থাকে নেতাজির প্রতীক্ষায়। নেতাজির খাওয়া হলে ভাতের থালা টেনে নিয়ে খেতে বসে।

একটা বড় বাটিতে কলা নিয়ে কালী সবাইকে পরিবেশন করে। কলা হাতে কালীকে দেখে সবাই নড়ে চড়ে বসে। খুক্ খুক্ কাশিতে ভরে ওঠে ঘর খানা।

সঙ্গে সঙ্গে নেতাজির কথা: "কালী, আজ ব্যানানাকা কিতনা দিয়া ?"

পরদিন: "কালী, আজ ব্যানানা কৈসা মিলা ?"

তার পরদিন: "কালী, আজ ব্যানানা কা কেয়া ভাউ হ্যায় ?"

কেনা-কাটা করে মেস হবিলদার। কালী ভাউ-এর কী জানবে ? চুপ করে কালী শুধু হাসে। সরল হাসিতে ভরে যায় কালীর কালো কুচকুচে মুখখানা।

কালীকে নিয়ে এ-খেলা নেতাজির নিত্যদিনের।

বড়ছোট বিচার নেই। নেই কোন পার্থক্য। সবাই সমান। সামান্য নীচের তলা থেকে অনেক বড় আর উচ্চ পদের যে-কেউ আসবে, সেই বসবে সেই একই টেবল-এ। খাবার সময় কোনও ভার-ভারিক্কি কথা নয়। কথা হয় হালকা, রসাল, মিষ্টি।

মাঝে মাঝে রান্না নিয়ে কথা ওঠে। নানা প্রদেশের নানা ব্যঞ্জনের রূপ, রস, গুণ-গ্রামের ব্যাখ্যা চলে। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে নেতাজির সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তা'ছাড়া, নিজেও

রান্না সম্বন্ধে-যে একজন সমজদার বিশেষজ্ঞ, এ-ধারণা ছিল তাঁর প্রবল। সরস করে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতেন সালঙ্কারে। হেসে সবাই গড়িয়ে পড়ত।

রাত্রে একদিন খেতে বসেছেন ইয়ালাপ্পা। মুক্তি-যুদ্ধের একজন অসাধারণ কর্মবীর এই মানুষটি। আজাদ হিন্দ সরকারের জনৈক উপদেষ্টা। দই পাতে পড়তেই ইয়ালাপ্পা বলে উঠলেন: "মোষের দুধের দই রোজ খেতে নেই। ওতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।"

"আজ্ঞে, এটা কি মশাই-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা?" ছিটকে বেরিয়ে আসে নেতাজির জবাব। হাসির বন্যা বয়ে যায়।

আর একদিনের কথা। আনন্দ সহায় (আজাদ হিন্দ সরকারের সেক্রেটারী) এসেছেন খেতে। খেতে খেতেই বললেন সহায় যে, সাংহাই-এর জনৈক সঙ্ঘ-অফিসারের বিরুদ্ধে খুবই গুরুতর অভিযোগ এসেছে। একজনকে তাড়াতাড়ি না পাঠালেই নয়। সহায় নিজেই যেতে চান। যদি না-ই পারেন, আর কার ওপর তদন্তের ভার দেয়া যায়? জিজ্ঞেস করেন সহায়।

নেতাজি নাম করলেন রামমূর্তির। টোকিও সঙ্ঘের সভাপতি।

সহায় একটু আমতা আমতা করে বলে বসলেন: "উহ্ সিধা-সাধা আদমি হ্যায় সাহাব!"

"ও-ও! টিধা (দুষ্টু) আদমি চাহিয়ে, ক্যা?" নেতাজির তড়িৎ উত্তর।

আবার হাসির দমকা হাওয়ায় ভরে যায় ঘর।

"এই ছিল আমাদের নেতাজির প্রকৃত রূপ।" লিখছেন আয়ার। এত বড় কিন্তু ধোয়া কাপড়ের মতো সাদা। শিশির সিক্ত ভোরের আকাশের মতোই নির্মল।

দৃষ্টি থাকত সকলের দিকেই। ওরই মধ্যে সেই অনবদ্য আঁখি দুটি যদি কখনও বিশেষ করে কারও ওপর ক্ষণকালের জন্যও ন্যস্ত হত,—ভরে উঠত তার প্রাণ আকণ্ঠ। সব চাওয়া তার নিঃশেষে মরে যেত তৃপ্তিতে।

রণাঙ্গনের বিগ্‌ল্ বেজে উঠল।

আক্রমণ শুরু হবে কোথায়, এ-কথা কেউ জানল না। জানতে চাইলও না। শুধু সবাই শুনল যে, শত্রুর ওপর আক্রমন চালাবার সময় এবং নির্দেশ এসে গেছে।

কোন্ অজানা বিস্মৃতির গর্ভে জমা হয়ে ছিল এই দুর্বার রণোন্মাদনা?

উদ্দাম হয়ে উঠল এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। ভুলে গেল সবাই গৃহের কথা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা,—কেউ তাকাল না কারও দিকে। সবাই-এর মুখে শুধু একটি কথা: চলো দিল্লী।

নেতাজির বিশ্রাম নেই তিলার্ধ। সব দেখে চলেছেন নিজের চোখে। রসদ, এ্যাম্বুলেন্স্, শয্যা, ওষুধ-পত্র, আর প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ স্তূপ হয়ে ওঠে। দলে দলে সৈনিকেরা আসে মার্চ্চ করে। মাঠে মাঠে কুচকাওয়াজ চলেছে অবিরাম। ওরই সাথে সমবেত সঙ্গীত: কদম কদম বাঢ়ায়ে যা…

স্মরণাতীত কালের অন্ধকার দিনগুলি অকস্মাৎ মুছে যায় স্মৃতি থেকে। পরাধীন ভারতবর্ষ। বিজিত ভারতবর্ষ। সংগ্রামহীন এক নিস্তব্ধ শত বর্ষ জেগে ওঠে দুর্জয় পণে।

ফৌজের দল দলে-দলে আসে রেঙ্গুনে। আসে নানা শিক্ষাকেন্দ্র থেকে। নানা প্রদেশ থেকে। বিভিন্ন দেশ থেকে। ফৌজের সঙ্গে অর্থ, নানা ধরণের সরঞ্জাম।

এই দিনটির জন্য একজন নিঃসম্বল মানুষ একদিন ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর ছেড়ে। বাস্তবিকতার প্রশ্ন মনে জাগেনি। মনে ওঠেনি কোন লাভালাভের হিসেব নিকেশ। সাথী ছিল মাত্র একটি দুর্জয় সঙ্কল্প।

সেইদিন সমাগত। সুভাষ বোস সংগ্রামে হেরেছেন কি জিতেছেন, —এহ বাহ্য। সুভাষ বোস যুদ্ধ করেছেন। শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যুদ্ধের ফলাফলের কথা ভাবেননি। বড় কথা, উচ্চাঙ্গের ভাব ও আদর্শের আড়ালে নিজের ক্লৈব্য ও দৌর্বল্য ঢেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার ফন্দী আঁটেন নি।

হায় ভারতবর্ষের গীতা! কত হাজার বছর ধরেই-না ভারতবাসী গীতা পড়ল। প্রাণপণে মুখস্থ করল, 'মা ফলেষু কদাচন'; 'হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং'। কোথায় গেল গীতার শ্লোক আর মর্ম? অনড় আর অচল হয়ে গীতা হাতে করে সবাই স্থবির হল। তারপর মরল।

জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষা যদি রূপ পায়? একটি সঙ্কল্প যদি সার্থক হয়ে ওঠে? জীবন ভরে উঠবে না কানায় কানায়? উঠল তাই। একক সুভাষ জাগিয়ে দিলেন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া। জাগিয়ে দিলেন ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী। একটি জ্বলে ওঠা প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল লক্ষ মশাল।

পুরো একটি বছরও নয়। সহস্র বাধা আর বিপত্তি এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। অর্থ নেই। লোকবলই-বা কোথায়? এই মুষ্টিময় সৈন্য নিয়ে মিত্রপক্ষের বিরাট সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। লড়াই করতে হবে। মরতে হবে।

তারপরও কি কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে? কিন্তু চাইবে কেন?

হয়তো আজও সেদিন আসেনি। কিন্তু আসবে। দুর্দিনের অন্ধকার যেদিন গাঢ় হয়ে উঠবে, দিগন্তের সব আলো নিভে যাবে, চোখের সম্মুখে ঘনিয়ে আসবে শুধু হতাসার নিরন্ধ্র কালো, সেইদিন মানুষ স্মরণ করতে চাইবে এই মানুষটিকে।

স্বপ্ন ছিল। ছিল কামনাও। দেশ স্বাধীন করতে হবে। শত্রু ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। মুমুক্ষু স্বাপ্নিক সুযোগ পেল না। পথ জানল না। উন্মাদ বিক্ষোভে পাষাণের গায়ে মাথা ঠুকে মরে গেল। এলোপাথারি মারতে গেল শত্রুকে। মারলও। কিন্তু মারল যাদের, তাদের চাইতে নিজেরা মরল বেশি।

সেই অকাল লক্ষ্যহীন বলির বেদনা যে ব্যক্তিটিকে আশ্রয় করে দাঁড় করিয়ে দিল এক সীমাহীন দুর্যোগের তমিশ্র বুকে, সে অনন্ত। সে ইতিহাস আশ্রয়ী নয়। ইতিহাস স্রষ্টা।

নেতাজি অশান্ত কণ্ঠে বলে চলেন: "পরাধীন ভারতবর্ষকে

স্বাধীন করবে কে ? কারা ? ভারতবাসী। ভারতবর্ষের পুত্র আর কন্যারা। তারাই দেবে প্রয়োজনীয় অর্থ, সামর্থ্য আর হৃৎপিণ্ডের রক্ত।

"আমি জাপানীদের কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইতে যাবো না।······স্বাধীনতা কোনদিন কোন দেশে সহজে আসেনি। যে স্বাধীনতা আসে সহজে, তা যায়ও সহজেই। যে স্বাধীনতা অন্যে কৃপা করে দেয়, কেড়েও নিতে জানে সে অবহেলায়।···

"লক্ষ্য এক,—এবং একটিই। মাঝপথে ওর স্থান নেই। সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠো স্বাধীনতার জন্য।

"হার কষে অর্থ দিয়ো না। যারা প্রাণ দিতে আজ এগিয়ে এসেছে, হার কষে তারা প্রাণ দেবে না। দেবে সবটা। তোমরাও তাই দাও। যার প্রাণ আছে দেবার মতো, সে প্রাণ দিক; যার অর্থ আছে, সে অর্থ দিক। সব দাও। নিজের সব-কিছু উৎসর্গ করো স্বাধীনতার বেদীমূলে। রিক্ত হয়ে যাও। বনো সব্ ফকির।

"তোমরা দাও ঢেলে তোমাদের রক্ত আমাকে, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো। এগিয়ে চলো। পেছনে ফিরে তাকিয়ো না। আমি তোমাদের দিল্লী নিয়ে যাবো।

"আমি শান্তি চাইনে, চাইনে বিশ্রাম। তোমরাও চেয়ো না। তারপর চলো জাতীয় পতাকা ওড়াতে ঐ ইংরেজের লাট-প্রাসাদে। আজাদী ফৌজ লালকিল্লার ভেতর-অঙ্গনে বিজয়োৎসব সমাপণ করবে।"

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কথা আর কে বলেছে ? কেউ কি বলেছে ?

সত্যিসত্যি পাগলই হয়ে উঠল সবাই। আর রিক্ত। ফকির।

ছেদহীন পরিক্রমা চলে নেতাজিকে ঘিরে। জনতার ঢেউ আসছে। আসছে প্লাবন। আসছে ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, কোলালামপুর, পেনাং, রেঙ্গুন, ব্যাটাভিয়া, সাইগন, সাংহাই, হংকং আর টোকিও থেকে। ক্রোড়পতি, খুদে দোকানদার, ডাক্তার, উকিল, কেরানী, গোয়ালা, ধোবা, কুলী, নাপিত, স্কুলের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক, ধনী-গৃহিণী, ঝী, মজুর ও তার

বৌ.—কেউ পেছনে পড়ে থাকল না। এগিয়ে এল সবাই। নেতাজির কোঁচড় ভরে দিল টাকায়, সোনায়, মণিমানিক্যে।

রেঙ্গুনের হবিব দিলেন এক কোটি টাকা। নেতাজির গলার ফুলের মালা বিক্রী করে উঠল সাত লক্ষ টাকা। কিনল একটি পাঞ্জাবী যুবক। নেতাজির অর্থভাণ্ডারে জমা হল পঁচিশ কোটি টাকা।

কিন্তু গোল বাধাল কাইকান। সেদিনের জাপানী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এই কাইকানের।

বস্তুত যেদিন জাপান সামরিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প-বিপ্লবের উৎকর্ষতায় এসিয়া তো বটেই, ইওরোপ ও আমেরিকাকেও তাক লাগিয়ে দিল, জাপানের এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি সেদিন মরিয়া হয়ে উঠেছিল নিজেদের হৃত প্রাধান্য ফিরে পেতে।

স্মরণাতীত কাল থেকে জাপানের 'সামুরাই' শ্রেণী তাদের আভিজাত্যের জন্য শুধু গর্বই বোধ করেনি, পরন্তু এই সমর প্রিয় শ্রেণী অস্ত্রের বলে পৃথিবী শাসনের স্বপ্নও দেখেছে। পরবর্তীকালে তাদের বিশেষ শ্রেণীগত সুযোগ, সুবিধা ও পদমর্যাদা খর্ব হলেও তাদের রক্তের অহঙ্কার নিঃশেষ হয়নি। এদের অনেকে ছিল এই কাইকানের ভাগ্য বিধাতা।

প্রতিবেশী চীনের ওপর এরাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের হিংস্রতা নিয়ে। এবং মাঞ্চুরিয়াকে একটি দাস-শিবিরে পরিণত করেছিল। এসিয়ার যাবতীয় দেশ ও জাতির মধ্যে জাপান শ্রেষ্ঠতম, এই মনোভাব এবং এদের বীরত্ব, বিদ্যা, সংস্কৃতি এবং আর্থিক সঙ্গতি এদের প্রাণে এই লালসারই ইন্ধন যুগিয়েছে যে, এসিয়ার জাগরণ যদি কোনদিন সম্ভাবপর হয়-ই, তা হবে জাপানের সহায়তায়। এবং জাপানকে তাদের, তাই, বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দিতেও হবে।

উদার ও বাস্তবপন্থী জাপানীও অনেক ছিল সন্দেহ নেই। ছিল।

এবং সেদিনের জাপান এদের নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবস্থা। জেনারেল তোজো ও বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মামোরু সিগেমিৎসু ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর।

কিন্তু চীনের অধিকৃত অঞ্চল, এবং নবলব্ধ বিজিত ভূখণ্ডের শাসনকার্য এবং চলতি যুদ্ধ-ব্যবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালিত হত কাইকানের প্রভাবে। অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতোই শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের অপেক্ষা অধঃস্তন এই কাইকানভুক্ত আমলাদের প্রাধান্য ছিল সর্বক্ষেত্রেই বেশি, তৎপর ও কার্যকরী।

সামুরাইদের পূর্ব প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল, এ-কথা সত্য এবং বংশগত প্রাধান্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু এ-সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় কার্যের পারদর্শিতা ও কুশলতা ছিল এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এরই ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় এরা সংখ্যায় ও মর্যাদায় স্থান পেয়েছে অত্যধিক।

এই কাইকানই শেষ পর্যন্ত নেতাজির পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়াল।

নেতাজি যেদিন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন আগামী সংগ্রামের জন্য, এই কাইকান-গোষ্ঠী সেদিন নেতাজির কর্ম-পন্থা এবং মানসভঙ্গী অনুমোদন করতে পারেনি। এবং তাদের অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমোদনে ঊর্ধ্বতন রাষ্ট্রপ্রধানদের সহানুভূতি ও প্রাজ্ঞ স্বীকৃতি নেতাজির যাত্রা-পথ আপাতত সহজ ও প্রসস্ত করে দিলেও সেদিনকার এই উপেক্ষা কাইকান বিস্মৃত হতে পারেনি।

কারণ আরও ছিল। নেতাজির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, নেতাজির মহিমান্বিত আকৃতি ও আভিজাতিক আচরণের প্রতি এরা ছিল পূর্ণ-মাত্রায় সচেতন। তাঁর পাশে ব্যক্তি হিসাবে নিজেদের সর্ববিষয়ে এরা মনে করত খর্ব ও নিম্নতর। কিন্তু কার্যত তারা ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশের রাজ প্রতিনিধি এবং নেতাজি ছিলেন ইংরেজ পদানত ভারতবর্ষের একজন বিদ্রোহী মাত্র। ব্যবধানের এই তারতম্য তাদের

আচরণ ও মন বিরোধী করে না তুললেও খানিকটা অসূয়া পরবশ করে তুলেছিল।

এবং এরই ফলে রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে এরা বাদ সেধে বসল।

আজাদ হিন্দ সরকার সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার ভারতবাসী ও ভারতীয় স্বার্থের হবে সংরক্ষক, নেতাজির এই ঘোষণা ও দাবী ওরা প্রসন্নমনে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু সক্রিয় কোন বাধা দেবার ওদের উপায় ছিল না। প্রথমত, জাপান-রাষ্ট্র-প্রধানেরা এ-ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন ; দ্বিতীয়ত যুদ্ধকালীন গুরুতর পরিস্থিতি। টোকিও থেকে শুরু করে সুদূর সুমাত্রা-জাভায় ছিল আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখা। এই সব কেন্দ্র থেকে আসত নিয়মিত অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক।

দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার অন্যান্য আজ্ঞাবহ সরকারের মতো নেতাজি যদি নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জাপানের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভরশীল হতেন, হয়তো কোন প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু নেতাজির প্রকৃতি ও অভিপ্রায় প্রথম প্রথম ওরা আদৌ বুঝতে পরেনি। যখন বুঝল, তখন নেতাজির সঙ্গে পাল্লা দেবার ওদের কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু গোপন পথে যে অপরিসর অথচ অব্যর্থ রন্ধ্র ছিল, তাই তারা রুদ্ধ করে নেতাজিকে বর্তমানে ব্যতিব্যস্ত এবং পরিণামে ব্যর্থ করবার জন্য দায়ী হয়েছিল সব চাইতে বেশি।

ওরা বাধা দিয়েছিল গোড়াতেই। অর্থ ও লোকবল ইচ্ছামতো সংগ্রহ করতে গেলে জাপানের সর্বাত্মক সামরিক চাহিদা ও সরবরাহে বিলক্ষণ জটিলতা দেখা দিতে পারে, এ-কথা নেতাজিকে জানিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, পরন্তু ১৯৪৪-এ নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তার বেলাতেও ওরা বিলক্ষণ বিরোধিতা করতে ভোলেনি। অবশ্য ওদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেই নেতাজিকে বরাবর চলতে হয়েছে এবং যথারীতি ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা, ফৌজের পোষাক-পরিচ্ছদ, তাদের নিয়মানুবর্তিতা, তাদের অতুলনীয় দেশ-প্রেম ও চারিত্রিক নির্মলতা,—এই সবের প্রতিটি বিষয়ই ছিল কাইকান ও অন্যান্য তাঁবেদার সরকারের ঈর্ষার বস্তু। বিশেষ করে আর্থিক স্বচ্ছলতা। সময় সময় ডঃ বা ম্ব নেতাজির দ্বারস্থ হয়েছেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। নেতাজি প্রসন্ন মনে সে-সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। এর দ্বারা বা ম্ব উপকৃত হয়েছেন সত্য, কিন্তু চিরন্তন অসূয়ার হাত থেকে তিনি নিস্তার পান নি।

নেতাজির সঙ্গে কাইকান প্রতিনিধিদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। এক নাগারে এক-একদিন ছ-সাত ঘণ্টাও কেটেছে আলোচনায়। আরাকান ফ্রণ্টে যুদ্ধ শুরু করবার পূর্ব-পর্যন্ত যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল নেতাজির সম্মুখে, এবং তার জন্য তাঁকে যে মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিল, তারও বুঝি তুলনা ছিল না।

হয়তো আরও কিছুদিন নেতাজি অপেক্ষা করতে পারতেন। তাঁর প্রস্তুতি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা-যে যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নয়, এ-কথাও নেতাজির অজানা ছিল না। বিশেষ করে একটি বিভাগ ছিল কার্যত একেবারেই অসম্পূর্ণ। পঞ্চম বাহিনীর গঠন তখন মনে থাকলেও কার্যত রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করবার সময় নেতাজি আর পেলেন না।

বিপর্যস্ত ইওরোপ-রণাঙ্গনের আসন্ন পরাজয়-রূপ নেতাজির চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। ইটালীর নবগঠিত সরকার সিসিলী থেকে মিত্রপক্ষকে তখন পর্যন্ত শুধু নৈতিক সমর্থনই জানাতে পেরেছে। মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশ তখনও ছিল জার্মান সৈন্যের দখলে। কিন্তু তা আর বেশি দিন রইল না। ইটালী ছেড়ে আসতে জার্মেনী বাধ্য হল। অন্য দিকে নরম্যাণ্ডির উপকূলে মিত্রপক্ষের অবতরণ আর কল্পনা নয়।

চাকা ঘুরে গেছে। জার্মেনীর বুকের ওপর মিত্রপক্ষের বিমান ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। সহর, গ্রাম, বড় বড় বাঁধ, ফ্যাক্টরী, সরবরাহের পথ

তছনছ করে দেয়। জার্মান বিমান বাধা দিতে পারে না। এক এক রাত্রে উড়ে আসে হাজার বিমান। বুকে করে আনে হাজার হাজার পাউণ্ডের এক-একটি অতিকায় বোমা।

রাশিয়ার মুক্তি-ফৌজ পেছনে তাড়া করে নিয়ে চলেছে হিটলার-বাহিনীকে। ছিন্ন ভিন্ন রুধিরাক্ত জার্মেনী শুধু চলেছে দিন গুনে।

। আট ।

পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজিই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা, নিটোল আদর্শ ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের।

নিছক বর্তমানেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। ইংরেজের পরাজয় এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিজয়-স্বপ্ন তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। কিন্তু তারও উর্ধ্বে, তারও ওপরে ছিল তাঁর সুগভীর পরিকল্পনার পরিধি। আর সেই কল্পনা ছিল অনাগত বিপ্লবের এক অপরূপ প্রত্যাশায় অনুরঞ্জিত।

তাই নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার কিম্বা ফৌজ গঠন করেই ক্ষান্ত হননি, পরন্তু স্বাধীন ভারতের রূপায়ণের পরিকল্পনাও ছিল তাঁর চিন্তার নিরন্তর ও অভিন্ন সাথী।

ভারতবর্ষে থাকা কালে প্ল্যানিং কমিটি কিম্বা অশোক চক্রের প্রবর্তন তিনি করেছিলেন, কংগ্রেসের জাতায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কথাও তাঁর মনেই সর্বপ্রথম জাগে, এ-কথাও মিথ্যা নয়, কিন্তু তাঁর চাওয়া আর স্বপ্ন ওখানেই নিঃশেষিত হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর রূপায়ণে যে দক্ষ শিল্পীরা দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তাদের গড়ে তোলবার কথাও তাঁর মনে জেগেছিল, বার্লিনে এবং রেঙ্গুন থাকা কালে। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পুনর্গঠন বিভাগ। ইংরেজের প্রভাবমুক্ত একদল বিশেষজ্ঞ গড়ে উঠবে, যারা স্বাধীন ভারতের নব সৃষ্টির জন্য বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। সে ভারতে থাকবে না শ্রেণী বিদ্বেষ, জাতিভেদ, নর-নারীর অসাম্য সামাজিক প্রশ্ন। থাকবে না শোষণ, মুনাফালোভীদের অত্যাচার। থাকবে শুধু দেশ ও জাতির প্রতি অখণ্ড মমতা, আর তারই স্বার্থবোধ।

সুভাষ বোস বিপ্লবী না বিদ্রোহী, হয়তো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ-প্রশ্ন অবান্তর ; কিন্তু ব্যাপক ও বৃহত্তর সুভাষ-জীবনের ঐতিহাসিক ভূমিকায় এ-প্রশ্ন মীমাংসার অপেক্ষা রাখে।

পরাধীন দেশে কুত্রাপি বিপ্লব ঘটেছে, সম্ভবত ইতিহাসে এর নজির নেই। পরাধীন দেশের মৌল কার্যক্রম একটি। স্বাধীনতা অর্জন করা। দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে দেশকে বৈদেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত করবার পর আসে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন।

এবং তাই, কস্থুথের হাঙ্গেরী, গ্যারিবল্ডীর ইটালী, উইলিয়াম টেলের সুইটজারল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা, আয়র্লণ্ড, কোরিয়ার মতো কোন পরাধীন দেশে বিপ্লব ঘটেছে, এ-কথা ইতিহাস বলেনি। যা ঘটেছে, তাকে বলেছে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইনসারেক্শন্।

এই সিদ্ধান্ত যদি ইতিহাস-সম্মত বলে বিবেচিত হয়, সুভাষ চন্দ্র নিশ্চয়ই বিদ্রোহী ; কিন্তু চির বিদ্রোহী ;—আধা নয়, ক্ষনিকের নয়, ভূতপূর্বও নয়। পরাধীন ভারতের সুভাষ বোস সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত বা নামকরণ হয়তো নির্ভুল, কিন্তু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

নেতাজি সুভাষ পরাধীন ভারতে জন্মাননি,—জন্মেছিলেন স্বাধীন দেশে।

যেদিন আর যে মুহূর্তে একটি বিধিসম্মত স্বতন্ত্র সরকার গঠন করে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, সেইদিন আর সেই মুহূর্তে দ্বিজত্বের গৌরব চিহ্ন তাঁর ললাটে ফুটে উঠেছিল প্রদীপ্ত হয়ে। তিনি বিদ্রোহী থেকে হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী। তাঁর মুক্ত করা ভারত-রাজ্যের পরিধি কতটুকু ছিল, এহ বাহ্য। কিন্তু ছিল, এই কথাটি পরম সত্য। সে আন্দামান হোক কিম্বা নিকোবরই হোক। এবং সেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের তিনি ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক।

ইটালী-রাষ্ট্রদূত কাবুলে নেতাজিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা

জিজ্ঞেস করেছিলেন। এবং জেনেও নিয়েছিলেন তাঁর নানা বিষয়ের মতামত। ভারতবর্ষের কার্যকরী সাহায্য কী ভাবে ও কী রূপে তিনি প্রত্যাশা করেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সামরিক বিভাগের সাহায্য তিনি অতি-আগ্রহের সঙ্গে চাইবেন নিশ্চয়ই এবং পেলে খুশিও হবেন ; তবে দু-একজনের পক্ষ-পরিবর্তনে তিনি সন্তুষ্ট আদৌ হবেন না। আর তাতে তাঁর কোন লাভও নেই। দু একজন সৈনিক একটা বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যথেষ্ট নয়। তিনি চান অন্তত একটা গোটা রেজিমেণ্ট। কিন্তু এ-কাজ করতে হলে তারাই তা করবে, যারা ভারতবর্ষে থাকবে এবং রইল। বাইরে থেকে এ-কাজ করা সম্ভব নয়।

এর পরই সন্ত্রাশবাদীদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি সুস্পষ্ট করেই বলেন যে, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় সন্ত্রাশবাদীদের দল থাকলেও, সত্য কথা বলতে কি, সন্ত্রাশবাদের উপযোগিতায় তাঁর বেশি আস্থা নেই। (···but he is not much convinced of the usefulness of terrorism.) (১)

বস্তুত ১৯৩৪-এর পর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সন্ত্রাশবাদ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কোন পরিকল্পনা বা অস্তিত্ব ছিল, এর কোন বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রামাণিক তথ্য নেই। অথচ যে-কারণে সন্ত্রাশবাদ একদিন অপরিহার্য হয়ে জাতির জীবনে দেখা দিয়েছিল, সে কারণ সেদিনও ছিল। ইংরেজ ও তার শাসন রইলই গেল শুধু সন্ত্রাশবাদ। গেল কেন ?

কারণ ছিল। এবং তা বহুবিধ হওয়াও স্বাভাবিক। হয়তো সন্ত্রাশবাদীরা নিজেরাই তাদের মতবাদে ও প্রয়োজনীয়তায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে থাকবে। অথবা সময়ের পরিবর্তনে ও খোলা আন্দোলনের কথঞ্চিৎ সফলতায় গোপন অপেক্ষা খোলা পথের প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে তারা বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আকর্ষিতও হয়েছে। কিম্বা পরিশ্রান্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

(১) শরৎ বোস এ্যাকাডেমি থেকে প্রকাশিত বুলেটিন, নেতাজি সংখ্যা, ১৯৬০

১৯৩৫-এর নতুন শাসন সংস্কার সফল করবার জন্য কংগ্রেস এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক সংস্থাই মনোযোগী হয়ে ওঠে। সন্ত্রাশবাদে বিশ্বাসী অনেকে নির্বাচনে যোগদান করে এবং নির্বাচিতও হয়।

১৯৩৭-এ গান্ধীজি গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নজরবন্দী ও ডেটিনিউদের মুক্তি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

দণ্ডিত ব্যক্তিদের অধিকাংশ এবং আটক-বন্দীদের একটি বৃহৎ অংশ এই সময়ে সন্ত্রাশবাদের ব্যর্থতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যে প্রচার করে পুরনো দল পরিত্যাগ করে এবং নতুন নামে এবং নব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। এরা কারাগারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এদের নতুন নামও দেয়া হয়েছিল। এরাই বাংলার সন্ত্রাশবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংস্থার বিদ্রোহী দল।

১৯২৩-২৪-এও একবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন দেখা দিয়েছিল মূলতঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের কাছে সন্ত্রাশবাদীদের আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু পরবর্তীকালে যে-বিদ্রোহ দেখা দিল, তা শুধু সন্ত্রাশবাদের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ নয়, এতকালের এবং-দীর্ঘদিনের মতবাদ ও আদর্শের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। ততক্ষণে এই বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ অংশ কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে এবং বাদবাকিরাও কেউ সোস্যালিষ্ট দলে বা অন্য নামে হলেও মূলত মার্কসীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিজ নিজ মত পরিবর্তিত করে নিয়েছে।

অধিকাংশ কিন্তু সবাই নয়। ছুটকো এবং ছোট দু-একটি দল এদের বাইরে ছিল। পুরনো সন্ত্রাশবাদীদের একটি অংশ গান্ধী-বাদ অঙ্গীকার করে পুরোপুরী খদ্দরধারী কংগ্রেসীতে রূপান্তরিত হয় এবং সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে এই দলের অধিকাংশ নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লীতে আসন কায়েমী করে নেয়। বাদবাকি যারা নির্বাচনের সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল অথবা ওপক্ষে যে-কোন কারণেই হোক যায়নি, তাদের জীবন হল নিছক রোমন্থনের জীবন।

জিজ্ঞেস করেছিলেন। এবং জেনেও নিয়েছিলেন তাঁর নানা বিষয়ের মতামত। ভারতবর্ষের কার্যকরী সাহায্য কী ভাবে ও কী রূপে তিনি প্রত্যাশা করেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সামরিক বিভাগের সাহায্য তিনি অতি-আগ্রহের সঙ্গে চাইবেন নিশ্চয়ই এবং পেলে খুশিও হবেন; তবে দু-একজনের পক্ষ-পরিবর্তনে তিনি সন্তুষ্ট আদৌ হবেন না। আর তাতে তাঁর কোন লাভও নেই। দু একজন সৈনিক একটা বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যথেষ্ট নয়। তিনি চান অন্তত একটা গোটা রেজিমেণ্ট। কিন্তু এ-কাজ করতে হলে তারাই তা করবে, যারা ভারতবর্ষে থাকবে এবং রইল। বাইরে থেকে এ-কাজ করা সম্ভব নয়।

এর পরই সন্ত্রাশবাদীদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি সুস্পষ্ট করেই বলেন যে, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায় সন্ত্রাশবাদীদের দল থাকলেও, সত্য কথা বলতে কি, সন্ত্রাশবাদের উপযোগিতায় তাঁর বেশি আস্থা নেই। (…but he is not much convinced of the usefulness of terrorism.) (১)

বস্তুত ১৯৩৪-এর পর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সন্ত্রাশবাদ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কোন পরিকল্পনা বা অস্তিত্ব ছিল, এর কোন বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রামাণিক তথ্য নেই। অথচ যে-কারণে সন্ত্রাশবাদ একদিন অপরিহার্য হয়ে জাতির জীবনে দেখা দিয়েছিল, সে কারণ সেদিনও ছিল। ইংরেজ ও তার শাসন রইলই গেল শুধু সন্ত্রাশবাদ। গেল কেন?

কারণ ছিল। এবং তা বহুবিধ হওয়াও স্বাভাবিক। হয়তো সন্ত্রাশবাদীরা নিজেরাই তাদের মতবাদে ও প্রয়োজনীয়তায় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে থাকবে। অথবা সময়ের পরিবর্তনে ও খোলা আন্দোলনের কথঞ্চিৎ সফলতায় গোপন অপেক্ষা খোলা পথের প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে তারা বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আকর্ষিতও হয়েছে। কিম্বা পরিশ্রান্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

---

(১) শরৎ বোস এ্যাকাডেমি থেকে প্রকাশিত বুলেটিন, নেতাজি সংখ্যা, ১৯৬০

১৯৩৫-এর নতুন শাসন সংস্কার সফল করবার জন্য কংগ্রেস এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক সংস্থাই মনোযোগী হয়ে ওঠে। সন্ত্রাশবাদে বিশ্বাসী অনেকে নির্বাচনে যোগদান করে এবং নির্বাচিতও হয়।

১৯৩৭-এ গান্ধীজি গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নজরবন্দী ও ডেটিনিউদের মুক্তি ত্বরান্বিত করেছিলেন।

দণ্ডিত ব্যক্তিদের অধিকাংশ এবং আটক-বন্দীদের একটি বৃহৎ অংশ এই সময়ে সন্ত্রাশবাদের ব্যর্থতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যে প্রচার করে পুরনো দল পরিত্যাগ করে এবং নতুন নামে এবং নব আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। এরা কারাগারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এদের নতুন নামও দেয়া হয়েছিল। এরাই বাংলার সন্ত্রাশবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংস্থার বিদ্রোহী দল।

১৯২৩-২৪-এও একবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন দেখা দিয়েছিল মূলতঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের কাছে সন্ত্রাশবাদীদের আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু পরবর্তীকালে যে-বিদ্রোহ দেখা দিল, তা শুধু সন্ত্রাশবাদের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ নয়, এতকালের এবং-দীর্ঘদিনের মতবাদ ও আদর্শের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। ততক্ষণে এই বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ অংশ কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে এবং বাদবাকিরাও কেউ সোস্যালিষ্ট দলে বা অন্য নামে হলেও মূলত মার্কসীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিজ নিজ মত পরিবর্তিত করে নিয়েছে।

অধিকাংশ কিন্তু সবাই নয়। ছুটকো এবং ছোট দু-একটি দল এদের বাইরে ছিল। পুরনো সন্ত্রাশবাদীদের একটি অংশ গান্ধী-বাদ অঙ্গীকার করে পুরোপুরী খদ্দরধারী কংগ্রেসীতে রূপান্তরিত হয় এবং সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে এই দলের অধিকাংশ নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্ব্লীতে আসন কায়েমী করে নেয়। বাদবাকি যারা নির্বাচনের সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল অথবা ওপক্ষে যে-কোন কারণেই হোক যায়নি, তাদের জীবন হল নিছক রোমন্থনের জীবন।

১৯৩৭-৩৮-এর মধ্যেই বাংলার ও ভারতের প্রায় সব সন্ত্রাশবাদী কারাগার ও আটক জীবন থেকে মুক্তি পায়। শুধু দণ্ডিত ও আন্দামান প্রত্যাগত সন্ত্রাশবাদীরাই সেদিন মুক্তি পায়নি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭,— দীর্ঘ ন'টি বৎসর; এবং এই ন'টি বৎসরের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র রূপান্তরিত হন নেতাজিতে।

১৯৩৯-এ, অর্থাৎ বিশ্বসমরের গোড়াতেই কিছু সংখ্যক সন্ত্রাশবাদী ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হয়, এ-কথা সত্য। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, বন্দী হয়নি এমন সন্ত্রাশবাদীও সংখ্যায় কম ছিল না।

সুভাষচন্দ্র এ-দেশ পরিত্যাগ করে দীর্ঘদিন ইওরোপে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে রেঙ্গুন থেকে তাঁর সংগঠন-কার্যের ইতিবৃত্ত, সামরিক অভিযান ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা রেডিও মারফৎ প্রচারিত হয়েছে। তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী, যুক্তিযুক্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা ও অভিযান এ-দেশের সন্ত্রাশবাদীরা শুনতে পায়নি কিম্বা জানতে পারেনি, এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। নিশ্চয়ই আর সকলের মতো তারা শুনেছিল। কিন্তু শুনে তারা কিছু করেছে, তার কোন প্রমাণ নেই। ইংরেজের সাময়িক বিপর্যয়ে তারা জনসাধারণের স্থায় উল্লাস প্রকাশ করেছে, এবং অদূর-ভবিষ্যতে সুভাষ বোস হিটলারের সহায়তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ না হলেও ইংরেজকে একটা মারাত্মক আঘাত-যে দেবেনই, এ-কথা ভেবে পুলকিত হয়েছে। কিন্তু এই পর্যন্তই।

বিশুদ্ধ ভারতীয় প্রথায় কোন কোন সন্ত্রাসবাদী পঞ্জিকার রাশী-চক্র বিচার করেছে এবং গ্রহাচার্যের দুয়োরে ধর্না দিয়ে সুভাষ বোসের বিজয়োৎসবের প্রত্যাশা করেছে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর বিশ্বজোড়া ঘূর্ণাবর্তে ভারতের পক্ষে যে সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, ১৯০৭ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত তা ছিল না। তবুও সেদিন ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার অকুতোভয় যৌবন

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। সেদিনও ভারত-রক্ষা আইন ছিল, ছিল ডিটেনশন ও কারাগার। তবুও। ভয়হীন, দ্বিধাহীন, পরিণামচিন্তাহীন এ-বাংলা অকস্মাৎ হারিয়ে গেল কেন? কেন গেল তলিয়ে? গেলই-বা কোথায়?

ঘটনাচক্রেই হোক, আর ইতিহাসের প্রয়োজনে হোক, নেতাজির সঙ্গে কোন ভূতপূর্ব বিপ্লবী, বা বিদ্রোহী বা সন্ত্রাশবাদী ছিল না। জার্মেনীতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার প্রান্তে তাঁকে আনকোরা নতুন উপাদান ও সরঞ্জাম নিয়ে তাঁর মুক্তি-বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল। এবং এর কার্যকারিতা ও পরিণাম-সাফল্য এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেবে যে, নতুনের সম্ভাবনা সর্বক্ষেত্রেই সর্বাধিক। ভারতবর্ষের সন্ত্রাশবাদীদের অপার ও অগাধ দেশপ্রীতি বিস্ময়কর, কিন্তু তাদের দলাদলিও স্থায়ী ও অপরিমেয়। নব উপাদানে বাহিনী গড়বার কালে নেতাজিকে সম্ভবত এই কারণে এই একটি দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি।

"সাদা কাগজের বুক ভরে ওঠে নতুন কথায় আর নানা অনবদ্য সাহিত্য সম্ভারে, সাদা কাগজেই মূর্ত হয়ে ওঠে শিল্পীর নবতম তুলির টানে অভিনব চিত্রকলা।" বলেছেন নতুন চীনের মহানায়ক মাও। (দি ওয়াল্স্ হ্যাজ টু সাইড্স্—ফেলিক্স গ্রীন)

ভারতবর্ষের জল-মাটির গুণেই হোক, অথবা জাতীয় চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই হোক, পেশাদার রাজনীতিকদের মতোই সন্ত্রাশবাদীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং রণক্লান্ত বিদ্রোহীরা সেদিন অত্যাচারীর অবসান ঘটাবার পূর্বেই নিজেদের সংযত করে বসল। বেছে নিল নিবৃত্তির পথ। গান্ধীর জয় হল। ("বস্তুত ১৯৩৪ সনের পরে বাংলা দেশে একটিও সন্ত্রাশবাদী ঘটনা ঘটেনি। আজ এতদিন-বাদে আমরা সন্ত্রাশবাদের কথা ভাবছি, কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভাবছে, একথা বললে শুধু আমাদের বুদ্ধিকেই নয়, আমাদের দেশপ্রেমকেও অবমাননা করা হয়।"—১৯৪৬-এর ১৭ই জানুয়ারী,

গান্ধীর নিকট শ্রীঅরুণ গুহ, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং তাঁদের কতিপয় বন্ধু লিখিত পত্রাংশ।—দেশ, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩)

নেতাজি ইঙ্গ-আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে এবং রণাঙ্গনের সীমানা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরও ভারতবর্ষে পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে শত্রু পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করতে বিশেষ কোন যত্ন নিয়েছেন বা চেষ্টা করেছেন, এর উল্লেখযোগ্য কোন নথিপত্র আজও পাওয়া যায়নি।

সামান্য কিছু কিছু চেষ্টার কথা ও তথ্য জানা গেছে। পুরীর উপকূলে আজাদ বাহিনীর গুপ্তচর ধরা পড়েছে। কলকাতায় কয়েকজন আজাদ বাহিনীর সৈনিক ছদ্মবেশে এসেছিলেন এবং সুভাষ-পন্থী কারও কারও সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নেতাজির স্বহস্ত লিখিত পত্র দিয়েছিলেন এবং পরে ধরা পড়েছিলেন, এবং অনেকের প্রাণদণ্ড হয়েছিল, এ-তথ্য সত্য। কিন্তু এ-দেশের সন্ত্রাশবাদীদের সঙ্গে একযোগে কিম্বা এ-দেশের সন্ত্রাশবাদীরা স্বতন্ত্রভাবে শত্রুর ক্ষতিকর কোন কাজে বা 'সাভোতাজে' সফলতা লাভ করা তো দূরের কথা, তার জন্য কোন চেষ্টাও করেছে, এর বিশ্বাসযোগ্য কোন নজির বা নিদর্শন নেই।

একটি ইংরেজ সৈন্য মরেনি। একটি আমেরিকান সৈন্যের গায়ে আঁচড় লাগেনি। ট্রেন চলেছে অবাধে। এই বাংলা দেশ থেকে এবং বাংলার বুকের ওপর দিয়ে দিবারাত্র শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ি গেছে, ট্রাক গেছে এবং সৈন্য যাতায়াত করেছে। কেউ বাধা দেয়নি। শত্রু বাধা পায়নি বিন্দুমাত্র।

পক্ষান্তরে এ-নজিরের অভাব নেই যে, ইংরেজ ও আমেরিকার সৈনিকেরা নির্ভয়ে এ-দেশে বেড়িয়েছে, এ-দেশের আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হয়েছে, এ-দেশের মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশে ভারতীয় নারীর তারিফ করেছে।

বর্তমান রণনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ পঞ্চম বাহিনী। নেতাজি

অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামরিক বিভাগের সঙ্গে গুপ্তচর বিভাগ শুধু গঠন-ই করেন নি,—এই বিভাগের ওপর তাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টিও ছিল। কিন্তু কার্যকরী ভাবে পঞ্চম-বাহিনী গঠন করে শত্রুপক্ষকে বিপদে ফেলবার কোন আয়োজন করেছিলেন, এর প্রামাণিক তথ্য কোথায় ?

তবে কি নেতাজি ভুল করেছিলেন ?

এই সংশয় ও প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবত আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক প্রশ্নও মনে জাগে :

(১) কেন নেতাজি আগে থেকে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় পঞ্চম-বাহিনী গঠনে উদ্যোগী হলেন না ;

(২) পঞ্চম-বাহিনী গঠন করে যদি তিনি যুগপৎ পঞ্চম-বাহিনী দ্বারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী দ্বারা প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাতে পারতেন, তা'হলে ফল ভিন্ন ধরনের হত কিনা ;

(৩) এদেশের জনসাধারণ, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিগণ, বিশেষ করে নেতাজির অনুবর্তীরা তাঁকে সাহায্য করেনি কেন ;

(৪) নেতাজি পরিকল্পিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ কিম্বা ঐ প্রকার কোন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য তৎকালীন দেশবাসীর আদৌ মানসিক প্রস্তুতি ছিল কিনা ;

(৫) নেতাজির অভিযান নিষ্ফল হোক, এই প্রকার অভিলাষ অনেকের মনে জেগেছিল কিনা ;

(৬) কংগ্রেস, বিশেষ করে এদেশের ধনী সম্প্রদায় মনে-প্রাণে ইংরেজ-সম্পর্কশূন্য পূর্ণ-স্বাধীনতার কল্পনায় ভয় পেয়েছিল কিনা ;

(৭) মহাত্মাজির অহিংস-নীতি নেতাজি পরিচালিত মুক্তি-অভিযানের ব্যর্থতার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী কিনা ;

(৮) দেশের অধিকাংশ লোক, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ইঙ্গ-আমেরিকার সমরায়োজনের বিশেষ বিশেষ কাজে আত্মনিয়োগ করে অর্থার্জনের বিপুল সম্ভাবনায় দেশ ও জাতির স্বার্থ ভুলে গিয়েছিল কিনা ;

(৯) ওপরের প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির সামরিক অধিনায়কত্ব কি ত্রুটিহীন বা পূর্ণাঙ্গ,—এ-প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক কিনা ?

প্রাসঙ্গিক। এবং এর যথাযথ বিচার ও বিশ্লেষণ নেতাজির ব্যক্তিত্ব, সমর কুশলতা এবং যোগ্যতা পরিমাপ করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

একদা গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দেশবাসীর কাছ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে সুভাষচন্দ্র এ-দেশ পরিত্যাগ করেছিলেন। সেদিন তাঁর প্রাণে ছিল দেশ ও জাতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশা ও ভরসা। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একটু সবল ইঙ্গিতে এ-জাত ক্ষেপে ওঠে। এবং উঠেওছিল। উঠেছিল ১৯৪২-এ। বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সেই উন্মাদ গণ-অভ্যুত্থান নেতাজিকে নব আশায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। (তার পূর্বের, ১৯২১ ও ১৯৩০-এর দুর্বার ও ভয়হীন জাগরণ-চাঞ্চল্য তাঁর উপস্থিতিতে ঘটেছিল।)। এই অভ্যুত্থান ও তাঁর জানা দেশবাসীর ইংরেজ-বিদ্বেষ তাঁকে এই ভরসাই দিয়েছিল যে, কোন প্রকারে একবার বাংলা বা আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলে সমগ্র জাতি তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াবে।

তাঁর নিজের কথা: "আমরা যতই এগিয়ে চলবো, এগিয়ে চলবো ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং যখনই ভারতের জনসাধারণ নিজের চোখে দেখবে যে, ইংরেজ সৈন্য হেরে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, আত্মবিশ্বাসে আমার দেশবাসী তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে আর মনে করবে যে, ইংরেজের পরাজয় সত্যিই আসন্ন। সেই পরমক্ষণে তারা এগিয়ে আসবে সকল বিপদ তুচ্ছ করে, আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে। এক সঙ্গে আমরা পলায়নপর ইংরেজের পশ্চাদ্ধাবন করবো। তাড়িয়ে দেবো ওকে ভারতভূমি থেকে।" (১০ই জুলাই, ১৯৪৪; রেডিও বক্তৃতা)

জার্মেনীর সহসা বিপর্যয়ে যে-প্রস্তুতি নেতাজির পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য মনে হওয়া ছিল একান্তই স্বাভাবিক, তা পূর্ণাঙ্গ করবার অবকাশ তিনি পাননি।

এ-কথা তাঁর মনে একবারও জাগেনি যে, ইংরেজ বিতাড়নের সম্পর্কেও ভারতীয় জনগণ বা নেতারা দ্বিধাগ্রস্থ হতে পারে। দীর্ঘ প্রায় চার বৎসরের মধ্যে দেশের নৈতিক ও মানসিক দেউলেনামা কতখানি গভীর ও নিম্নমানের হয়ে উঠেছিল, তার সঠিক পরিচয় ছিল তাঁর অজানা।

এই মুক্তি-পাগল মানুষটি একমাত্র আত্মবিশ্বাস ও প্রাণের ঐকান্তিকতা সম্বল করে অজানা ভবিষ্যতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজের মন, বুদ্ধি ও শক্তির মাধ্যমে তিনি অন্তকে বা বন্ধুকে বিচারও করেছিলেন।

সন্ত্রাশবাদীদের বৃহত্তর অংশ সেদিন কম্যুনিষ্ট। তারা সমবেত ভাবে সেদিন রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে সেই সময়ের রাশিয়ার বন্ধু ইংরাজকে সাধ্যানুসারে শক্তিশালী করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। রাশিয়া ছিল তাদের মক্কা। রাশিয়ার শত্রু সমগ্র কম্যুনিষ্ট জগতের শত্রু। সেই শত্রুর সঙ্গে মিতালি করে সুভাষ বোস যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিলেন,—গত জীবনের এবং এইক্ষণের শত দেশ-প্রীতির পরিচয় থাকলেও তাদের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা না করে গত্যন্তর ছিল না। রাশিয়া বেঁচে থাকলে বেঁচে থাকবে তারাও এবং তারা বেঁচে থাকলেই-না অনাগত ও অভীপ্সিত বিপ্লব সার্থক হবে এদেশে।

একদা বিপন্ন ইংরেজ ভারতীয় সন্ত্রাশবাদীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চাহিদায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টদের প্রশ্রয় দিয়েছিল। ইংরেজের সেদিনকার দূরদর্শিতার ফল ফলল। ইতিহাসের ঘূর্ণিচাকা। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায়।

হিটলারকে সৃষ্টি না করলেও তার লালনের স্বেচ্ছাদায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ইংরেজ। ক্রমবর্ধমান ফ্রান্স ও অগ্নিগর্ভ রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে যেয়ে ইংরেজ সেদিন পরিণাম-চিন্তার অবকাশ পায়নি। ঠিক তেমনি সন্ত্রাশবাদীদের ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩-এর বেধড়ক মারে ভয়াতুর ইংরেজ অনন্যোপায় হয়ে কম্যুনিষ্ট পন্থাকে কম বিপজ্জনক বলে ভেবেছিল। কাঁটা দিয়ে সে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল।

ভারতীয় কারাগারে অকৃপণ হয়ে ইংরেজ কম্যুনিষ্ট-সাহিত্য উদার মনে বিতরণ করেছিল। সুদূর আন্দামানেও তার বদান্যতা পৌঁছে গিয়েছিল। [“তখনও লেনিনের লেখা কিছু পড়িনি। (অর্থাৎ ১৯৩০-এ।)...যখন আন্দামান জেলে মহান বিপ্লবী নেতা লেনিনের লেখা পড়লাম” ইত্যাদি—অগ্নিযুগের এক অধ্যায়, অনন্ত সিং; সাপ্তাহিক বসুমতী, ৬ই পৌষ, ১৩৭৩।]

গান্ধীও ছিলেন ইংরেজ-বিরোধী। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাশবাদীদের তুলনায় তিনি শুধু ইংরেজের কাছে নিরাপদই মনে হননি, পরন্তু তাঁর বান্ধবও হয়েছিলেন। তাই ইংরেজ-প্রীতি ও প্রশ্রয় তাঁর বেলায় ছিল মুখর ও অকুণ্ঠ। সেই একই কারণে সন্ত্রাশবাদীদের হাত থেকে অন্তত সাময়িক নিষ্কৃতির আশ্বাস ইংরেজকে বাধ্য করেছিল কম্যুনিষ্টদের প্রতি প্রসন্ন হতে। এবং এরই শেষ পরিণতি স্বরূপ সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতার প্রত্যাশা নিয়ে ইংরেজ পরবর্তীকালে বহু আন্দামান প্রত্যাগত বন্দীকে সুনজরে দেখতে চেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একই কালে দু’জন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র। ভারতবর্ষের একটা গোটা শতাব্দী পরিপূর্ণ রয়েছে ও থাকবে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির অবদানে এবং কথায়। এই দুই স্বতন্ত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার মৌলিকত্ব শুধু অসাধারণ নয়, খানিকটা রহস্যপূর্ণও।

এই দুটি অসাধারণ ব্যক্তিরই গুণগ্রাহী, ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা ছিল অঢেল কিন্তু প্রকৃত অনুবর্তী ছিল একান্তই বিরল। গান্ধী যা চেয়েছিলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিচিত তাঁর অতি-ভক্তদের মধ্যে একজনেরও তা কার্যে পরিণত করবার যোগ্যতা ছিল না। সুভাষ-চন্দ্রেরও সেই একই দশা। তাঁর অনুরাগী ছিল, দলীয় ভক্তেরও অভাব ছিল না, কিন্তু অকৃত্রিম অনুবর্তী একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। (বাংলা ভরা অগুণতি বৈষ্ণব ও চৈতন্যভক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন যে, তাঁর প্রকৃত ভক্ত ছিল সাড়ে তিনজন।) বস্তুত এদেশে থাকা কালে,

বিশেষ করে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে এবং পরবর্তীকালের নেতাজিকে চেনা, বোঝা ও অনুসরণ করা দূরে থাক,—সে চেষ্টাও সম্ভবত হয়নি।

সেদিনকার আকবর শা, শিশির বোস, ভকৎরাম, আবাদ খাঁ এবং উত্তমচাঁদ সবদেশেই কোটিতে গুটিকই মেলে। সুভাষ বোসকে উত্তরকালে নেতাজি হবার সুযোগ দিয়ে যে আশ্চর্য, দ্বিধাহীন ও নির্ভিক সাহায্যের উপঢৌকন নিয়ে সেদিন এঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন, হয়তো অনেকে সে-কথা ভুলেই গেছেন। তবুও এঁরা ছিলেন একান্তই ব্যতিক্রম। অথবা সেই শাণিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এমনি করেই হয়তো লোহাও সোনা হয়ে উঠেছিল। সুভাষ-জীবনে এ-ইতিবৃত্তের অভাব নেই। স্বামিজীর সেই প্রজ্ঞাবাণী: one touch and one glance is enough to mould a life.... একটু ছোঁয়াচ, একটু ইসারা, এনে দিল আমূল রূপান্তর। যিনি একাজ পারেন, তিনি নেতা। সব চাইতে বেশি যিনি পারেন, তিনিই নেতাজি।

এঁদেরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরও চারিটি অকুতোভয় প্রাণের কথা: হরিদাস মিত্র, জ্যোতিষ বসু, পবিত্র রায় আর অমর সিং গীল। মুক্তি-যুদ্ধের শেষ অভিযানের স্মৃতি-দেউলে এঁদের অবদানের অনুজ্জ্বল দীপ শিখাটি বিশেষ করে কারও দৃষ্টি হয়তো আকর্ষণ করবে না, কিন্তু সেদিনকার নিস্পন্দ বাংলার বুকে বসে তবুও এঁরা কিছু করতে চেয়েছিলেন, এইটিই বড় কথা। গোপন বেতার-যন্ত্রে এঁরা এদেশের সংবাদ নেতাজিকে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং করতে যেয়ে ধরা পড়েছিলেন। প্রাণ দণ্ডাদেশের চরম পুরস্কার মাথা পেতে নিয়েছিলেন। অকম্পা বুকে ও ভীতিহীন চোখে তাঁরা গৌরবময় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ভেঙ্গে পড়েন নি। গান্ধী এগিয়ে এসেছিলেন এঁদের প্রাণ রক্ষার জন্য এবং রক্ষা করেওছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রের পরিচিত ও খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের

মধ্যে একমাত্র নেতাজিরই সামরিক শিক্ষা ছিল। এবং সেই শিক্ষা পরবর্তীকালে বিশেষ শিক্ষায় পরিণত হল জার্মেনীতে দুর্ধর্ষ জার্মান সামরিক অধিনায়কদের শিক্ষকতায়। এ-দেশীয় বিপ্লবী ও বিদ্রোহীরা বিনা সামরিক শিক্ষায় অন্তরে সমরাভিলাশ পোষণ করত। তাই, সত্য সত্যই যেদিন জাতীয় সংগ্রাম জাতির ভাগ্যে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল এবং ডাকও এল, সাড়া তারা দিতে পারেনি। ডাক তারা বোঝেই নি। তাই সারা দেবার কথা উঠলও না।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এটা ঘটেনি, ঘটেছিল অনেক পরে। ভারতবর্ষের সন্ত্রাশবাদ কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করবার পূর্বেই গান্ধী অত্যন্ত অকস্মাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। এবং সন্ত্রাশবাদ তথা সশস্ত্র ইংরেজ-বিরোধীতাকে কঠোর ও কুৎসিত ভাষায় অভিহিত করেন হিংসার পথ বলে। সঙ্গে সঙ্গে অহিংসার পথই-যে শ্রেয় ও প্রেয়, এই বলেই ক্ষান্ত হন নি,—শ্রেষ্টতম পথ অহিংসারই পথ, একথাও বলে নতুন অনুশাসন তৈরী করেছেন, শাস্ত্র পাল্টে নতুন করে লিখেছেন, এমন কি গীতার ভাষ্য নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন।

আহারে, পোষাকে, পরিচ্ছদে, ভাবনায়, চিন্তায় সর্বতোমুখী অহিংস হতে হলে কী কী করা উচিৎ, তার বিশদ ও বৈধ দলিল প্রস্তুত করতে তিনি ভোলেন নি। রাতারাতি অনেকে অহিংস হয়ে উঠল। গায়ে উঠল মোটা খদ্দর, হাতে টেকো বা চরকা, দেহে ফতুয়া,—কেউ-বা প্রায় নগ্ন।

সেই আদি ও আদিম ভারতবর্ষের নব কলেবর। গান্ধী গোটা দেশটাকে ঠেলে কয়েকটা শতাব্দী পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন।

দেশ-প্রেমিকের সংখ্যা চিরদিনই এদেশে স্বল্পতম। পূর্বে রাণাপ্রতাপ বা মহারাষ্ট্রের শিবাজীর ন্যায় দু-চারজন ছিলেন।

(তাঁরাও ভারত-প্রেমিক ছিলেন, তার কোন প্রমাণ সম্ভবত নেই) তাঁদের দেহেও ছিল হিংসার নামাবলি। তার পরের যুগে দেশপ্রেমিক রূপে যাঁরা পূজো পেলেন, তাঁরাও ছিলেন সেই পথেরই পথিক। কেউ দেশকে ভালোবেসে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়লেন, কেউ পাড়ি জমালেন আন্দামানে। পথটাও যেমন ক্ষুরধার, জীবনটাও কম ক্ষণস্থায়ী নয়। এ-পথে, তাই, বহুকাল,—কেউ কেউ এসেছে, কিন্তু বেশি আসেনি।

কিন্তু গান্ধীর কণ্ঠে সেদিন এই আশ্বাস ধ্বনিত হল যে, দেশপ্রেমিক হতে হলে মরবার প্রয়োজন নেই; নেই আন্দামানে যাবার তাগিদ। তাঁর নির্দেশ মতো চলে এবং তাঁর নির্ধারিত পন্থায় দেশের মধ্যে এবং দেশের বুকে অনায়াসে শুধু বৃহৎ নয়, মহৎ ও একটি বিশেষ উচ্চ স্থানও অধিকার করা যায়। সমাজের বুদ্ধিজীবী দলের একটা মোটা অংশ,—তার মধ্যে কিছু সংখ্যক ভূতপূর্ব সন্ত্রাশবাদীও ছিল, সাড়ম্বরে পুলকিত হয়ে উঠল। এদের অর্থ ছিল, বিদ্যা ছিল, প্রভাব ছিল এবং প্রতিপত্তিও কম ছিল না। তবুও পুজো পাবার সাধ থাকলেও পুজো নেবার সাধ্য ছিল না। অজ্ঞাত অখ্যাত ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-কানাই-সত্যেন-পিংলে আর তাঁদের নায়ক অরবিন্দ-বারীন্দ্র-সাভারকার-রাসবিহারী-যতীন্দ্রনাথ হবার উপায় কিম্বা উপাদান-যে তাদের নেই, এ-কথা তাদের বিলক্ষণ জানা। তাই, গান্ধীর এই মতবাদ তাঁদের কাছে মনে হল প্রিয়, মধুর আর অব্যর্থও। এই পরম পথে অনেকেই দলে দলে এগিয়ে এল। সমাজের নেতা হয়ে বসল অবলীলায়।

গান্ধীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল সন্দেহ নেই। ইংরেজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সন্ত্রাশবাদের বিভীষিকা তার কেটেও গেল। গান্ধীর অহিংসা-তত্ত্বের আকর্ষণ দেশের বৃহত্তম অংশে একটি বিশেষ উৎসাহ জাগিয়েছিল অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু মানুষের চিরন্তন ও স্বাভাবিক দুর্বলতা ও হীনবীর্যমন্যতার অবকাশও দিল প্রচুর। এবং এরই

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় চিরন্তন বীর্যধন্য আত্মদানের আকুতি পরিহার করবার বা এড়িয়ে যাবার রন্ধ্রপথে যে ক্লীবত্ব ও কপটতা স্থান করে নিল অবহেলায়, তারই অলজ্ঘ্য পরিণামে সদ্য জাগরণোন্মুখ একটা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড খান খান হয়ে ভেঙ্গেও গেল।

সেই একই পথে এগিয়ে এল কম্যুনিজম, এল সোস্যালিজম।

১৯৩৫ শেষ হল।

সেই পরম নিশ্চিন্ত জীবনের সীমাহীন নৈষ্কর্ম্য ও তৃপ্তি যে-ব্যক্তিটি সহসা উৎখাৎ করবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশান্তরে চলে যেয়েও ক্ষান্ত রইল না, সেখান থেকে বিদ্রোহের সিংহনাদে আর অস্ত্রের ঝনৎকারে কাঁপিয়ে তুলল ইংরেজের অস্তিত্ব, ইংরেজ তাকে সহ্য করবে কেমন করে? আর তাদের পক্ষে সহ্য করাও কি খুবই সহজ, যাদের নিরুপায় নিরুপদ্রব-নেতৃত্বের আসন সহসা টাল খেয়ে টলে পড়ল?

না, সহজ নয়। তারা তাই সহ্য করেনি। শুধু তাই নয়, পক্ষান্তরে ইংরেজ ও আমেরিকার শক্তি তারা জুগিয়েছে। বুদ্ধির প্রাখর্যে ও ভাষার মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত করেছে নিজেকে, ঠকিয়েছে দেশ ও জাতিকে। দীর্ঘদিনের শত্রুকে তারা ক্ষমা করেছে। ঔদার্যের অক্ষম অজুহাতে শত্রুর গোলামী দৃঢ় করেছে।

সাধারণ মানুষ ইংরেজ ও আমেরিকার সৈনিক ও সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের উদার আচরণে মুগ্ধ হয়ে শতমুখে তাদের প্রশংসা করেছে। গ্রামের সরল নির্বিরোধী চাষী-মজুর এদের কাছ থেকে কাজ করে মজুরী পেয়েছে বেশি, ফল-মূল-শস্য বেচে মূল্য পেয়েছে অধিক। দু'হাত তুলে এই বৈদেশিক শত্রুদের তারা আশীর্বাদ করেছে। তাদের কানে এ-কথা পৌঁছে দেবার কেউ ছিল না যে, এরা দেশের মিত্র নয়। শত্রু। অনেক দিনের আর অনেক রকমের শত্রু।

চিরদিন এ-কথা যারা বলত এবং বলে এসেছে, সেই বুদ্ধিজিবীর সবচেয়ে বড় অংশ ততক্ষণে ইংরেজ ও তার মিত্রদের বান্ধব সেজে শত্রুর

জিন্দাবাদে রাজপথ ও দেশবাসীর অন্তর মুখরিত করে তুলেছে। বাদ-বাকিরা ওদের সরবরাহের কনট্রাক্ট নিয়ে ফেলেছে। অসাধারণ ও খ্যাতনামা দেশভক্তরা মিলিটারী সাপ্লায়ার হয়ে নবলব্ধ মিত্রের হাত থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যোগ্যতার অধিক অর্থোপার্জনে মেতে উঠেছে।

নেতাজির ডাকে সাড়া দেবার সেদিন কি কেউ এদেশে ছিল?

না, ছিল না। নেতাজির ডাকে সাড়া দেয়া দূরে থাক, মুখের কথায় ইংরেজ-সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, এমন কথা বলবারও কেউ ছিল না।

দেশের একটি বৃহৎ ও শাঁসালো অংশ পূর্ণ স্বাধীনতা কামনাও করেনি। এই অংশটিই অতি উৎসাহে একদা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল সব চাইতে আগে এবং বেশি। অর্থ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, লোকবল দিয়ে গান্ধীকে দুর্ভেদ্য আবেষ্টনে ঘিরে রেখেছিল নিগূঢ় বিচক্ষণতায়।

এরা সবার আগে কেমন করে টের পায় আগামী দিনের ইঙ্গিত। বাংলার ছেলেরা জীবন দিয়ে, নির্বাসনে যেয়ে স্বদেশী করেছিল; এরা গড়ে তুলেছিল কল-কারখানা বম্বেতে, আমেদাবাদে, নাগপুরে। দানের অনবদ্য মহিমায় এরা মানুষের প্রখর বিরুদ্ধাচরণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। প্রবল ও প্রত্যুৎসাহী সমালোচকের মুখ চাপা দেয় জগদ্দল পাথরে। এরা ভবিষ্যদ্রষ্টা।

ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো ১৯৪২ এসেছিল জাতির দুয়ারে। আবার চলেও গেল একান্ত অপ্রত্যাশিত ত্রস্ততায়। কোন প্রকার নির্দেশ না দিয়ে নেতারা সরে পড়লেন ইংরেজের সুরক্ষিত কারাগারে। সেখানে যেয়ে কেউ লিখলেন বিশ্ববিখ্যাত কেতাব, কেউ তৈরী করলেন ফুল বাগিচা। নির্দিষ্ট দিন কাটিয়ে ইংরেজের অনুগ্রহে বাইরে এসে বিচার করতে চাইলেন তাঁদের, যাঁরা প্রাণের বিনিময়ে দেশের বুকে রচনা করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের এক অপরূপ বেদী। গান্ধী-

নেহেরু একসুরে ও তারস্বরে বলে উঠলেন যে, আগস্ট-বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ নেই। নেহেরু একথাও বলতে পিছপাও হলেন না যে, সুভাষ বোস বিদেশের সাহায্যে এদেশের ইংরেজ শাসকের ওপর আক্রমণ চালালে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে ইংরেজের পক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা করবেন না।

ইংরেজকে বিতাড়িত করতে যদি কেউ তরবারি ধারণ করে, গান্ধীর মতে তা পাপ ও সর্বথা পরিত্যজ্য। কিন্তু ইংরেজকে বাঁচাতে চান নেহেরু। জাতির পরিত্রাতা তিনি।

এ-সবই সত্য এবং এই মর্মান্তিক সত্যের সঙ্গে নেতাজিরও অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। তা সত্ত্বেও এ-দেশের পেশাদার রাজনীতিকদের এবং জনসাধারণের ওপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই নেতাজি ভুল করেছিলেন।

ইংরেজ তাঁর এ-ভুলের সুযোগ নিয়ে রেডিও মারফৎ তাঁকে কঠোর ও কটু সমালোচনা করেছে। ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি। ভারতবর্ষে নেতাজি আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব তো দূরের কথা, স্বল্পতম চাঞ্চল্যও দেখা দেয়নি। এ-কথা বেদনাদায়ক হলেও সত্য।

কিন্তু এ-ভুল করা ছাড়া সম্ভবত তাঁর গত্যন্তরও ছিল না।

॥ নয় ॥

সত্যিই সেই দিনটি এল। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নে দেখা সেই দিন। আরাকান ফ্রন্ট-এ আজাদহিন্দ ফৌজ ইংরেজ-আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রওনা হল।

যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে বহুকাল। নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাওয়া কাকে বলে, তাও তার অজানা।

মাঝ পথে কয়েকদিনের জন্য সামান্য কয়েকটি বেপরোয়া প্রাণে জেগেছিল মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার দুর্জয় ও অপরূপ মহিমা। তাও গোণা ক'টি প্রাণ,—আর গোণা ক'টি দিন। প্রাণ হারিয়ে গেল। দিনও গেল নিঃশেষ হয়ে।

দুর্ভাগ্য এ-জাতির। যার দেশ বা জাতির জন্য মরবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, বাঁচবার অধিকার সে হারিয়ে ফেলে।

ধর্মের দেশ। ধর্মের জন্য মরল ইওরোপের মানুষ। স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে যুগ যুগ ধরে আর্তনাদ করলাম,—কিন্তু জন্মভূমির জন্য সংগ্রাম ক্ষেত্রে মরবার ক্ষণই এল না।

সহস্র বৎসরের হারিয়ে যাওয়া, না-জানা অনুভূতি দেবতার আকস্মিক আবির্ভাবের মতোই সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। আর তার জীবন্ত ও অনন্য প্রাণ স্পন্দন ও দুর্লভ বীর্য ছড়িয়ে পড়ল, যে এল, তার গায়ে; যে শুনল, তার প্রাণে।

গোটা দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার বাল-বৃদ্ধ-যুবা, নারী আর পুরুষ ;—এমন করে পাগল হয়ে ওঠা কে দেখেছে ? শুনেছেই-বা কে ?

তাই দেখল। শুনলও।

কিন্তু নেতাজির আশা মিটল না।

সেই কাইকান। নেতাজি ইচ্ছামতো রণক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাতে

পারলেন না। ওদের ট্রেন, ওদের যান-বাহন, ওদের রসদ আর অন্যান্য অনেক উপকরণ। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নেতাজির প্রস্তুত। সবাই ফ্রণ্টে যেতে উদগ্রীব। মায় রাণী-বাহিনী। কিন্তু অবকাশ সীমিত।

তা'ছাড়া কাইকান পূর্বেই এমন এক ফ্যাঁকড়া বাধিয়ে বসল, যার ফলে নেতাজি শুধু চিন্তিতই হয়ে উঠলেন না, রীতিমতো ক্ষুব্ধও হলেন।

কাইকানের আইসোদা, য়িয়ামামোতো এবং কাগাবার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হতে থাকল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজাদহিন্দ আর জাপানের সম্মিলিত বাহিনী ভারতবর্ষের যে-ভূখণ্ড অধিকার করবে, তার শাসন-কার্য, শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য একটি কাউন্সিল গঠনের আবশ্যকতা পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু গোল বাধল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের প্রশ্ন নিয়ে। ওরা চেয়ে বসল জাপানী চেয়ারম্যান।

নেতাজির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। নির্বাক নেতাজি। এই পরম ক্ষণে ওরা এমন একটা বিসদৃশ প্রশ্ন উত্থাপন করবে, এ-ধারণা নেতাজি করতে পারেন নি।

ভাবলেশহীন জাপানী মুখগুলোর দিকে নেতাজি চেয়ে থাকেন। আরও পাণ্ডুর মনে হয় সেই মুখগুলো। আরও পাথুরে।

পুরো ছ'ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল। কিন্তু মীমাংসা হল না।

কিন্তু এই মানুষটিকে চিনতে জাপানীদের বাকি ছিল। একটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য-বোধ এই শ্রেণীর জাপানীদের ছিল মজ্জাগত। এবং তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি জাপান, আর বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী নায়ক,—অহঙ্কার হবে না? (দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা ইংরেজ সম্পর্কে এদেশের এ-ধারণা পাল্টাতে দিল না। আজও ইংরেজ আমাদের মুরুব্বি। আর একটি মুরুব্বি, ইংরেজের মুরুব্বি আমেরিকা। দৌর্বল্য ও ভিক্ষাবৃত্তির অনিবার্য পরিণাম।)

কিন্তু ঐ একটি মাত্র লোক, যার উন্নত মাথা উন্নতই রইল চিরদিন। নিচু হতে জানল না।

সেই লোকটিকে জাপানীরা দেখছে, তার সঙ্গে কথাও বলছে, কিন্তু থৈ আর পেয়ে উঠছে না।

মুখে হাসির বিরাম নেই। কথা শুধু শালীন নয়, অপ্রত্যাশিত মধুরও। কিন্তু অনমিত। নিজের দাবীর একচুল ভুলেও কমালেন না।

ওরা ভয় দেখায় টৌকিওর। টৌকিও শুনলে নাকি ভয়ানক ক্ষেপে উঠবে। তারা বরদাস্ত নাও করতে পারে। তখন ?

ওরা ভাবে, নেতাজি টৌকিওর নাম শুনে ভড়কে যাবেন। নিজের দাবী না-ও তুলতে পারেন। কিন্তু ফল হল উল্‌টো। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি বলে ওঠেন: "তাই নাকি ? তা বেশ। আমি তা হলে সোজাসুজি তাঁদের সঙ্গেই কথা বোলবো।"

দম ওদের ফুরিয়ে যায়। ফলাফল ওদের অজানা নয়। এই মানুষটির ওপর তোজো, সিগেমিৎসু কিম্বা সুগিয়ামার শ্রদ্ধা ও প্রীতির কথা ওরা বিলক্ষণ জানে। সর্বোপরি এই মানুষটির দক্ষতা ও সম্মোহন-শক্তি; হয়তো নয়, নিশ্চিত ওদের আবার হতমান হতে হবে।

ওরা বলে ওঠে: "তাহলে মহামান্য নেতাজি (Your Excellency) কি কাউন্সিল আদপেই চান না ?"

"চাইনে মানে ?" খুব ধীরে আর ভদ্রকণ্ঠে উত্তর দেন নেতাজি: "ওটা যেমন করেই হোক হতেই হবে। কিন্তু চেয়ারম্যান থাকবেন একজন ভারতীয়।"

স্তব্ধ ও স্থির নেত্রে শুধু ওরা এই মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কথা ফোটে না। ওদেরও মনে হয় মানুষটিকে পাথুরে।

প্রশ্নটি স্থগিত রইল।

ওদের ওঠবার পূর্বেই নেতাজি উঠে দাঁড়ান। হাসিমুখে করমর্দন করেন। ঠাট্টা তামাসাও বাদ যায় না।

অতিথি যে। কিন্তু ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু ?

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪।

যাত্রার পূর্বক্ষণ। আজাদ হিন্দ ফৌজ চলেছে রণাঙ্গনে। স্টেশনে

এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। জ্বল জ্বল করছে মুখ আর চোখ। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ধমনীর রক্ত। সবাই দাঁড়িয়েছে ফাইল করে।

নেতাজি এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে। নেতাজি। সিপাহ্‌সালার।

গর্জে উঠল ফৌজ। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ। তারপর সর্বাঙ্গ দিয়ে ওরা হুঙ্কার ছাড়ে—নেতাজি জিন্দাবাদ।

ভাই ভাইকে কতটুকু ভালোবাসে? পিতা পুত্রকে? এর চাইতেও বেশি?

নেতাজিকে দেখলে ওরা পাগল হয়ে ওঠে। একটু হাসি, একটু স্পর্শ, একটি ডাক; ওরা গলে যায়।

চলেছে ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে। ক'জন ফিরে আসবে? কেউ কি আসবে?

মরতে যাবার ভেতর এত আর এমন আনন্দ লুকিয়ে থাকে, এ বারতা কে জানত?

নেতাজি জনে-জনের কাছে যান। ওরা বলে জয়হিন্দ। ওদের হাত টেনে নেন নেতাজি। মাথায় বুলিয়ে দেন আশীর্বাদ। ওরা বিহ্বল হয়ে ওঠে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। আকাশ বিদীর্ণ করে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে,—নেতাজি জিন্দাবাদ।

নিজের কথা ওরা ভুলে গেছে।

শুধু দেশ, আজাদী, আর নেতাজি ছাড়া আর সবই মিথ্যে হয়ে গেল।

গাড়ির দিকে চেয়ে থাকেন নেতাজি অপলকে। তারপর মাথা নিচু করে ফিরে আসেন বাংলোয়। নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢোকেন।

ডাক্তার রাজু, এ্যাডজুটান্ট রাওয়াৎ ও সামশের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন বারান্দায়। দু'হাতে মাথা চেপে বসে থাকেন আয়ার।

আনন্দ আর বেদনা দুমড়ে দিতে চায় বুকখানা।

স্বপ্ন আজ সার্থক। ইংরেজকে তাড়াবার সম্মুখ-সমরে যোগ দিতে চলেছে তাঁর হাতে গড়া ফৌজ। আজাদ হিন্দ ফৌজ। সারা

ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। আর?—আরও একটি লোকের দিকে।

কিন্তু ওরা?

বেলা বেড়ে চলে। চা খেয়ে নেতাজি গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন।

বিধাতাপুরুষ আর সবই দিয়েছিলেন অকৃপণ হয়ে। শুধু দেননি বিশ্রাম।

গাড়ি প্রথমে থামে হাসপাতালের সামনে। আজাদ হিন্দ হাসপাতাল। মিয়াং-এ। রেঙ্গুন থেকে মিয়াং ছ'মাইল দূরে।

আহত সৈনিকরা এখানে আসবে। তাই এখানকার ব্যবস্থা নেতাজি স্বচক্ষে দেখতে চান। ডাক্তার, নার্স, এ্যাম্বুলেন্স ;—খোঁজ নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখেন সব তন্ন তন্ন করে। ফাঁক থাকলে ভরে দিতে বলেন। ত্রুটি দেখলে শুধরে দেন।

তারপর রাণী-শিবির। পাঁচশো মেয়ে এসে গেছে। নিয়মিত শিক্ষায় এরা হয়ে উঠেছে রীতিমতো সৈনিক। এরা রোজ যথানিয়মে কুচকাওয়াজ করে। অস্ত্র-চালনা শেখে। আরও প্রয়োজনীয় শিক্ষায় এদের গড়ে তোলা হয় যুদ্ধের উপযোগী করে। এরা আর পেছনে থাকতে চায় না।

বালসেনা। এক অপূর্ব সৃষ্টি। শুধু কিশোর বালক নিয়ে গড়া। অসাধ্য সাধন করছে এই বালখিল্যেরা রাশিয়ায়। এখানেও তাই ওরা করবে। খুদে সৈনিক নেতাজির সামনে বুক ফুলিয়ে পা ঠুকে দাঁড়ায়। হাত তুলে অপূর্ব ভঙ্গীতে সেলাম করে। মুখে বলে জয়হিন্দ। নেতাজি ওদের খুদে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে করমর্দন করেন। কেমন অভিনব ভঙ্গীতে ওরা ফাইল করে দাঁড়ায়। সামনে ওদের ক্যাপ্টেন। নেতাজি হেঁটে যান দেখতে দেখতে। সঙ্গে চলে ক্যাপ্টেন।

এখান থেকে সঙ্ঘের হেড-কোয়ার্টার। সেখান থেকে সুপ্রিম-কম্যাণ্ড অফিস। নেতাজির নিত্যদিনের রাউণ্ড।

এর পর প্যারেড গ্রাউণ্ড। বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন স্বেচ্ছাসেবক

প্রতিদিন আসছে দলে দলে। আসছে থাইল্যাণ্ড থেকে, যাভা থেকে, মালয় থেকে সুদূর সাংহাই, হংকং, ফিলিপাইন আর জাপান থেকে। এ ছাড়া বার্মা।

এদের থাকা, খাওয়া, পোষাক, শয্যা, শিক্ষা; বিরাট ব্যাপার। সাধারণ মানুষের কল্পনা খেই হারিয়ে ফেলে। রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে নিত্যদিন। কিন্তু সবই চলেছে নিয়মিত। অটুট শৃঙ্খলা সর্বত্র। একটা মস্ত বড় কারখানা কাজের দিক দিয়ে। কিন্তু প্রাণের ক্রিয়াও চলেছে অবিরাম। প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ চাওয়া। অচেতন নয়, অবচেতনও নয়,—সচেতন প্রাণের বহ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল।

'পূর্ণ স্বরাজ' ও 'জয়হিন্দ',—আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের দুই মুখপত্র। সপ্তাহে সপ্তাহে নিজ প্রেসে ছাপা হয়। বিক্রী হয়। সবাই কাড়াকাড়ি করে কেনে। পড়ে।

তাছাড়া রেডিও। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সংবাদ। নিয়মিত বক্তৃতা। মাঝে মাঝে নেতাজির। রেডিও মারফৎ সঙ্ঘের সংবাদ, যুদ্ধের সংবাদ, নেতাজির কথা, ভারতবর্ষের কথা প্রচারিত হয়।

মধ্যাহ্ন শেষ হয়ে আসে। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। আহারের কথা মনে থাকে না। নিজের কথা কবেই-বা মনে পড়ল? যোগযুক্ত এক মহাযোগী চলেছেন সমাহিত হয়ে আপন মনে। নিয়োজিত কাজে ঢেলে দিয়েছেন নিজেকে। নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছেন হাজারো জনকে। মহাকালের চক্রের মতো অবিরাম চলেছে গতি। চলা। ছোটা।

রাত আটটায় নেতাজি বসবেন নৈশ ভোজনে। সঙ্গে থাকে নিয়মিত নিজস্ব পরিজন রাজু, রাওয়াৎ, সামশের তো বটেই; তাছাড়া প্রায়ই আয়ার। বাড়তি অতিথিও দু'চার জনা।

খাবার পূর্বে স্নানটি আবশ্যিক। আর সেটা হবে বেশ আরাম করে। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর খাওয়া। রাতের খাওয়াটা বেশ

বসিয়ে। মাঝে মাঝে পুরি হয়। গরম গরম পুরি আর ডাল। ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলে।

যদি কোনদিন মাছ ভাগ্যে জোটে, আর কথা নেই। ভাত চেয়ে নেবেন। ভালো লাগলে দুবারও। সবশেষে একটু মিষ্টি। বেশি দিনই পায়েশ। কাষ্টার্ড হলে ছোঁবেনও না। আবার ভয়ও পান। মিষ্টি খেলে ওজন বেড়ে যাবে। গায়ে লাগবে চর্বি। চলবে না। এর পর কফি।

এই কফি দেখেই রাতের প্রোগ্রাম অনুমান করা চলে। কফি এক কাপ হলে কাজ চলবে রাত অন্তত একটা পর্যন্ত। দু'কাপ হলে বুঝতে হবে, রাত দুটো হতে পারে, আবার তিনটে হওয়াও বিচিত্র নয়। যদি কুন্দন সিং-এর ওপর বেশি করে কফি টেব্‌ল্‌-এ রাখবার হুকুম হয়, বুঝতে হবে, কাজ চলবে ভর রাত। কুন্দন নেতাজির রেঙ্গুন ক্যাম্পের খাস ভৃত্য।

কখনও-সখনও রাত্রিবেলা কফির ডাক-ই আসবে না। বুঝতে হবে একটু সকাল সকাল ঘুমুতে চান নেতাজি। কিন্তু এটা ঘটত কদাচিৎ।

ফৌজ ও সঙ্ঘের অধিকাংশ লোকই ছিল নেতাজির বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু অবিশ্রান্ত কাজে ওঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য কারও ছিল না। দুপুরের খাওয়া শেষে সিগারেট-মুখে একটুখানি ঝিমুনি আসত। কোন কোন দিন চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে নিতেন একটু। আবার কখনও গড়িয়ে নিতেন শয্যায়। তাও একটুক্ষণ। আধঘণ্টাও নয়। নতুন কাজ অপেক্ষা করে রয়েছে না?

লিখতে লিখতে রাত শেষ হয়ে যাবে। আর এটা ঘটত হামেশাই। খাবার পরই বসবেন লিখতে। সে-লেখা আর থামবে না। চলবেই। ভোরের পাখিরা ডাকে। তবু চলে লেখা। প্রভাতী চা দিয়ে যায় কুন্দন। বাটি টেনে নেন। চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে আবার শুরু করেন লিখতে।

হাঁপিয়ে ওঠেন ভাস্করণ। নেতাজির নিজস্ব টাইপিস্ট। ডাক পড়ে আয়ার সাহেবের। চলতে থাকে লেখা আর টাইপ করা। চিঠির

পর চিঠি। লেখেন বার্লিনে। লেখেন জাপানী গভর্ণমেণ্টকে। লেখেন বিভিন্ন কর্ম-কেন্দ্রে।

জাপানে চল্লিশটি ছেলে পাঠিয়েছিলেন সামরিক শিক্ষা-শিবিরে। নিয়মিত চিঠি লিখতেন ওদের কাছে। সব-কটিই ছেলে মানুষ। নেতাজির চিঠি পেয়ে ওরা কাঁদত। পাবার আনন্দে কাঁদত। আবার বেশি না পেয়েও কাঁদত। নেতাজি ওদের সব। সব ছেড়েই-না ওরা নেতাজিকে পেয়েছে।

নেতাজির নিজস্ব পরিজনের সংখ্যা ছিল সামান্য কয়েকটি। ডাক্তার রাজু, এ্যাডজুটাণ্ট রাওয়াৎ ও সমশের সিং, টাইপিস্ট ভাস্করণ, খাসভৃত্য কুন্দন সিং আর টেবল বয় কালী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী এরা।

নেতাজি ছিলেন একা বাঙালী।

সত্যিই কি তাই ?—না।

আর সবাই ছিল এক এক প্রদেশের, কিন্তু তিনি একা ছিলেন ভারতবাসী।

নেতাজির অন্তরঙ্গ কর্ম-সঙ্গী য়িয়ালাপ্পা ছিলেন কূর্গের অধিবাসী; চিফ্ অব ষ্টাফ ছিলেন মেজর ভোঁসলে, মহারাষ্ট্রের; ফৌজের প্রধান প্রধান সেনাপতি, হবিব, আজিজ আহাম্মদ-কিয়ানি জামান-ইশান কাদির-শা নওয়াজ ছিলেন মুসলমান ; এ, সি, চ্যাটার্জি বাঙ্গালী; জন থিবি আর (সম্ভবত) আয়ার ছিলেন খৃষ্টান; স্ট্র্যাসি ছিলেন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ছোট খাটো একটি ভারতবর্ষ। পাঞ্জাব-সিন্ধু-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ এক হয়ে মিশে গিয়েছিল মহাভারতের মহামেলায়। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। মিশেছে সাগরতীরে। নেতাজিতে।

ধর্মের পার্থক্য এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল না। জাতিভেদ মুখ খিঁচিয়ে উঠল না। স্মরণাতীত যুগের ভারতবর্ষ উঁচু-নিচু, চল-অচল, প্রাদেশিক বিভিন্নতা আর ভাষার দুরতিক্রম্য ব্যবধান কাটিয়ে ফুটে উঠল দিব্য এক নতুন কলেবর নিয়ে ?

জাদুকরের যাদুদণ্ড মাথা ছুঁয়ে দিয়েছে। যা হবার নয়, কল্পনারও নয় ;—হয়ে গেল নিমেষে।

বিপ্লবের চিরন্তন ধর্ম। বিপ্লবীর দুর্নিবার চাওয়া। ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ, কে হিসেব রাখে তার? সম্মুখে দিগন্ত-ঘেরা অপার্থিব আকুতি অপেক্ষা করে শুভ্র সুন্দর অভ্যর্থনার উপচার নিয়ে। পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বন্ধুরও। কিন্তু দিতে হবে পাড়ি। যেতে হবে সব ডিঙ্গিয়ে।

সব পাড়ি দিয়ে, ডিঙ্গিয়ে, আজাদ হিন্দ সরকারের অধিনায়ক আর ফৌজের শিপাহ্‌সালার এসে দাঁড়িয়েছেন। কণ্ঠে ওঁর প্রবুদ্ধ ভারতের উদ্বোধনী মন্ত্র।

১৯২১-এর জুলাই থেকে ১৯৩৯-এর আগস্ট পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের সভ্য। দু'বার তিনি সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। কর্মক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, জহরলাল নেহেরু এবং আরও দু'চার জনের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। একদা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে অনেকেই সুভাষচন্দ্র ও জহরলালকে গান্ধীর পরবর্তী নেতা বলে মনে করত। কিন্তু এ-কথা আরও বেশি সত্য যে, রাজনীতির ডামাডোলে, মতবাদের পার্থক্যে এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে এই সম্পর্ক তিক্ত হতে হতে একদিন সম্পর্কের ছেদও প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্র স্বদেশ পরিত্যাগ করবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই তিক্ততা অপসারিত হয় নি। উভয় পক্ষই উগ্র সমালোচনা করেছেন, সভায়, বৈঠকে, সংবাদপত্রে এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। তারপর একদিন সমবেত ভাবে প্রধান প্রধান কংগ্রেস নেতারা সম্মিলিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন,—এ-তথ্য ঐতিহাসিক।

গান্ধীকেও সুভাষ সমালোচনা করেছেন। মাঝে মাঝে সে-

সমালোচনার সুর উগ্রও হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনদিনই অঙ্গে তার বিদ্বেষের পঙ্কচিহ্ন দেখা দেয় নি। ভাষাও শালীনতার বাঁধ ভেঙ্গে যাবার অবকাশ পায় নি। মতবাদের বিভিন্নতা এবং বিচার ও বিশ্লেষণের পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর অর্থবহ সীমায় থাকত আবদ্ধ। কিন্তু আজাদ বা নেহেরুর বেলায় তা ছিল না।

নেহেরু সুভাষচন্দ্রকে বলতে চেয়েছেন ফ্যাসিষ্ট। সুভাষ জহরলালকে বলেছেন কল্পনা-বিলাসী বচনবাগীশ। আজাদকে বলেছেন 'গ্রাণ্ড-মোগল'।

নিজের বলতে সচরাচর মানুষের যা থাকে, সবই জীর্ণবস্ত্রের মতো ফেলে সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করেছিলেন। সঙ্গে ছিল শুধু একটি তুলসীর মালা আর একখানা ছোট্ট চৌকো গীতা। আর সবই ফেলে এসেছিলেন দেশে। ভারতবর্ষে। ফেলে এসেছিলেন আরও কিছু। অনেক দিনের সাথী আর বন্ধুদের প্রতি বিরোধী মনোভাব।

দূরত্বের ও অদর্শনের ব্যবধান বিরোধের তীব্রতা সীমিত ও স্তিমিত করেছিল নিশ্চয়ই কিন্তু সুভাষ-চরিত্রের বৃহৎ উপাদানই সর্বাধিক সাহায্য করেছিল এই সব ছোট কথা ভুলে যেতে।

নোংরামি, সঙ্কীর্ণতা, অসূয়া আর পরশ্রীকাতরতা তাঁর মনে কোনদিনই বড় হয়ে দেখা দেয় নি, এই কথাটিই বেশি নয়,—তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। শুচি-শুভ্র অন্তরের আনাচে-কানাচেও স্থান পেত না নীচতা ও ক্ষুদ্রতা। একটা বৃহৎ ও ব্যাপক আদর্শ এবং তার সঙ্গে মানবিক আন্তর মহানুভবতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এবং এই কারণেই গত-জীবনের সহকর্মীদের সকল রূঢ়তা ও মূঢ়তা ভুলতে তাঁর সময় লাগল না। অনায়াসে ও একান্ত প্রসন্নমনে ফৌজের নামকরণ করতে পেরেছিলেন গান্ধী-ব্রীগেড্, নেহেরু-ব্রীগেড্ ও আজাদ-ব্রীগেড্। এ-করতে তাঁর আটকায়নি কোথাও। পরশ্রীকাতরতা এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। অন্তরের এক বিস্তীর্ণ বিস্ফোরতায় নিজেকে যুক্ত করেছিলেন বলেই রাজনৈতিক জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি এমন

করে মমতা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলী দিতে পেরেছিলেন নিষ্কাম প্রসন্ন উদারতায়।

বৃহতের ধর্ম। অল্প ছেড়ে মন যখন ভূমায় মাতে, এমনি করেই তার সম্মুখের সুগোচর সঙ্কীর্ণতা লুপ্ত হয়ে যায়। ফুটে ওঠে দৃষ্টির পথে দিগন্তের অথৈ বিস্তার। মহামানবত্ব ধরা দেয়। সে হয়ে ওঠে পুরুষ প্রধান।

জানা ও চেনা সুভাষ বোস মরে গেলেন সেইদিন, যেদিন নিজের সর্বস্ব ভুলে তিনি আত্মাহুতির আয়োজনে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই শবদেহের ওপর ফুটে উঠলেন দিব্যশ্রী নেতাজি। শুভ্র, সুন্দর, অনবদ্য। তাই তাঁর অঙ্গে আর মনে স্থান পেল না বিন্দুমাত্র মালিন্য।

আরাকান ফ্রন্টের আক্রমণ আশাতীত। প্রথম ধাকায় মিত্রপক্ষের ব্যূহ ভেঙ্গে পড়েছে। পিছু হটছে ওরা। দূরে,—অনেক দূরে চট্টগ্রাম। নেতাজির বাংলাদেশ। আজাদী ফৌজ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ওঠে দুর্বার হয়ে। ওদের হাতে হালকা মেশিন গান, মরটার আর রাইফেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা বুথিডং-এর বুকে। বুথিডং-এ মিত্রপক্ষের শক্ত ঘাঁটি।

রাইফেলের বারুদ নয়, বুকের বারুদ নিয়ে আজাদী ফৌজ আঘাত হানতে থাকে শত্রুর বুকে। মুলুকের শত্রু। আজাদীর শত্রু। মরবে ওরা কিন্তু ফিরবে না।

বুথিডংকে ঘিরে জীবন-মরণ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে স্থান হাত বদল হয়। একবার কেড়ে নেয় আজাদী ফৌজ, পরক্ষণেই শত্রু এগিয়ে আসে।

অগুনতি প্লেন এসে গেছে মিত্রপক্ষের ; আর বড় বড় কামান। ওদের কামান তছনছ করে দেয় যুদ্ধভূমি।

আহতদের নিয়ে প্রথম গাড়ি এসে পৌঁছেছে রেঙ্গুনে। ওদের রাখা হয়েছে হাসপাতালে। ঝাঁসীর রাণীরা ওদের সেবার ভার নিয়েছে।

কিন্তু রাণীরা এতে মোটেই খুসি নয়। হাসপাতালের সেবা করতে তারা যুদ্ধ শেখেনি। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে চায়। ওরা আবেদন জানিয়েছে নেতাজির কাছে। লিখেছে: "আমাদের এই আবেদন আমরা আমাদের রক্তে সাক্ষর করে আপনার হাতে তুলে দিলাম। মাতৃভূমির স্বাধীনতা আমাদের কতো প্রিয়, এ তারই প্রমাণ। আমাদের পরীক্ষা করুন নেতাজি।"

"আবেদন-পত্র সাক্ষর করেছিলেন দু'জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, দু'জন বাঙালী, আর দু'জন গুজরাটি মেয়ে। আমাদের নিজেদের আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়েছিলাম। ওঁদের নিজেদের রক্তও ছিলো তাতে। ওঁরা তাই দিয়ে সই করেছিলেন আবেদন-পত্র।" (১)

১৮ই মার্চ, ১৯৪৪। স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্ দিনটি ইতিহাসের পাতায়। ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত সৈন্য পরাজিত করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। চুম্বন করেছে ভারতের মৃত্তিকা মায়ের পায়ের মাটি। সেই মাটিতে আজাদী সৈন্য গড়াগড়ি দিয়েছে। কেঁদেছে হাউ হাউ করে। ভারত মৃত্তিকায় উড়িয়েছে জাতীয় পতাকা।

"ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমির ওপর দাঁড়িয়েছে আমাদের ফৌজ। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হলো পূর্ব-এসিয়ার সর্বত্র। রেডিও ঘোষণা করে চললো বার বার। বিশ্বের দিকে দিকে পৌঁছে গেলো এই বিশেষ বার্তা। নেতাজির বিশেষ ঘোষণা প্রকাশিত হলো ২১শে মার্চ ১৯৪৪।" (২)

প্রতিটি ২১শে তারিখ নব নব বারতা আর ইঙ্গিত জাতির কানে আর প্রাণে পৌঁছে দিক। ২১শে অক্টোবর (১৯৪৩) সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই থেকে প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে ২১শে অক্টোবর পবিত্র আর স্মরণীয়। সবাই উৎসবে মেতে ওঠে।

---

(১) বিদ্রোহী ভারত-কন্যার রোজ নামচা—'জয়হিন্দ'

(২) আন টু হিম এ উইটনেস—আয়ার

আবার এল সেই ২১শে। এল এক নবতম রোমাঞ্চ নিয়ে। ভুলে যাওয়া স্বপ্ন বুকে আঁকড়ে। শুধু ইংরেজকে হটানো নয়,—ওরা মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।

ন'মাস পূর্বে নেতাজি রেঙ্গুনে পদার্পণ করেন। সিঙ্গাপুরের সেই ছোট্ট একটুখানি ভূখণ্ড থেকে মালয়, থাইল্যাণ্ড পেরিয়ে বার্মার ওপর দিয়ে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ পৌঁছে গেছে ভারতের বুকে।

রূপকথা বলে মনে হয়। নেতাজি নেতাজিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন নেতাজি। কিন্তু এতটা?

জেনারেল লোকনাথনকে নিযুক্ত করা হল স্বরাজ আর শহিদ দ্বীপের চিফ্‌ কমিশনার। আর কর্ণেল চাটার্জি নিযুক্ত হলেন শত্রুমুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রথম গভর্ণর।

ডিপ্লোম্যাট 'চন্দ্র বোস' কাউন্সিল বা চেয়ারম্যানের কথা আর তুললেনই না। কিন্তু গভর্ণর নিযুক্ত করা হবে কি হবে না, এ-সম্বন্ধে তো আলোচনা হয়নি। অতএব।

কাইকানের লোকগুলো শুনল এবং অনেকক্ষণ পর তারা বুঝল যে, তারা হেরে গেছে।

চাঞ্চল্যের বান ডেকেছে। অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য। গোটা পূর্ব-এসিয়া জুড়ে। কেউ আর এই বিপুল চাঞ্চল্যের বাইরে থাকতে চায় না।

উনিশটা ডিপার্টমেণ্ট কাজ করে চলেছে আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে। এদের মদত জোগায় সঙ্ঘ। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। ব্রহ্মদেশে সঙ্ঘের শাখা একশোটি, সত্তর মালয়ে, থাইল্যাণ্ডে চব্বিশ এবং ছোট-বড় অন্যান্য সহরে আরও অনেক।

সামরিক শিক্ষা-শিবির মালয়ে চার; একসঙ্গে সাত হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। বার্মায় চার, থাইল্যাণ্ডে এক। অফিসার শিক্ষা-কেন্দ্র দুটি; শ্যোনানে একটি, আর একটি রেঙ্গুনে।

সিভিল সার্ভিস শিক্ষা-কেন্দ্র দুটি; শোন্যানে ও রেঙ্গুনে। শিক্ষা

দেয়া হয় ভবিষ্যৎ প্রশাসন বিভাগের কর্মীদের। এরা শিক্ষা পায় পুনর্গঠন বিভাগের অধীনে।

মালয়ে ২০০ একর জমি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ভারতীয় গৃহহীনদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করতে। জঙ্গল কেটে গড়ে উঠছে গৃহ, সব্জী বাগান, ফসলের জমী; আর নানা প্রয়োজনীয় সরকারী ভবন। পুনর্বাসন বিভাগের কাজ।

শিক্ষা-বিভাগের কাজের সীমা নেই। এক বার্মাতেই পঁয়ষট্টিটি স্কুল চলছে। প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে একাধিক স্কুল। ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ে। সব স্কুলেই হিন্দী পড়ানো হয়। তা আবার যা-তা হিন্দী নয়,—'উস্তাদের হিন্দী'। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এই শিক্ষার কাজে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। (বার্মার 'ফুঙ্গীরাই' [বৌদ্ধ সন্ন্যাসী] প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন বার্মার ছেলে-মেয়েদের।)

স্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ বিভাগের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বার্মা ও মালয়ের জঙ্গুলে এলাকায় অনেক ডাক্তার পাঠানো হয়েছে। নার্সও গেছে। অজস্র কুইনিন বিলি করা হয়েছে। হাসপাতাল খোলা হয়েছে বড়-বড় সহরে, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্র (health centre) বহুস্থানে। অনেক গাঁয়ে। মহলে মহলে।

সর্বোপরি আজাদ হিন্দ দল। মুক্ত অঞ্চলের জন্য প্রথম কর্মী এরা। ভারতের যে-সব স্থান শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা হবে, সেখানেই প্রথমে যাবে এরা। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে, সর্ব বিভাগের কর্মী রয়েছে এই দলে। এ যেন ত্রাণ বিভাগ। দেশ ও জাতির দুঃখ যেখানে, সঙ্কট যেখানে, যেখানে আর্তি,—সেইখানেই ছুটে যাবে এরা। প্রাণ ঢেলে সেবা করবে। আর সেবা করে ধন্য করবে নিজেদের জীবন।

সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য মহাত্মা গান্ধীও এই চেয়েছিলেন। স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশ হবে ভারতবর্ষ। কিন্তু তাঁর চাওয়া অপূর্ণ ই রয়ে গেল। সুভাষের পূর্ণাঙ্গ মনোভিলাষ গান্ধীজি জানতে পারেন নি। জানতে পারলে বুঝতেন, তাঁর চারপাশের ঐ জটিলা-কুটিলার দল যা সুভাষ

সম্পর্কে অহরহঃ তাঁর কানে তুলে তাঁর কান ভারী করতে চাইত, সেইটাই সুভাষের সব কথা নয়। শেষ কথাতো নয়ই। সুভাষ শুধু ধ্বংসেরই পূজারী নন, তিনি বিপ্লবের অগ্রদূত।

ধ্বংস আর সৃষ্টি একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে বিপ্লবী মনে। জীর্ণ ও পুরাতনের অকল্যাণ আর অন্যায়কে ধ্বংস করে বিপ্লব। সৃষ্টি করে আর প্রতিষ্ঠা দেয় নবতম নতুনকে। ডেকে আনে শুভকে, কল্যাণকে, সুন্দরকে। বিপ্লবী স্বপ্ন দেখে। সংগ্রাম করে। জেতে। আবার হেরেও যায়। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। বিপ্লব অবিনাশী। আগামী কাল ধরা দেয় বিপ্লবীর কাছে বর্তমান হয়ে। নবসৃষ্টির সম্ভাবনায় সে দুর্যোগের মহান্ধকারে হেসে ওঠে খল খল করে।

সুভাষ ও গান্ধী; বর্তমান ভারতবর্ষের এক বিচিত্র সম্ভবপরতা। একই সময়ে দু'জনের আবির্ভাব। উভয় উভয়কে ভালোবেসেছেন প্রাণভরে। উভয় উভয়কে আঘাতও করেছেন মর্মভেদী।

লক্ষ্য পৃথক। আদর্শ ভিন্ন। পথ স্বতন্ত্র।

উভয় উভয়কে জয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেননি কেউ।

গান্ধী থাকলেন গান্ধী হয়ে। সুভাষও সুভাষ।

অহিংসা আর শুচিতার শুভ্রতা নিয়ে ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ যেতে চান গান্ধী। পূর্ণ স্বাধীনতা তাই তিনি চাইতে পারেননি এক মনে আর প্রাণভরে। তিনি জানতেন তাঁর সীমা। শক্তিও। আর জানতেন দেশকে। দেশের জন-মানসকে। জীবনের প্রথম প্রভাতে গান্ধী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখবার সুযোগ পেলেন না। জীবনের এক জীর্ণ মুহূর্তে, তাই, সর্ববন্ধনহীন মহামুক্তির প্রচণ্ডতা বরণ করে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও হল না।

সুভাষ নতুন। গান্ধী পুরাতন।

সুভাষ আজকের। গান্ধী গতকালের।

সুভাষ তাই প্রাণভরে আবাহন জানালেন পূর্ণ-স্বাধীনতার। পথ ও

পাথেয় নিয়ে মনে জাগল না কোন দ্বন্দ্ব। সংশয় বড় হয়ে উঠল না চলার পথে।

পুরাতনকে অস্বীকার করে নতুনের জন্ম হয় না, সুভাষ এ-কথা জানতেন। তিনি ভালো করে জানতেন যে, গতকালের বুকে জন্ম নেয় আজ। বর্তমান।

তাই, সেই সুদূরের এক ভয়ঙ্কর আর মহাসঙ্কটের মুহূর্তেও গান্ধীর কথা সুভাষ ভুলতে পারেননি। গান্ধী-জয়ন্তী পালন করেছেন, মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যু সংবাদে বেদনা পেয়েছেন, কস্তুরবা হারা গান্ধীর কথা স্মরণ করে আর্তনাদ করে কেঁদেছেন।

গান্ধীও তাই। সুভাষের প্রথম বারের মৃত্যু সংবাদে গান্ধী বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। অধীর হয়ে উঠেছেন সুভাষের গুণ কীর্তনে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করবেন না পণ করেছিলেন। কিন্তু ভবিতব্যতা তাঁকে ধরিয়েছিল। গান্ধী পণ করেছিলেন যে, ইংরেজের দুঃসময়ে গণ-আন্দোলনের কথা মুখেও আনবেন না। কিন্তু পণ ভুলে গেলেন। কার জন্য ?

'জাতির জনক' বলে সম্বোধন করবার পর গান্ধী বলেছিলেন: "সুভাষ আর আমার মধ্যে সম্পর্ক সর্বদাই ছিল পবিত্রতম এবং সুন্দরতম। তাঁর আত্মত্যাগের শক্তি আমার অজানা নয়।"। (My relation with Subhas were always of the purest and best. I always knew his capacity for sacrifice.)

'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন জহরলাল। রাজাগোপাল, ভুলাভাই ও আজাদ জহরলালের সঙ্গে ছিলেন। গান্ধী ছিলেন একা। দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল গান্ধীর সশব্দে। সখেদে বলে ফেলেছিলেন: "আজ হামারা বাচ্চা নেহি হ্যায়।" (১)

অনেক পরের কথা। ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে। গান্ধী নোয়াখালী গিয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রতিষ্ঠা করতে। সঙ্গে ছিলেন

(১) পরলোকগত কিরণশঙ্কর রায়ের মুখে শোনা।

তাঁর ভক্ত অনেকে। আর ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের পাঁচজন সৈনিক। এঁদের সর্দার ছিলেন কর্ণেল জীবন সিং। রেডফোর্টের সর্বশেষ বিচারে এঁর মুক্তি হয়। গান্ধীর দেহরক্ষী হয়ে এঁরা অনুগমন করেন গান্ধীর। গান্ধী নোয়াখালীতে প্রায়ই অতিথি হতেন মুসলমানদের গৃহে। তারাও সমাদরে রাখত গান্ধীজিকে।

এমনি-একটা বাড়িতে। গভীর রাত। অন্ধকার। গ্রাম্য জঙ্গলে চারপাশ ঘেরা। বাইরের একখানা চালাঘরে গান্ধী থাকেন সদলে। ঘরে ছিল অনুজ্জ্বল একটি হারিকেন লণ্ঠন। মাঝখানের এক কক্ষে ছিলেন গান্ধী। সামনের বারান্দায় শুয়েছিলেন জীবন সিং।

রাত শেষ হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় জীবন সিং-এর। জেগে দেখেন ঘরে গান্ধী নেই। স্বল্পালোকিত কক্ষ। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে তন্ন তন্ন করে আনাচ-কানাচ খুঁজে দেখেন জীবন সিং। গান্ধীর দেখা নেই। বাইরে বেরিয়ে পড়েন জীবন সিং। একটা অজানা আশঙ্কায় বুক ওঁর কাঁপতে থাকে। শুকিয়ে ওঠে কণ্ঠ। দূরে উঠোনের শেষপ্রান্তে অস্পষ্ট ছায়া দেখে ছুটে যান জীবন সিং। গান্ধী বসে আছেন একা। নীরবে। আকাশের দিকে চেয়ে।

জীবন সিং পাশে বসে পড়েন। গান্ধী মৃদু আর মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করেন: "কী জীবন সিং?"

চমকে ওঠেন জীবন সিং। গান্ধী কাঁদছেন।

"বাপুজি, আপনি কাঁদছেন?"

গান্ধী নির্বাক। একখানা হাত রাখেন জীবন সিং-এর গায়ে। বলেন: "জীবন সিং, আমার তপস্যা ব্যর্থ হয়ে গেছে।"

বিস্ময় কি এতও জমেছিল জীবন সিং-এর জন্য? বলেন: "সে কি কথা বাপুজি?"

"হাঁ জীবন সিং, সত্য। আমার সব আশাই মিথ্যে হয়ে গেলো। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় মাতলো। অস্পৃশ্যতা তেমনি রইলো। চরকা অচল হয়ে গেলো।"

ফিস ফিস করে বলছেন গান্ধী। চারপাশের নির্জন স্তব্ধতা আরও ঘন হয়ে ওঠে। গান্ধী আবার বলে ওঠেন: "আমাকে কেউ বুঝলো না জীবন সিং।"

আবার চমকে ওঠেন জীবন সিং। কেউ বোঝেনি? অদ্বিতীয় জহরলাল? লৌহমানব প্যাটেল? মৌলানা? রাজেন্দ্রবাবু?

"না জীবন সিং, কেউ বোঝেনি ওরা। বুঝতো একজন। সে নেই।" একজন? কে সে? জীবন সিং উন্মুখ হয়ে ওঠেন। গান্ধীজির ধারে আরও সরে আসেন। তারপর বলেন: "কে সে বাপুজি?"

ধীরে গান্ধীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে: "সুভাষ।"

নেতাজির জন্মদিনের এক সভায় উপস্থিত ছিলেন জীবন সিং। সভাশেষে জীবন সিং বলেছিলেন আমাকে এই আশ্চর্য রাত্রিটির কথা। বলতে বলতে শেষটায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন জীবন সিং। চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় শেষ করলেন: "আমার নেতাজি তো এ-কথা জেনে গেলেন না বাবুজি।" (১)

এই গান্ধীকে নেতাজি বলেছিলেন জাতির জনক।

৬ই জুলাই, ১৯৪৪। (গান্ধীজির এই নিঃসঙ্গ মনোভাবের খানিকটা আভাষ দিয়েছেন শ্রীসুধীর ঘোষ, তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৯৪৬-এর কোনও ঘটনার আলোচনা কালে তিনি লিখছেন:..."তিনি তখন কোনও মানুষের উপরে নয়, একমাত্র ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে চাইছিলেন।" বস্তুত অনেক আগে থেকেই গান্ধীর এই নিঃসঙ্গ জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল।)

(১) কর্ণেল জীবন সিং শেষ পর্যন্ত গান্ধী স্মারকনিধির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই অধ্যায়টি লেখা শেষ হবার পর গত ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৬, জীবন সিং দেহত্যাগ করেছেন।

॥ দশ ॥

আচমকা অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করে: "শত্রুপক্ষ আরাকান ফ্রণ্টে পিছু হটছে। আমাদের সৈন্য এগিয়ে চলেছে।"

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। নেতাজির বাংলোতেও।

নেতাজির ঘরে পরামর্শ সভা বসেছে। এসেছেন বড় বড় জেনারেল। টেবলের ওপর ম্যাপ খোলা। একাগ্র তন্ময় নেতাজি। রাস্তার খুঁটিনাটি জেনে নিচ্ছেন।

ভ্রূক্ষেপও নেই। জয় আর পরাজয়,—কে হিসাব রাখে তার? যেতে হবে এগিয়ে। ইম্ফল কতদূর?

৫ই এপ্রিল, নেতাজি রওনা হলেন ফ্রণ্টে।

যুদ্ধের ধারে কাছে থাকতে হবে। সঙ্গে চলল একদল রাণী বাহিনীর সৈনিক। ইম্ফল লক্ষ্য করে বিদ্যুদ্বেগে এগিয়ে চলেছে আজাদী সৈন্য। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলেছে ফৌজ। আটটি কেন্দ্রে এক সঙ্গে আর একই সময়ে আঘাত হেনেছে।

মোরাই আর কোহিমা গ্রাম দখল করে নিয়েছে আজাদী ফৌজ। দিয়েছে ভেঙ্গে ডিমাপুরের সড়ক। শত্রুর চলাচল থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে প্যালেল বিমান-ঘাঁটি। ওটা দখল করতেই হবে। তারপর?

কিন্তু নিঃশেষ হয়ে গেছে রসদ। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুর বিমান আসছে। ছোঁ মেরে নীচে নেমে আগুন ছড়িয়ে দেয় ওরা। তারপর চলে যায়। আজাদী ফৌজের বিমান নেই। খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছে। সরবরাহের সংযোগ তছনছ করে দিয়েছে শত্রু-বিমান।

জাপানীরা বিমান দিল না। দিল না রসদ। দিল না ট্রাক।

দেখিয়ে দিল ইম্ফল। বলে দিল, ওখানে অনেক খাদ্য, অনেক অস্ত্র, অনেক রসদ মজুত করা রয়েছে।

তবু পিছু হটেনি আজাদী সৈন্য। দলে দলে নতুন আমেরিকান সৈন্য আসছে। আজাদী ফৌজ বার বার ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। মেরেছে। নিজেরা মরেছে।

হাতাহাতি যুদ্ধে আজাদী সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ। শত্রু ভড়কে যায়। সত্যিই ওরা বাঘের বাচ্চা।

আরাকান ফ্রন্ট থেকে ইংরেজের ৭ম বাহিনী ছুটে আসে। জেনারেল স্টপফোর্ডের অধীনে আসে ৩৩ সংখ্যক বাহিনী। আর আসে জেনারেল উইন গেটের আনকোরা নতুন সৈন্যদল।

"আসামের কোহিমা সহরের উপকণ্ঠে আক্রমণ প্রতিহত হয়। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষে হাসপাতালের রোগীরাও অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিল।

"৪ঠা এপ্রিল (১৯৪৪) আক্রমণ শুরু হয়েছিল। পিছু হটে আসে মিত্রপক্ষ। শেষ আশ্রয় বেছে নেয় একটা ছোট টিলা। প্যারাসুটের সাহায্যে সেখানে রসদ জোগাতে হয়েছে। প্রায় শেষ মুহূর্তে, ২০শে এপ্রিল, বাইরের সাহায্য আসতে শুরু করে। ইম্ফলের পতন হতে হতে ইম্ফল বেঁচে গেল।

"মিত্র পক্ষের ষাট হাজার সৈন্য, অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এবং অগুনতি বিমান নিযুক্ত হয়েছিল ইম্ফলের যুদ্ধে। মে মাসে হল চূড়ান্ত সংগ্রাম।

"মোগাং-মিটকিনা ফ্রন্ট ছিল জাপানীদের নিজস্ব ও একক তত্ত্বাবধানে। সেখানে জাপানীরা অনেকদিন লড়াই করে শেষকালে পিছু হটতে বাধ্য হল। মিটকিনার বিমান-ক্ষেত্র মিত্রপক্ষ অতর্কিত আক্রমণে দখল করে নেয়।" (চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্ব সমর,—পঞ্চম খণ্ড)

খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা এসে গেল। এবং এল তার ভীষণ তীব্রতা নিয়ে। ইম্ফলের তিন মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল মুক্তি-ফৌজ। বিমান তাদের ছিল না। ছিল না খাদ্য, রসদ এবং উপযুক্ত অস্ত্র।

পার্বত্য এলাকার দুর্গম পথ, ততোধিক দুর্গম ও খামখেয়ালি নদী। আকস্মিক এবং আগাম বর্ষার দাপটে আরও হয়ে উঠল দুরতিক্রম্য।

অসংখ্য পোকা-মাকড় ও হিংস্র জোঁকে বনভূমি ও পাহাড়-পর্বত ছেয়ে গেল।

সংযোগ-ব্যবস্থার ঘটল চরম বিপর্যয়। হাঁটাপথে এবং স্বল্পতম ট্রাকে রসদ জোগানো হয়ে উঠল অসম্ভব।

নিরুপায় আজাদী সৈন্য দলে দলে মরল কিন্তু পিছু হটল না। বিষেণপুর আর প্যালেল শত শহিদের রক্তে ভিজে গেল। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে থাকে রক্তাক্ত বিষেণপুর, আর প্যালেল। বুকে ওদের গভীর ক্ষত। চারপাশে ছড়ানো শহিদের অস্থি।

জলে ভেসে গেল তাঁবু। ভিজে গেল রসদ। পচে গেল ভেজা খাদ্য। ট্রেঞ্চ খোঁড়বার উপায় নেই। খোঁড়া ট্রেঞ্চও জলে বোঝাই হয়ে গেল। চারিদিকে কেন্নো, কেঁচো, পোকা, জোঁক কিলবিল করে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে মাছি। গায়ে বসে। রক্ত শুষে খায়। আজাদী সৈন্য অস্থির হয়ে ওঠে। রোগ দেখা দেয় ক্যাম্পে। ওষুধ নেই। পথ্যেরও অভাব।

পিছু হটবার হুকুম আসে।

আজাদ বাহিনী ও জাপানী সৈন্য তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের। কি ভীষণ সঙ্কটে তারা পড়েছিল, বোঝা যাবে মাউণ্টব্যাটনকে লেখা চার্চিলের একখানা চিঠি থেকে। চার্চিল লিখছেন: ‘‘সৈন্যাধ্যক্ষরা (the chiefs of staff) ইম্ফলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।...যদি অনতিবিলম্বে রিজার্ভ সৈন্য না পাঠানো হয়, মিটকিনা কিম্বা ইম্ফল রক্ষা করবার আর কোন উপায় থাকবে না।” (চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর—৫ খণ্ড)

শেষ বার্তা গেল মাউণ্টব্যাটনের কাছ থেকে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তাতে লেখা ছিল: “ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা, মনে হয়, বিদূরিত হয়ে গেল। এবং বার্মায় মিত্রপক্ষের বিজয়ও সূচিত হলো এখানেই।” (চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর, পঞ্চম খণ্ড)

১১ই জুলাই, ১৯৪৪। শেষ দিল্লী-সম্রাট বাহাদুর শাহ্-এর সমাধি ক্ষেত্রে আজাদী সৈন্যের প্যারেড হল। নেতাজির বক্তৃতা হল। এখানেই তাঁর কণ্ঠ থেকে একটি ঐতিহাসিক বাণী নির্ঘোষিত হয়েছিল: "কমরেডস, ভারতবর্ষ আজ চায় প্রতিহিংসা। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজ স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসীর রক্ত মোক্ষণ করেছে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, পরন্তু শান্তি-ঘেরা পারিবারিক জীবনের একান্ত নিরীহ গৃহও তাঁর রক্তাক্ত আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। সন্তানের রক্তে মায়ের স্নিগ্ধ কোল ভিজিয়ে দিয়েছে। আজ তার প্রতিশোধ নেবার দিন। বদলা নেবার সময়। আমরা ভারতবাসীরা শত্রুকে যথেষ্ট ঘৃণা করতে পারিনে। জানিওনে। ভারতবাসীকে সঙ্কট-মুহূর্তে সত্যিই যদি উঠে দাঁড়াতে হয় সিংহের মতো, অকুতোভয় দুর্জয় পণ আর বীর্য সম্বল করে যদি তার জীবনে দেখাবার বাসনা থাকে প্রদীপ্ত বীরত্ব, মাতৃভূমিকে ভালোবাসাই যথেষ্ট হবে না, তার শত্রুকে ঘৃণা করতেও শিখতে হবে।

'আজ, তাই তোমাদের কাছে দোস্ত, রক্ত চাই। একমাত্র শত্রুর লাল রক্তই অতীতের সব বেদনা মুছে দিতে পারবে। পারবে বেদনাহত অতীতকে ভুলিয়ে দিতে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না বন্ধু একটি কথা: রক্ত নিতে পারে সেই, যে রক্ত দিতে জানে। আগে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে রক্ত দিতে। অঞ্জলি ভরে রক্ত। হৃৎপিণ্ডের রক্ত। রক্তে স্নান করে আমরা অতীতের সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হবো।"

বোবা অতীত পাশ ফিরে তাকাল না?

অর্থহীন সাম্য, অক্ষম উদারতা ভীরু দার্শনিক কপটতা জাতি উগ্‌রে গেছে নিজের অজ্ঞাতে। বিজেতার স্তাবকতায় মোহমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছে দাসত্বের গৌরব; পরাধীনতার চেতনাহীন শান্তিকে আঁকড়ে ধরেছে পরম প্রাপ্তি বলে; অন্নহীন অনাহার নিয়ে মিথ্যা গর্বে আটকায়নি কোনদিন; সর্বোপরি নিবীর্য ক্লীবত্বের নিরুপায় গৈরিক বৈরাগ্যের জয়ধ্বনি করেছে শতাব্দির পর শতাব্দি। সেই জাতির কানে শত বৎসর পর এক নতুন গীতা প্রচারিত হল মুক্তি-সমরাঙ্গনের রক্তাক্ত বেদী থেকে।

মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়ে অমরত্বের এই আবাহন উপেক্ষা করবে কে ?

এগিয়ে এল শত শত প্রাণ।

নতুন উদ্যমে উদ্যোগ শুরু হল দ্বিতীয় অভিযানের।

চাই শত শত জোয়ান। চাই তাদের, যারা মৃত্যুপণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। চাই অর্থ, জোয়ানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে। সৈনিকের রসদ দিতে। দিতে খাদ্য।

ফৌজ ও নাগরিকের পার্থক্য কিছু আর থাকল না। এক হয়ে গেল। এগিয়ে এল সবাই। কেউ রাইফেল নিল হাতে তুলে। কেউ সর্বস্ব তুলে দিল নেতাজির হাতে।

আহত সৈনিক ভুলে গেল তার ক্ষত। ফিরে যেতে চায় যুদ্ধক্ষেত্রে। জীবন আর মৃত্যুর এক বিপুল সমারোহ। এক হয়ে গেল বাঁচা আর মরা।

মিত্রপক্ষের বোমা বর্ষণ সুরু হয়েছে। আগে বিমান আসত দু-একখানা। এইবার আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। রেঙ্গুন ওরা পুড়িয়ে দেবে। আজাদ হিন্দ হাসপাতাল আগুনে বোমা ফেলে ওরা ছারখার করে দিল। শত শত আহতের আর্তনাদে ভরে গেল আকাশ বাতাস।

হাসপাতালের মাথায় বড় বড় করে লেখা ছিল "হাসপাতাল"; রেড ক্রস্ আঁকা ছিল গায়ে। সভ্যতার বড়াই করে ওরা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা। এই ওদের সভ্যতা আর বীরত্ব। ছুটে গেলেন নেতাজি। সেই বোমা বৃষ্টির মধ্যে আহত ও রোগীদের সেবায় নিজে লেগে গেলেন আর সকলের সঙ্গে। উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে সবাই নেতাজির জীবনের জন্য। অগ্নিশুদ্ধ তাপস—আগুনের ভয় করেন না। মুখে বলেন: "ইংরেজ আজো এমন বোমা তৈরি করতে পারেনি, যা আমাকে মারতে পারে।"

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪। শহিদ দিবস। জুবিলি হল মানুষে মানুষে বোঝাই হয়ে গেছে। বক্তার পর বক্তা বলে চলেছে শহিদদের জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের কাহিনী। আঁধার ঘেরা ভারতবর্ষের বুকে

আকাশ থেকে নেমে এসেছিল একদল মুক্ত বিহঙ্গ। কণ্ঠে ছিল মুক্তির অনাহত নাদ। দেশের আর কারও সঙ্গে তাদের মিল ছিল না। পাখির কাকলি সহসা থেমে গেল। সেই কণ্ঠেই ধ্বনিত হল অগ্নিবীণা। আগুনের পরশমণি তারা ছড়িয়ে দিল দেশ ও জাতির নিবিড় কালো বুকে। জ্বলে উঠল আলো। আগুন। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনে নিজেরা।

অশান্ত উদ্দাম ভয়ঙ্করের পূজায় মেতে উঠেছিল ভৈরবের দল। নিজের ছিন্ন মুণ্ড নিজের হাতে নিয়ে দেশমাতৃকার চরণপ্রান্তে রাঙ্গাজবার অঞ্জলি দিয়েছিল। শ্যামা বাংলার শান্ত অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওদের সঙ্গে পুরঙ্গনা। কুসুম পেলব হাতে তুলে নিয়েছিল অগ্নি-নালিকা। শত্রুকে ক্ষমা ওরা করেনি।

ডুকরে কেঁদে ওঠে জনসমুদ্র। উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রাণ।

আজাদী সৈন্য রণক্ষেত্রে নিজ প্রাণ আহুতি দিয়ে চলেছে কাতারে কাতারে। বিষেণপুর, পালাল, বুথিডং আর কালাদান হাঁ করে চেয়ে থাকবে ভবিষ্যতের নির্বাক মৌন ইতিহাসের দিকে। কালা ইতিহাস। বোবা ইতিহাস। মিথ্যার জঞ্জাল বুকে করে গাইবে আর কইবে অনেকের কথা। কিন্তু ভুলে যাবে তাদের।

নেতাজির কণ্ঠ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে আগুনের ঝলকানি: "খুন, শুধু খুন। মুক্তির দেবী প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছেন; আঁজল পুরে দাও লাল রক্ত। নিজের কণ্ঠ ছিঁড়ে মালা পরিয়ে দাও মায়ের গলায়। আত্মাহুতির প্রতিযোগিতায় তোমরা এগিয়ে এসো। এসো বিদ্রোহী নারী, এসো বিদ্রোহী নর। তোমরা আমাকে খুন দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো।"

গড়ে উঠল সেইখানে আত্মাহুতি ফৌজীদল। সুইসাইড স্কোয়ড্।

সেই-দিনের সেই জনতার মহামেলায় এক অস্থির পাগল মেতেছিল প্রচণ্ড ব্যাকুল কল্পনায়। সঙ্গে ছিল সর্বহারার পাল। ঘর তারা পুড়িয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। সংসারের পিছু ডাক, প্রেয়সীর অশ্রু

তাদের ফেরাতে পারেনি। ভবিষ্যৎকে নিজের মুঠোয় ধরে পিষে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। মানা মানেনি কারও। নিষেধ শোনেনি। বিজ্ঞজনের সদুপদেশ কানে তোলেনি। অশান্ত উন্মাদনায় সর্ব বন্ধন, সর্বস্বার্থ উপেক্ষা করে খুঁজতে বেরিয়েছিল হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা।

মাহেন্দ্রক্ষণের প্রত্যাশায় দিন তারা গোনেনি। ভালোমন্দ হিসেব-নিকেশ পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। নিজের কল্যাণ নিজের পায়ে দলে তারা ছুটে গিয়েছিল সীমাহীন অন্ধকারের বুকে। রাত্রির তপস্যায় তারা ডুবে গেল। মৃত্যুর অমৃত পথে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিল। ফিরে আর এল না হয়ে রইল মৌন মূক অন্ধ অতীত।

ইম্ফলের পথে দ্বিতীয় অভিযান শুরু হল।

নতুন বছর, ১৯৪৫।

নেতাজির কোন বাধাই কেউ মানল না। সবাই মেতে উঠল উৎসবে। নেতাজির জন্মোৎসব পালন করবে সারা রেঙ্গুন সহর। ২৩শে জানুয়ারী। জুবিলি হল-এ উৎসবের আয়োজন হল। লোক আর লোক। নিমেষে হল ভরে গেল। কাতারে কাতারে মানুষ এসে প্রাঙ্গন দিল ভরে। সবাই-এর হাতে উপহার।

রূপোর থালা ভরে দেয়া হল সোনা, হীরে, মাণিক্য। মুক্তি-যুদ্ধের রসদ। রেঙ্গুনের মুথিয়া চেট্টিয়া সংগ্রহ করে আনলেন কয়েক লক্ষ টাকা। গানে আর জয়ধ্বনিতে, হাসি আর আনন্দে, মুখরিত হয়ে উঠল সমগ্র জনপদ। ফুলে আর মালায়, বিচিত্র বসন আর ভূষণে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল হল আর প্রাঙ্গণ।

পরদিন নেতাজি চলে গেলেন ফ্রন্টে।

এই ফ্রন্টের সেনাপতি ছিলেন মেজর শা'নওয়াজ। তাঁর সঙ্গে ছিল আই, এন, এ-র দ্বিতীয় ডিভিসন। পরে গিয়েছিলেন কর্ণেল শেগল ও মেজর ধীলন। এই ফ্রন্টের অনেক কথাই শেগল আর ধীলনের বিবৃতিতে এবং শা'নওয়াজের বই-এতে প্রকাশ পেয়েছে। এঁদের

'ডেসপ্যাচ্' পরবর্তী কালে রেড ফোর্টের মামলায় দাখিল করা হয়েছিল। নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে আজাদী সৈন্যের মরণ-পণ সংগ্রাম, আত্মদানের অবিশ্বাস্য বিবরণ, দেশ-প্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত এবং অধিনায়ক নেতাজির প্রতি তুলনাহীন অনুরাগ হয়তো আজকের ভারতবর্ষ ভুলেই যাবে, কিন্তু এই চিরায়ত আত্মবলিদান-মহিমা জাতির অক্ষয় কবচের মতোই সেই দিনের জন্য গচ্ছিত থাকবে, যেদিন জাতি বর্তমানের এই সঙ্কটময় আত্মবিস্মৃতির কবল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পাবে।

জীবন ও মৃত্যুকে জ্ঞান করেছিল ওরা এক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ওরা মূর্ত ইতিহাস।

কিন্তু ভাগ্য ঢলে পড়েছে মিত্রপক্ষের দিকে। মিটকিলা দখল করে শত্রু সৈন্য পীনমানার দিকে এগিয়ে চলেছে।

এবার কি রেঙ্গুন ? আমেরিকার নতুন সৈন্যে ছেয়ে গেল রণক্ষেত্র। ইওরোপের সংগ্রাম শেষ হবার মুখে। শত্রু অনেকখানি নিশ্চিন্ত। ভারতীয় সৈন্য আসছে দলে দলে। ইংরেজের হাতে-গড়া ভারতীয় সৈন্য।

এও ভাগ্যের এক চরম পরিহাস।

ইংরেজ মাথাকুটে সৈন্য বাড়াতে পারেনি। যুদ্ধের গোড়ায় ইংরেজের সৈন্য সংগ্রহের হার ছিল খুবই মন্দ। কংগ্রেসের দোদুল্যমান অভিপ্রায় তখনও ছিল অজানা। গান্ধীর একদিন এক কথা, পরদিনই তা ভিন্ন হতে থাকে ; জহরলালের তো কথাই নেই। গোড়া থেকেই জহরলাল অন্তত এই একটি বিষয়ে ছিলেন সংলগ্ন ও একাগ্র। কোনক্রমে এবং কখনই ইংরেজপ্রীতি তাঁর হ্রাস পায়নি। সর্বোপরি কংগ্রেসের নানা ব্যাখ্যাও বায়নাক্কা। ১৯৪১ পর্যন্ত কংগ্রেসের কোন সুনির্দিষ্ট সঙ্কল্পের আভাসই মালুম হল না। যদিই-বা ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ চালু হল, দেশবাসীর যৎসামান্য বা নামমাত্র সাড়া পাওয়া যেতে-না-যেতে আবার নানা দার্শনিক ব্যাখ্যায় নেতারা উঠলেন মেতে। ইংরেজ তাল সামলে নিল।

এর মধ্যেই ইংরেজ তৈরী করে ফেলল দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ। পেটের দায়ে এবং বাধা না পাওয়া প্রচার মহিমায় ইংরেজ এগিয়ে যেতে লাগল

জোর কদমে। পাঁচ লক্ষের জায়গায় ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে দাঁড়াল পঁচিশ লক্ষ।

ইংরাজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শত্রুর দুর্যোগের অন্ধকারে দেশের মুক্তি-কামনা সংগোপনে মাথা খাড়া করতে হয়তো চেয়েছিল। সে-চাওয়া অকালে মরে গেল। সেই দিনের নেতাদের অবিমৃষ্য সিদ্ধান্ত ও পরাঙ্মুখ আত্মপ্রত্যয় ইরেজের সুদিন তৈরী করে দিল। তারই অবারিত নিঃসংশয় সুযোগ ইংরেজকে দিল এই বিপুল সৈন্যদল তৈরী করবার অবকাশ। আর তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্ব-সীমান্তের রণাঙ্গণে দলে দলে। ওরা বুঝল না, জানতে চাইলও না যে, তারা নিজের রুধির অজ্ঞানের মতো নিজেই পান করে চলেছে আকণ্ঠ।

কিন্তু ওরাই কি শুধু বুঝল না? যাদের বোঝবার কথা ছিল সর্বাগ্রে, তারাই-বা বুঝল কৈ? পচা গলা শবের মতো সারা দেশ পড়ে থাকল মুখ থুবড়ে। একটিবারও কি কারও প্রাণে ভেসে উঠেছিল সেই মানুষটির কথা, সেই সুদূর বিদেশের মায়াহীন এক রক্তঝরা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যে থাকল পড়ে অসহায় হয়ে?

না, জাগেনি। এবং সেদিনের সেই বিমূঢ় বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতিঘাত বহুগুণ হয়ে নেমে আসবে এবং এসেছে জাতির বক্ষে। পরিত্রাণ নেই। নেই ক্ষমা। প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রায়শ্চিত্ত।

নরম্যাণ্ডির উপকূলে অবতরণ-উদ্যোগ সমাপ্ত। মিত্রপক্ষ নাম দিয়েছে 'ডি, ডে'।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে রাশিয়া। নেতা নয়, হুকুম নয়,—সমগ্রজাতির প্রতিশোধ কামনা রূপ পরিগ্রহ করে এগিয়ে আসছে বিরাট প্লাবনের মতো। দেখা যায় জার্মানীর প্রত্যন্ত।

বদলা নেবার ক্ষণ এল ইংলণ্ডের। বদলা নিল রাশিয়া। ভারতবর্ষ?

নিজের চিতার ওপর দাঁড়িয়ে হিটলার তৈরী হয়েছেন নিজের মুখাগ্নির জন্য।

নেতাজি পূর্ব রণাঙ্গনে পৌঁছবার পূর্বেই জাপানী বিমান-বহর তৈরী হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্তত কয়েকটি বড় বড় সহরে বোমা ফেলতে। মিত্রপক্ষের মূল সরবরাহ ঘাঁটি কলকাতা। জাপানীরা বার চারেক বোমা ফেলেছিল কলকাতায়। মারাত্মক বোমা পড়েছিল খিদিরপুর ডকে। বোমা পড়ল রসদ বোঝাই জাহাজে, মাল গুদোমে, ডকের ওপর। মানুষ মরল অগুনতি। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ওদের গুদোম, রসদ, ছাউনি। আগুন জ্বলে উঠেছিল স্থানে স্থানে।

বোমা পড়েছিল ডালহৌসী স্কোয়ারে আর হাতিবাগানে। আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল সারা কলকাতা। এমনিতেই পথের সব আলো নিভে গিয়েছিল নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থায়। বাড়ির আলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল কালো টুপিতে। নিরন্ধ্র কালো পরদায় ঢাকা এক প্রাণহীন কলকাতা। পথে পথে ব্যাফল ওয়াল, পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ, বাড়িতে বাড়িতে কাপড়ের ক্রশ আটা কাঁচের জানালা। বিবর্ণ, কালশিরা পড়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক স্থবির কলকাতা। বোমা পড়তেই কলকাতা ছাড়বার হিড়িক পড়ে গেল। সে এক বীভৎস দৃশ্য। প্রাণভয়ে ছুটে পালাবার প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে উঠল গোটা সহর। পল্লীর অবহেলায় পড়ে থাকা পিতৃপুরুষের জীর্ণ গৃহ, ভুলে যাওয়া দূর দূরান্তের সম্পর্কহীন আত্মীয়ের নিরাপদ অঞ্চল-ছায়া, আরও দূরের নিস্তব্ধ পাহাড়তলী জন-সমাগমে অকস্মাৎ জেগে উঠল। মুখরিত হল কোলাহলে। কলকাতার রাজপথ স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হতে থাকল। সন্ধ্যা নামে, তার সঙ্গে নামতে থাকে আঁধারের কালো ছায়া প্রেতের মতো। আঁৎকে ওঠে তাদের প্রাণ, যারা পড়ে থাকল নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে। নিত্য কলরব মুখরিত গোটা কলকাতা আর চারপাশের ছোট-ছোট সহরতলী ধীরে ধীরে গোরস্থান হতে থাকে।

জাপানীরা সত্যিই কি কলকাতা গুঁড়িয়ে দেবে ?

শ্বেতাঙ্গরা কাঁপতে থাকে থর থর করে। ওদের পালাবার পথ তৈরী হতে থাকে। তৈরী প্ল্যান হাতে ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেব করে

গাড়ির নম্বর টুকে নেয় খাতায়। সমগ্র বাংলার নৌকো, গাড়ি, এমন কি সাইকেলেরও হিসেব হয়।

প্রধান প্রধান ব্রীজের তলায় বসানো হয় ডিনামাইট; ছোট-গুলোও হিসেব থেকে বাদ পড়ে না। পালাবার পথে যেন বাগড়া না পড়ে। শত্রু যেন সহজে পেছন থেকে তাড়া না করতে পারে।

শুধু কলকাতা নয়,—ওরই সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মাদ্রাজ, জামসেদপুর; এই ছিল জাপানীদের সঙ্কল্প। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালেন নেতাজি। বিদেশীর বোমায় নিজের মাতৃভূমির রক্তমোক্ষণ তিনি কোন ক্রমেই অনুমোদন করবেন না। খুবলে খেতে দেবেন না নিজের মাতৃ-দেহ। যদি সম্ভব হয়, আজাদী সৈন্য ইংরেজের সকল দর্প আর দম্ভ চূর্ণ করে মায়ের হাত-পায়ের জিঞ্জির ছিঁড়ে দেবে; বন্ধন দশার অবসান ঘটাবে। না পারে, মরবে। তাই বলে অসহায় দেশবাসীকে বন্য পশুর মতো মারবে জাপানীরা? না।

সে না আর হাঁ হল না। (....he has prevented the Japs from bombing Calcutta, Jamshedpur, Madras and other thickly populated areas out of enistence). (১)

নেতাজি সেদিন বাঙালীকে বাঁচিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি জনপদ নিশ্চয়ই বিপন্মুক্তও করেছিলেন। এবং এ সবই হয়তো করেছিলেন সুভাষ বোস হিসেবেই। নেতাজি নয়। শিপাহ্সালার নেতাজির এই ভাবপ্রবণতা কি ভুলেরই নামান্তর নয়? সামরিক-সমস্যা এবং রণ-নীতি কি তাঁর এ-সমাধান ত্রুটীহীন বলতে চাইবে?

যুদ্ধে মানুষ মরবেই। ছাড়খার হবেই দেশের অংশ। দুর্যোগ ও দুর্দশাও ভিড় করে আসবেই চারপাশ থেকে। আসবে এরা,

(১) ভারতের বিদ্রোহী কন্যার রোজ নামচা—'জয়হিন্দ'

আসবে আরও অনেক কিছু। কিন্তু থাকবে না। একদিন সকল দুঃখের, সকল দুর্দশার অবসান হবে। এ দুর্দশার চাইতেও বড় দুর্দশা পরাধীনতা। সেই পরাধীনতার টুঁটি টিপে মারতে গেলে এ দুঃখকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অস্বীকার করতে গেলে গান্ধীকে মানতে হয়, সুভাষ বোসকে নয়।

কিন্তু গান্ধীর দীর্ঘদিনের শান্তির সান্ত্বনাকে উপেক্ষা করেই সুভাষ সংগ্রাম ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। শান্তি চাননি। চাননি শান্তিতে জীবন বাঁচাতে। সহসা তিনি দুঃখের সাক্ষাৎ-আশঙ্কায় ভয় পেলেন কেন?

জাপানী বোমায় বাঙালী মরবার সুযোগ পেল না,—মরল দুর্ভিক্ষে। পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী পথের হন্যে কুকুরের মতো মৃত্যু বরণ করে নিল পরম সহিষ্ণুতায়। নেতাজি জপানীদের ঠেকিয়েছিলেন কিন্তু ঠেকাতে পারেননি দুর্ভিক্ষের চাইতেও নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ইংরেজকে। ইংরেজ বাঙালীকে মেরেছে নিজের প্রয়োজনে। খেতে না দিয়ে মেরেছে নিজের সৈন্যদের খাওয়াতে। বাঙালীর মুখের আহার কেড়ে নিয়ে বাঙালীকে মেরেছে নিজেকে বাঁচাতে।

সেদিন কলকাতা যদি পুড়ে খাক হয়ে যেত, সাঁড়া ব্রীজ যদি উড়িয়ে দেয়া হত, অমন সহজে ইংরেজ ইম্ফলে তার দুর্গ দুর্ভেদ্য করে তোলবার সুযোগ পেত না। আর অমন অবহেলায় ১৯৪৫-এর দুর্ভাগ্য হয়তো দেখা না দিতেও পারত।

সহস্র বৎসর ধরে একটা জাত প্রাণপণে যোগাভ্যাস করল সহিষ্ণুতার। শান্তির। তরোরিব সহিষ্ণুতা। ভারবাহী জানোয়ারের সহিষ্ণুতা। তৃণাদপি নিচু হয়ে লাথি খেতে শিখিয়েছিল ধর্মগুরু। অমানীদের পাদোদক খেতে ফরমান দিল শাস্ত্র। রক্তে রয়েছে এই ইসারা। শিরায় বইছে সেই অনুজ্ঞার অলঙ্ঘ্যতা।

সুভাষ বোসও কি সেই মুহূর্তে তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি?

পরবর্তীকালের নেতাজিকে দেখে কিন্তু মনে হয় না যে, নিছক

ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে তিনি জাপানীকে বাধা দিয়েছিলেন। সেদিনকার নেতাজি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি, ফৌজ আর সাংগঠনিক কাঠামোও এমন দৃঢ় হয়নি যা নিয়ে সেই মুহূর্তে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন শত্রুর বুকে। পূর্বাহ্নেই যদি জাপানীরা ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে, যদি ইংরেজ পালিয়ে যায়, যদি জাপানীরা দখল করে নেয় ভারতের একটি বিশেষ অংশ,—তাকে হটানো, তাকে অপসারিত করা কি খুবই সহজ হবে? এই চিন্তাই কি সেদিন নেতাজিকে অমন করে উদ্বুদ্ধ করেছিল? বিজেতা ইংরেজের হাত থেকে আর একটি নতুন বিজেতা,—জাপান, ভারতবর্ষের প্রভু হয়ে বসবে এবং ইংরেজের মতোই আবার শতবর্ষ সেই প্রভুত্ব রাখবে অমর করে, এই ভয়ই কি জেগেছিল নেতাজির অন্তরে? (বস্তুত নেতাজি কেন সেদিন জাপানীকে বাধা দিয়েছিলেন, তার সঠিক কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। এবং নেতাজির মনে ভবিষ্যতের কোন দুর্ভাবনা জেগেছিল কিনা, তাই-বা কে বলবে? যদি জেগেই থাকে, জহরলাল-আজাদ প্রভৃতির মানস-ভঙ্গীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তার খানিকটা সাদৃশ্য কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন। কিন্তু এই উভয় ভঙ্গীর বিরোধ-পার্থক্য বিলক্ষণ। একজন চেয়েছেন বর্তমান প্রভুত্বের অবসান ও ভবিষ্যৎ-দুর্যোগ-সম্ভাবনার গতিরোধ করতে; অপর পক্ষ বর্তমানকে কায়েমী করে শুধু রুখতে চেয়েছেন ভবিষ্যৎকে। অর্থাৎ বর্তমানে ইংরেজ থাক, কিন্তু জাপানকে রুখতে হবে।)

নেতাজির পূর্বাঞ্চলে আসবার পূর্বাহ্নে হয়তো জাপানীদের এই প্রকার মনোভিলাষই ছিল। এবং পরবর্তীকালে কাইকান-আচরণ নেতাজির এ-আশঙ্কা দৃঢ় করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৪৩-এ জাপানী-মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল, এ-কথাও সত্য। কিন্তু তখন পরিস্থিতি আয়ত্বের অনেকটা বাইরেও চলে গেছে।

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আজাদী ফৌজের প্রথম আক্রমণ শুরু হয়। মার্চ মাসেই পূর্বাঞ্চলে বর্ষার আগমনী দেখা দেয়। শত্রু সুদৃঢ়

ঘাঁটি নিয়ে আছে সযত্নে তৈরী করা স্থানে। তাদের পথ ভালো, যান-বাহন ভালো,—ভালো আরও অনেক কিছুই। অপর পক্ষে দুর্গম বিপথে ও অপথে যেতে হবে আজাদী সৈন্যকে ; পথ তৈরী করে এগোতে হবে। তারই মাঝখানে দেখা দিল অসময়ের প্রবল বর্ষা।

কালাদান ও আরাকান ফ্রণ্টে শত্রু এগোতে পারেনি। টিড্ডিমে ওরা পিছিয়ে গেছে। কোহিমা ও প্যালেলের অবস্থাও ছিল আশাপ্রদ। হাকাতে শত্রু থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সবই বিফল হয়ে গেল অকাল বর্ষার প্লাবনে।

নেতাজি আশা করেছিলেন, বর্ষার পূর্বেই ইম্ফল দখল করা সম্ভব হবে। হল না।

আজাদী ফৌজের সব চাইতে অভাব ছিল প্রচার-যন্ত্রের। সামনের সারিতে বসাবার মতো মাইক মেলেনি। আজাদী সৈনিকের কণ্ঠ পৌঁছোল না ইংরেজের পোষা ভারতীয় সৈনিকের কানে। যদিই-বা কানে তাদের গেল, ইংরেজ তাদের বুঝতে দিল না সে-ডাকের তাৎপর্য। অবস্থা ঘোরালো হতেই ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নিল পেছনে। সামনে দিল হাবসী, নিগ্রো, গুর্খা আর শ্বেতাঙ্গ।

দ্বিতীয় অভিযানের প্রাক্কালে নেতাজি বিশেষ যত্ন নিয়ে প্রথম অভিযানের ত্রুটী সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। নিজেই বলেছেন: “আমাদের গলদ ছিলো। এবং আমরা তা ধরতেও পেরেছি। পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিলো। পরিবহন ঠিকমতো চালাবার উপযুক্ত লোক আমাদের ছিলো, কিন্তু যান-বাহন ছিলো না। আর একটি বড় ত্রুটী ছিলো আমাদের প্রচার ক্ষেত্রে। লাউড স্পীকার আমাদের ছিলো না ; চেয়েছিলাম জাপানীদের কাছে, তারা দেয়নি। এবার আমরা নিজেরাই লাউড স্পীকার তৈরী করে নিয়েছি। ফৌজের প্রতিটি অংশের সঙ্গে থাকবে লাউড স্পীকার।”

হুড়মুড় করে রণাঙ্গন ছেয়ে ফেলল আমেরিকা ও ইংরেজের মেকানাইজড সৈন্য। আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্র স্তব্ধ হয়ে গেছে। বলকান

পেরিয়ে রাশিয়া ঢুকে পড়েছে জার্মেনীর অভ্যন্তরে। ইটালীর বুকে হাঁটে মিত্রপক্ষের সৈন্য। নরম্যাণ্ডির আয়োজন সমাপ্ত।

প্রশান্ত সাগরীয় যুদ্ধের আকার মারাত্মক। একটার পর একটা ঘাঁটি দখল করে চলেছেন ম্যাকআর্থার। পনের শো' আমেরিকান বিমান একদিনে টোকিওর ওপর হামলা করেছে। ইংরেজের উনবিংশ ডিভিসনের সৈন্যদল মান্দালয় দখল করে নিয়েছে। এবং গেছে মেমিওও।

এই দুর্বিপাকের ভেতরই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় অভিযান। এই দুর্বিপাক-যে কত ভীষণ, তাও নেতাজির অজানা ছিল না। সুভাষ ব্রীগেড-এর সেনাপতি ছিলেন শা'নওয়াজ, তাঁর অধীনে ছিলেন প্রেম শেগল ও জি, এস, ধীলন।

সম্মুখে এঁদেরও হয়তো পরাজয়ের বিভীষিকা ফুটে উঠেছিল এবং পরিণামও জানা ছিল বিলক্ষণ। ইংরেজ তাঁদের কথা ভুলবে না। প্রতিহিংসা নেবে পুরোপুরি। তবুও সঙ্গের সাথীদের নিয়ে যে অকুতোভয় বীরত্ব ও অবিশ্বাস্য নির্ভীতির জীবন্ত সাক্ষর রেখে তাঁরা মুছে গেলেন অতীতের শুধু একটি কাহিনী হয়ে,—তারও বুঝি তুলনা নেই।

সেই দুর্যোগের মুখে নেতাজি ধীলনকে লিখছেন: "শ্রীভগবানের ইঙ্গিত আমি দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সে-ইঙ্গিত মুখর। আজ আমাদের শুধু সংগ্রাম করে যেতে হবে। দিতে হবে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ মূল্য। (১২ই মার্চ, ১৯৪৫)

উত্তরে লিখছেন ধীলন: "আমাদের নেতাজি, আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে জানিনে,—জানতে চাইওনে; আপনার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমাদের এ-সংগ্রাম চলতেই থাকবে এবং আমাদের বাহিনীর একটি প্রাণ জীবিত থাকতেও সংগ্রাম পরিহার আমরা করবো না।

"রেঙ্গুনে থাকতে যে কথা আপনাকে বলেছিলাম, তা আমি ভুলিনি। আমি বলেছিলাম: 'ম্যঁয় আপ কি আঁখোঁ কিসি কি সামনে নীচি না হোনে দুংগাঁ।' (Exhibit, Q. Q. Q.)"

পরের আর একখানি চিঠিতে ধীলন একটি যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ

দিয়েছেন। লিখছেন: বেলা তখন ১২টা ৩০ মিনিট। সহসা দেখা গেলো শত্রুর একটি বেশ বড় মেকানাইজড বহর এগিয়ে আসছে। সোজা ওরা এগিয়ে আসছে পাকা সড়ক ধরে। প্রশস্ত রাজপথ। এ্যাসফাল্টে তৈরী। আমাদের "ক" কোম্পানীর ধারে এসেই ওরা গোলাগুলি ছুড়তে শুরু করে। আমাদের দলও বসে ছিলো না। প্রত্যুত্তর দিলো সঙ্গে সঙ্গে। যদিও আমাদের কোম্পানীর হাতে শুধু ছিলো রাইফেল আর মাত্র একটি ব্রেন গান।

"পনেরটি ট্যাঙ্ক, এগারটি সাঁজোয়া গাড়ি আর দশখানা ট্রাক ছিলো শত্রুর এই বহরে। আমাদের কোম্পানীর তৎপর উত্তরে ওরা থমকে দাঁড়ালো। এবং সঙ্গে সঙ্গে গতি ওদের পাল্টে গেলো। ওরা ভাগ হয়ে গেলো তিন দিকে। একটা গেলো, যেদিকে ছিল আমাদের 'খ' কোম্পানী; অন্যটা দু'ভাগ হয়ে 'ক' ও 'খ' কোম্পানীর মহড়া নিলো। আমাদের তৎপর সংবাদদাতা তখুনি ছুটেছিল ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টারস-এ। (বোঝা-ই যায়, ফিল্ড টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা ছিল না) কিন্তু ওদের সাঁজোয়া গাড়িগুলো ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে একেবারে আমাদের কোম্পানীর ভেতর অঙ্গনে। এবং ঢুকেই তীব্র আক্রমণ চালায় ওরা। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কোম্পানীকে নির্মূল করা। ওদের সুবিধে ছিলো অনেক। গাড়িতে বসেই ওরা ছুড়তে লাগলো হাত বোমা ও গ্রীনেড, চালাতে লাগলো মেশিন গান। শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ি আর উন্নত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্রের মুখে আমাদের কী দারুণ অসহায় অবস্থা। সেই অবস্থায় আমাদের কোম্পানীর কিছুই করণীয় ছিলো না। দুটো মাইন ছিলো আমাদের; ছোড়াও হয়েছিলো, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা, মাইন ফাটলো না।

"৫নং আর ৬নং প্লেটুন রাইফেলের মাথায় বেওনেট বসিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর গাড়ির ওপর। ওরা ছুটে গেলো হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে,—নেতাজি জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, চলো দিল্লী। শত্রুর গাড়িগুলো এই অতর্কিত পাল্টা আক্রমণে থমকে

গেলো। শত্রু সৈন্য বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। চললো তখন হাতাহাতি সংগ্রাম। একঘন্টা চলেছিলো এই যুদ্ধ অবিরাম।

"কোম্পানী কম্যাণ্ডার জ্ঞান সিং এবং প্লেটুন কম্যাণ্ডার মাঙ্গুরাম নিজেদের সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন সমগ্র দলটিকে। মাঙ্গুরাম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। দলটির এক দশমাংশ তখন মাত্র জীবিত। সহসা শত্রুর গুলিবিদ্ধ হয়ে জ্ঞান সিং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তবু কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি, কেউ পালায়নি, পিছুও হটেনি। ৪নং প্লেটুন কম্যাণ্ডার রাম সিং নেতৃত্ব নিয়ে ধীরে ধীরে অবশিষ্ট দলটিকে নিয়ে এলেন পরবর্তী ঘাঁটিতে। শত্রুও দ্রুত সরে পড়লো। ফেলে গেলো পঞ্চাশটি মৃত দেহ। আমরা হারালাম চল্লিশটি অমূল্য আজাদী ফৌজ।"

পত্রের উপসংহারে ধীলন লিখছেন: "সমরক্ষেত্রের অনেক বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত, কিন্তু মাঙ্গুরাম, জ্ঞান সিং আর আমাদের ফৌজের বীরত্ব সত্যই অসাধারণ, তুলনাহীন। এই অসম যুদ্ধে তারা যে নির্ভীতি ও দেশপ্রেমের অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য রেখে গেলো, ভারত-স্বাধীনতা-সংগ্রামের তা এক অমর কাহিনী।"

অসহায় মুক্তি ফৌজ। বান্ধব জাপানীদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। তারা পিছু হঠতে শুরু করেছে। আমেরিকার মেকানাইজড অস্ত্র আর নতুন নতুন সৈন্যের চাপে ভেঙ্গে পড়ে মুক্তি ফৌজের বূহ।

সব পথ তার রুদ্ধ। একটিমাত্র পথ খোলা,—মৃত্যুর পথ।

অকুতোভয় আজাদ হিন্দ ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর বুকে। মরে ওরা কাতারে কাতারে। মরবে আরও। মরে মৃত্যুর মুখ বুঁজিয়ে দেবে। তবু মুক্তির হুঙ্কার ওদের কোনদিনই স্তব্ধ হবে না। কিন্তু নেতাজি?

সাঙ্গ হয়ে গেল জয়াশা। বৃথা এই বলিদান! ফিরে চল। ফিরে চল এখান থেকে। অন্য কোথাও।

নেতাজির হুকুম নামা,—'ফিরে এসো।'

আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে ওরা।

ওরা পরাজিত জীবনে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেয়নি।

ওরা বিজয়ের স্বপ্ন আর মৃত্যুর অপরাজেয় গৌরবের প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল।

একটা যদি ভেঙ্গেই থাকে,—আর একটা ?

কিন্তু নেতাজির হুকুম।

ফিরে চলে ওরা।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫। রেঙ্গুনের অদূরে শত্রু। কয়েক ঘণ্টার ওয়াস্তা মাত্র। ঢুকে পড়বে শত্রু রেঙ্গুনে। সবাই অধীর হয়ে ওঠে। নেতাজি রেঙ্গুনে। সবাই-এর প্রাণ অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে যায়। এই মানুষকে ওরা হাতে পেলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না ?

ধীর পায়ে প্রবেশ করেন নেতাজি সঙ্ঘের হেড কোয়ার্টারে। ছুটে আসেন ভোঁসলে আর কিয়ানি। আসেন আয়ার।

নেতাজির রেঙ্গুন পরিত্যাগ করবার পরিকল্পনা স্থির হয়।

রাত্রি নেমে আসে।

সহর-সীমান্ত থেকে ভেসে আসে গুলি-গোলার শব্দ। মাঝে মাঝে দিগন্তের কোল হয়ে ওঠে রাঙ্গা। আগুনে পুড়ছে।

যাত্রার আয়োজন চলতে থাকে নেতাজির শিবিরে।

রাত্রি আরও গভীর হয়।

পট্টবস্ত্রে দেহ আবৃত করে নেতাজি মোটরে চড়ে বসেন। রামকৃষ্ণ মঠের সামনে এসে গাড়ি থামে। নেমে আসেন নেতাজি। দোর খুলে দেন কৈলাশন। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন নেতাজি। আসন বিছিয়ে নেন বিগ্রহের সামনে। নেতাজি ধ্যানে ডুবে যান।

কতক্ষণ ছিলেন ?

প্রশান্ত মুখে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় স্বর্গের দীপ্তি।

নেতাজি ফিরে আসেন। (১)

(১) নেতাজি মাঝে মাঝে মঠে যেতেন এইভাবে। (আয়ার)

সারাদিন চলে নেতাজির নির্দেশ। প্রতিটি বিভাগের জন্য, প্রতিটি সঙ্ঘের শাখায়। মিনিটে মিনিটে ছুটে চলে বার্তাবহ। পৌঁছে যায় নির্দেশ।

রেঙ্গুন ক্যাম্পের সব রাণী-ফৌজ যাবে নেতাজির সঙ্গে। ওদের ফেলে যাবেন না নেতাজি। সঙ্গে বাছা বাছা কয়েকজন সেনাপতি আর আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীরা। স্টেশনে চলে গেছে রাণী-ফৌজ।

আবার সেই কাইকান। দুর্ভাগ্যের দুর্যোগের মতোই ওরাও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেনে স্থানাভাব। জাপানী সৈন্য দখল করে নিয়েছে আগেভাগে।

এইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ক্রোধে ফেটে পড়লেন নেতাজি। আয়ারকে পাঠালেন হাচাইয়ার কাছে। হাচাইয়া জাপানীদের সংযোগ-মন্ত্রী।

এই হাচাইয়া কি ফ্যাসাদেই-না পড়েছিলেন প্রথম যেদিন তিনি রেঙ্গুনে এলেন। সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন নেতাজির সঙ্গে। প্রটো-কলের ব্যবস্থা। নেতাজি চেয়ে পাঠান পরিচয়-পত্র। (credentials) হাচাইয়ার মুখ কাঁচু-মাচু হয়ে গিয়েছিল। পরিচয়-পত্র ভুলে ফেলে এসেছেন টোকিওতে। নেতাজি দেখা করবার অনুমতি দেননি সেদিন। (পরে অবশ্য হাচাইয়া পরিচয়-পত্র আনিয়ে নিয়ে দেখা করেছিলেন।)

সেই হাচাইয়া। আজ বুঝি বদলা নেবার ক্ষণ। যাবার ব্যবস্থা জাপানীরা করবে কি, না,—নেতাজি জানতে চান।

প্রতীক্ষায় কাটে সারাদিন। কাটে রাত্রিও প্রায়। অবশেষে গাড়ি এল। কয়েকখানা ট্রাক, আর নেতাজির জন্য একখানা মোটরকার।

ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। ফর্সা হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। রাত চারটে তিরিশ।

নেতাজি বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। চড়ে বসেন নিজের গাড়িতে। বার্মা ছেড়ে যাবার পূর্বক্ষণে দিয়ে যান তাঁর বিদায় বাণী: "আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি ও সৈনিকেরা, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজ আমি বার্মা ছেড়ে যাচ্ছি। এখানে থাকলো তোমাদের

সংগ্রাম ক্ষেত্রের অম্লান বীরত্ব-গাথা, যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আজো যা নিঃশেষ হয়নি। ইম্ফল ও বার্মার রণাঙ্গণে আমরা মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম পর্বে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু সে-পরাজয় কেবলমাত্র প্রথম পর্বেরই পরাজয়। শেষ নয়। আবার আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। চিরদিনের আশাবাদী আমি; শেষ পরাজয় কোনক্রমেই আমি স্বীকার করে নেবো না।...

"বন্ধুগণ, আজকে এই সঙ্কট-মুহূর্তে একটি আদেশই শুধু দেবার আমার আছে,—আর তা এই: তোমাদের ব্যর্থকাম হতে হয়েছে; কিন্তু বীরের মতো ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়ে তোমরা সর্বদেশের ও সর্বকালের বীরের প্রাপ্য সম্মান ও শৃঙ্খলার অধিকারী হও। আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে স্বাধীনতার দেব-দেউলে, পাশবদ্ধ জীবনে নয়; তোমাদের আজকের এই বিস্ফারিত আত্মদান তাদের জন্ম সম্ভবপর করে তুলবে। স্মরণ করিয়ে দেবে তাদের কানে এই পরম তথ্য যে, তোমরাই তাদের পূর্বসূরী। তোমরাই জীবনের বিনিময়ে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে গেলে, এ-কথা তারা ভুলবে না। বিশ্বমানবকে এ-কথা তারা একদিন উচ্চ কণ্ঠে জানাবে যে, তাদের পূর্বগামীরা মণীপুর, আসাম ও বার্মায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলো, হেরেও ছিলো, কিন্তু সেই সংগ্রাম ও পরাজয়ের বুকের ওপর শেষ-বিজয়ের এক গৌরবময় পথও তারা রচনা করে গেছে।...

"আমার শেষ অনুরোধ তোমাদের কাছে বন্ধু, আমার মতো তোমরাও আত্মবিশ্বাস বজায় রেখো। আমারই মতো এ-কথা বিশ্বাস কোরো যে, নব ঊষার পূর্বক্ষণ চিরদিনই থাকে দুর্গম আঁধারে ঢাকা। আর একটি কথাও বিশ্বাস কোরো যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং হবে অচিরেই।"

সারা সহর তখন লাল হয়ে উঠেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে জাপানীদের ব্যারাক। ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিষ্প্রভ চাঁদ তখনও পশ্চিম আকাশের কোলে। পাংশু হয়ে গেছে।

॥ এগার ॥

বন্দী-জীবনের বছর ঘোরা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভাগ্যে আর ঘটল না। ইংরেজ ওঁকে মুক্তি দিল। মুক্তির অব্যবহিত পরই ছিল গান্ধী-বন্দী-দিবস। নাইডু সভায় যোগ দিলেন এবং তাঁর বক্তৃতাও হল। কঠোর ভাষায় শ্রীমতী ইংরেজ বিরোধী গোপন কাজের সমালোচনা করে এ-কথা বলতে ভোলেননি যে, এই প্রকার হীন ও ভীরু কাজ তাঁর অবিমিশ্র ঘৃণাই উৎপাদন করে। (১)

সুরই শুধু বেসুরো নয়, হাওয়াও যেন উল্টো বইতে চায়। শ্রীমতী নাইডু ছিলেন গান্ধীর সঙ্গে। পুণায়। আগা খাঁ প্যালেসে। গান্ধীর মনোভাব নাইডুর অজানা থাকবার কথা নয়।

জেলে ঢুকেই সম্ভবত গান্ধী তাঁর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের গতি ও প্রতিকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বন্দী হবার পূর্বে গান্ধীর মনে প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। দেশকে দূরে থাক্, নিজেকেও তিনি প্রস্তুত করবার অবকাশ পাননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজের তদানীন্তন ঘোরতর দুর্বিপাক-মুহূর্তে তাঁর সত্যাগ্রহের হুমকিই যথেষ্ট হবে। ইংরেজ ভয় পাবে। এগিয়ে আসবে একটা ফয়সালার জন্য।

কিন্তু ইংরেজ এল না। গান্ধী বন্দী হলেন অতর্কিতভাবে। তাই, সত্যাগ্রহের জন্য কোন কার্যকরী পথ, সূচী অথবা ক্রম তিনি নিজে ভাববার সময় পাননি এবং কাউকে বলেও যাননি। শুধু ভবিতব্যের ওপর সমগ্র দেশকে সঁপে দিয়ে এবং একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে আগা খাঁ প্যালেসে ঢুকে পড়েছিলেন।

১৯৩৯ থেকে দেশবাসী সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। যেদিন আর যে-মুহূর্তে কংগ্রেসের ঘোষণা তারা শুনতে পেল, একটা দুর্জয়

---

(১) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—সীতারামাইয়া

উল্লাসে মেতে উঠল সবাই একসঙ্গে। পরিণামের কথা মনে জাগল না। জাগল না এ-কথাও যে, নেতাহীন দেশবাসীর এই স্বতোৎসারিত মুক্তি-কামনা যে-পথে ও যে-রূপে ছুটে এল বেপরোয়া ও উদ্দাম হয়ে, তা গান্ধীর মনঃপূত হবে কি, না। গান্ধী অনুমোদন করবেন কি, না,—একথাও তারা ভাবতে চাইল না।

তা'ছাড়া ছিল নেতাজির কথা। শুনেছে তারা নেতাজির বক্তৃতা। তারা আশা করেছিল এবং এ-বিশ্বাসও তাদের ছিল যে, এই সংগ্রামী মানুষটি যুগপৎ যদি বহির্ভারত থেকে কিছু-একটা করেন,—তু'দিকের আক্রমণে ইংরেজ কুপোকাৎ হবেই।

নেতাজি কী এবং কতটা করতে পারবেন, তা তারা জানত না; ভাবেও নি। তারা শুধু এইটুকুই জানত এবং বিলক্ষণ মনেও করত যে, আর যাই হোক সুভাষ বোস ইংরেজের এই বিপত্তি অবহেলায় বৃথা যেতে দেবেন না।

গান্ধী তাদের পথ দেখাতে পারেননি, নেতাজির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি-সংগ্রামও ১৯৪২-এ সম্ভবপর হল না। নিরুপায় কিন্তু মুমুক্ষু দেশবাসী নিজের বুকভরা আশা ও কামনা সম্বল করে নিজের মনোমতো পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং তার এই বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্য অল্পদিনের মধ্যে থেমেও গেল।

কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতা গান্ধীর ক্ষমা করবার উপায় ছিল না। তুলাদণ্ডধারী গান্ধী সত্যাগ্রহের অঙ্গে হিংসার ছোপ দেখলেন। এবং শিউরেও উঠলেন।

গান্ধী প্যালেসে প্রায়োপবেশন করেছিলেন। প্রতিবার প্রায়োপ-বেশনের প্রাক্কালে নিজেই কারণ ঘোষণা করতেন; এবার থাকলেন মুখটি বুজে। কেউ বলল, নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে গান্ধী উপোশ করছেন, কেউ বলল ভিন্ন কথা। শুধু ইংরেজ বুঝল যে, পরাজিত গান্ধী তাঁর হারিয়ে ফেলা প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব ফিরে পেতেই এই চরম পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন।

সমস্ত ভারতবর্ষ বেদনা, ভয় ও আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ থাকল নির্বিকার। ইংরেজ গান্ধীকে চিনত। এবং চিনত ভারতবাসীর চাইতেও অনেক বেশি করে। আর তাই অবহেলা আর উপেক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বিনা সর্তে গান্ধী উপবাস ভঙ্গ করলেন। (Gandhi's fast : In the end, being quite convinced of our obduracy, he abundoned his fast.) (১)

গান্ধী সানুচর মুক্তি পেলেন ৬ই মে, ১৯৪৪।

গান্ধী-যে মুক্তি পাবেন, এ-কথা নিশ্চয়ই ইংরেজ-শিবিরের অনেকে জানত। রামস্বামী মুদালিয়র (দশ মাসের জন্য ইনি ইংরেজের ওয়ার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হয়েছিলেন), আর শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গান্ধীর মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যাতে গান্ধী শান্তির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তার ব্যবস্থায়, তাই, ওঁরা তৎপর হয়েও উঠেছিলেন। এবং বন্দী-নিবাসে থাকাকালেই সপ্রু, জয়াকার ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনাও হয়েছিল। (২)

১৭ই জুন (১৯৪৪) গান্ধী বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে আবেদন পাঠান। মুক্তির পর গান্ধী কয়েকদিন পুণায় ছিলেন। সেখান থেকেই এ-আবেদন পাঠানো হয়। বড়লাট আবেদন-পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি।

এর পরই গান্ধী যে-দুটি বিবৃতি দেন, তা'দ্বারা তিনি নিজেকেই শুধু পরিস্ফুট করেননি, পরন্তু তাঁর প্রচারিত ও প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের পরিণাম ও আদর্শ নিঃসন্দেহে স্পষ্ট করে তুলেও ধরেছিলেন। প্রথমটিতে গান্ধী সদ্য অতীতের সব কথা ও কাজ নিঃশেষে ভুলে যেয়ে বলে বসলেন যে, প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি জাতীয় সরকার পেলেই তিনি সন্তুষ্ট

---

(১) দ্বিতীয় বিশ্ব সমর,—চার্চিল, ৪র্থ খণ্ড

(২) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—সীতারামাইয়া

হবেন। এবং কংগ্রেসকে উপদেশ দেবেন তা গ্রহণ করতে। (To-day he would be satisfied with a National Government in full control of Civil Administration, and he would advice Congress participation in a National Government if formed.) (১)

এ-কথাও গান্ধী ঐ বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেলেই তিনি কংগ্রেসের উপদেষ্টা-ভূমিকা পরিত্যাগ করবেন।

গান্ধীর কথা এইখানেই শেষ হল না। আইন অমান্য করবার বাসনা তাঁর নিঃশেষ হয়ে গেছে; ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে না, তাই ১৯৪২ আর ফিরেও আসবে না; সাড়ম্বরে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথাও জানিয়ে দিলেন। (He has no intention of offering civil disobedience. History can never be repeated and he cannot take the country back to 1942.) (২)

এর পরই গান্ধী একটানা কঠোর সমালোচনা করেছেন সর্বপ্রকার নাশকতামূলক কার্যের এবং কংগ্রেসকর্মীদের গভীর ও গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিয়েছেন গোপন কর্মধারার পরিবর্তে কারাবাস বরণ করে নিতে।

গান্ধীর নিকট ১৯৪২-এর কোন সার্থকতাই আর অবশিষ্ট রইল না। নিমেষে দেশের সর্বপ্রকার মুক্তি-প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে উঠল। উবে গেল কর্পূরের মতো।

বিমূঢ় দেশবাসী নিশ্চয়ই সেদিন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে গান্ধীর জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

এইটুকু বলেই ঐতিহাসিক সীতারামাইয়া চুপ করেন নি। গান্ধীর মধ্যে সেদিন তিনি যে অপরূপ আর বিরাট দেবত্ব নিরীক্ষণ করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন অনবদ্য ভাষায়: "দেবদূত গান্ধী; স্বর্গীয় বাণীর

(১ ও ২) কংগ্রেসের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,—সীতারামাইয়া

তিনি অপার্থিব বাহন ; দুর্লভ প্রেরণা তাঁর কণ্ঠে......ইত্যাদি" (once again he spoke like a man descended from on high. Indeed he was the vehicle of a voice from heaven. He spoke with rare inspiration···)

সীতারামাইয়া বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের সব সত্যই নিঃশেষে উন্মুক্ত করেছেন, শুধু স্পষ্ট করে একটা কথা লিখতে অকস্মাৎ ঢোক গিলে বসলেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার অব্যবহিত পরই শ্রীমতী নাইডু থেকে শুরু করে গান্ধী ও জহরলাল সহসা ১৯৪২-এর আন্দোলন সম্পর্কে অমন মারমুখীই-বা হয়ে উঠলেন কেন, আর নিজেদের প্রবর্তিত আগস্ট-আন্দোলনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করবার এই অসহায় প্রবণতা এবং রূঢ়তাই-বা তাঁদের আচরণে সহসা দেখা কেন দিল,—এই কথাটি সীতারামাইয়া সযত্নে পরিহার করে গেছেন।

বস্তুত প্রতিটি গান্ধী-আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যে, গান্ধী-চরিত্রের মৌল নীতির মধ্যে, এবং সর্বপ্রকার সংস্কারপন্থী আন্দোলনের নিজস্ব মজ্জায় এর অস্তিত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

গান্ধী যখনই যে-কোন আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন, তাঁর আচরণ ও কথা মনে হয়েছে দুর্বার, আন্দোলনের গতি রূপ ধরতে চেয়েছে অপ্রতিরোধ্য ; কিন্তু কিছুদূর আন্দোলন চলবার পর এক দিকে তাঁর নিজেরই ঝিমুনি দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনেরও গতি-বেগ ভেঙ্গে পড়েছে। গান্ধী পরক্ষণেই শাসকশ্রেণীর সঙ্গে আলোচনা ও আপোসের মাধ্যমে সন্ধির জন্য উৎগ্রীব হয়ে উঠেছেন। অবশ্য পরে এই আপোষী মনোভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাঁর ভক্তবৃন্দ মুখর হয়ে উঠেছে এবং একেই গান্ধীর অলৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে আনন্দে ও ভাবাবেগে বিগলিত হতে তাদের বাধেনি। এবং গান্ধীর সঙ্গে তাঁর গোটা বহর এই সহজ ও অনায়াসলব্ধ পন্থাকেই স্বাধীনতা লাভের আদি, অকৃত্রিম ও উৎকৃষ্ট পথ মনে করে সেই পথ অনুসরণ করতে ও আঁকড়ে ধরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

এবারও তাই এল। আগস্ট-প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং তার অকুণ্ঠ প্রতিবাদ ও বিরূপ সমালোচনা না করা পর্যন্ত ওয়াভেল পরবর্তী পদক্ষেপে আদৌ অগ্রসর হবেন না, এ-কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন গোড়াতেই ; এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী ও তাঁর অনুবর্তীরা আগস্ট-আন্দোলনের সপিণ্ডীকরণে মেতে উঠেছিলেন,—এই সত্য কথাটা সত্যাগ্রহীরা বলতে পারেন নি স্পষ্ট করে। জহরলাল আপনা থেকেই উঁচিয়ে ছিলেন। তার সঙ্গে পেলেন গান্ধীর সায়,—সোনায় সোয়াগা। মা মনসা ধূনোর গন্ধে নেচে উঠলেন।

সানুচর গান্ধীর, তাই, নিষ্ঠুর হবার প্রয়োজন ছিল। আপোসে ইংরেজের কাছ থেকে কিছু আদায় করবার ফন্দি ও ফিকির ছাড়া সেদিন গান্ধী ও কংগ্রেসের করণীয় আর কিছু ছিল না, এই পরমতত্ত্ব উপলব্ধী করেই অমন তীব্র ও তিক্ত ভাষা গান্ধী আগস্ট-আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং নাইডু ও জহরলালকে দিয়েও করিয়েছিলেন।

হয়তো গান্ধীর পক্ষে আর দ্বিতীয় পথ খোলাও ছিল না। সুভাষের অসমসাহসিক বীরত্বে ও ত্যাগের মাধুর্যে সাময়িক ভাবে তিনি খানিকটা প্রতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ক্রীপ্‌স্‌-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবার এবং সত্যাগ্রহ প্রবর্তনের মূলেও তাঁর সংস্কারকামী মানস সাময়িক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু যুদ্ধের গতি ও পরিণাম ভেবে সতর্ক ও সাবধান না হয়েও তিনি পারেননি। ইওরোপের যুদ্ধ সমাপ্তি মুখে। হিটলারের পরাজয় সুনিশ্চিত। জাপান একা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বেশিদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কিম্বা জয়লাভ করতে সমর্থ হবে না, এই বাস্তব উপসংহার গান্ধী উপেক্ষা করতে পারেন নি।

এবং সম্ভবত এ-কথাও গান্ধী ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, পরাজয়ের মুখে দাঁড়ানো ইংরেজকেই যখন হার মানানো সম্ভব হল না, বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী ইংরেজকে না ঘাঁটানোই শ্রেয় ও বিজ্ঞোচিত।

কিন্তু গান্ধীর বিগত দিনের কথা ও কাজ ইংরেজ কি খুব সহজে ও

স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পারবে?—এই আশঙ্কা গান্ধীর মনে বিলক্ষণ দুশ্চিন্তার সঞ্চার করেছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় এবং ইংরেজকে খানিকটা তোয়াজ ও খুসি করতে গান্ধীকে অমন কঠোর হতে বাধ্য করেছিল।

গান্ধী ছিলেন চিরকালের সংস্কারপন্থী। প্রকৃত সংগ্রাম নয়,—সংগ্রামের মহড়া দেখিয়ে তিনি কিঞ্চিৎ সুযোগের প্রত্যাশী ছিলেন। জনমতের চাপে মাঝে-মধ্যে তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতার কথা বলতেন, কিন্তু পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করবার উপায় তাঁর ছিল অজানা। এবং তাই স্পষ্ট করে কোনদিন তা তিনি চাইতেও পারেন নি।

পরবর্তী কালে স্বদেশে এবং বিদেশে অনেকেই গান্ধী-চরিত্রের এই অসংলগ্নতা লক্ষ্য করেছে এবং সমালোচনাও কম হয় নি।

সবটা না হলেও এ-সব তথ্যের অনেকটা নেতাজি রেঙ্গুনে থাকতেই জানতে পেরেছিলেন এবং এ-কথাও তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের বিপদ লঘু হবার পর-মুহূর্তে একদিকে ইংরেজ স্ব-মূর্তি ধারণ করবে, এবং অন্যদিকে কংগ্রেস তথা গান্ধীর মনে লাগতে থাকবে দোলা। জাগবে সংশয়। গান্ধী আবার শান্তি ও আপোসের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন।

হলেনও তাই। কিন্তু এর কোন প্রতিকার-পথ তখনকার অবস্থায় মনে জাগলেও কিছু করা বা বলা নেতাজির পক্ষে সম্ভব হয়নি। নেতাজি তখন রণাঙ্গনে। আরাকান ফ্রন্টে বিপর্যয় শুরু না হলেও স্থিতাবস্থা এসে গেছে। প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে ইম্ফলের চার পাশে।

খুব সম্ভব এই অবস্থার কিছু পরেই (৬ই জুলাই, ১৯৪৪) অমন আকুল হয়ে নেতাজি গান্ধীর মঙ্গলাচরণ গেয়েছিলেন। নিজের জীবনের কথা বলেছিলেন, কেন এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন তারও ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং আপোসের মাধ্যমে-যে স্বাধীনতা কখনও কোন পরাধীন জাতির ভাগ্যে সম্ভবপর হয়নি, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সব শেষে বলেছিলেন যে, যদি গান্ধীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব ইংরেজ মেনে নিত, তিনি নিশ্চয়ই খুসি হতেন; কিন্তু ইংরেজ-যে তা মেনে নেবে না, তা তিনি জানতেন।

নেতাজি বলেছিলেন অনেক কথা ; এই ভাষণেই নেতাজি গান্ধীকে ডেকেছিলেন 'জাতির জনক' বলে। তবুও সুভাষচন্দ্রের কথা সেদিন শোনা বা তাঁর কথায় সায় দেয়া আর গান্ধীর পক্ষে সম্ভব নয়। নেতাজির সাফল্য সম্বন্ধে গান্ধীর মনে সংশয় জেগেছে। তাই, তাঁর কাছে নেতাজির কথার দামও কমে গেছে।

নতুন কিছু আর ভাবা বা করা গান্ধীর শক্তি বহির্ভূত। গান্ধী পরিশ্রান্ত। গান্ধী বৃদ্ধ। আর, ব্যর্থও। তাই, প্রত্যাবর্তনের সকল দরজা বন্ধ করেই গান্ধী আগা খাঁ প্যালেস পরিত্যাগ করেছিলেন।

গান্ধী অপেক্ষা করতে লাগলেন আমেদনগর ফোর্টের দিকে চেয়ে।

জহরলাল আর আজাদ কবে মুক্তি পাবেন ?

প্রায় আড়াইশো সহচর নিয়ে নেতাজি রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেছিলেন সেই পথে, যে পথে একদিন তিনি প্রবেশ করেছিলেন রেঙ্গুনে।

পরবর্তী পরিকল্পনার অবকাশ নেতাজি পান নি। আপাত গন্তব্য স্থান ব্যাঙ্কক। তারপর নিশ্চয়ই সিঙ্গাপুর। কিন্তু তারপর ?

না থেমে চলতে হবে। আর কোন কথা জানা নেই। এ-কথা পূর্বেও জানা ছিল, পরেও থাকবে। পাথেয় ও পথের সন্ধান না জেনেই চিরদিন পথে বের হয়ে পড়েছেন। দুর্গম পথ। অজানাও। কিন্তু যেতেই হবে, এইটুকুই ছিল জানা। থামা চলবে না।

সেই পথেই আবার নেমে এলেন।

চিরন্তনের পথিক। যুগ যুগান্তের পথিক।

জীবনের প্রতিটি চাওয়া, সকল জিজ্ঞাসা দাঁড়িয়ে থাকে পথে।

এই পথের বুকেই চাওয়া বেঁচে ওঠে, ভরে ওঠে অজস্রতায়।

আবার মরেও যায়।

এই পথের প্রান্তেই অবসান ঘটে সকল জিজ্ঞাসার ;

মৃতি নেয় সার্থকতায়।

সেই পথের বুকে দাঁড়িয়েছে এক ঘর-ছাড়া, নীড়-হারা, দিক্-ভোলা পথিক। এই পথেই কি এরও পড়ে থাকবে সকল চাওয়া আর সকল জিজ্ঞাসার অমূর্ত কায়া? কেউই কোনদিন বুঝবে না? জানতে চাইবে না? কুড়িয়ে ঘরে নেবে না? হারিয়ে যাবে হতাদরে?

পথিক তবু চলেই। চলতে-যে হবেই।

এক ঘণ্টাও কাটল না। আকাশে অখনও চাঁদ ছিল। পুবের আলোও ফুটে উঠেছে। বেজে উঠল মৃত্যুর বাঁশী। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান এল উড়ে। ছোঁ মেরে বিমান নেমে আসে নিচে, অগ্নিবৃষ্টি করে অনর্গল। পেট খালি করে উড়ে যায়। আবার আসে নতুন ঝাঁক।

সবাই গাড়ি ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে। দু'ধারের জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। বিমান চলে গেলে আবার গাড়িতে চড়ে বসে। একবার নয়, বারবার। ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কনভয় বেশি এগোতে পারে না। এরই মধ্যে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। পথে জল দাঁড়ায়। গাড়ির চাকা বসে যায় কাদায়। নয়তো পিছলে চলে যায় বিপথে।

দিনমানে চলবার উপায় নেই। জঙ্গলে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে রাত্রির। জীবনের শ্রেষ্ঠ বান্ধব অন্ধকার। আলো নয়। পোকা-মাকড় আর জোঁক তাড়িয়ে দিন কাটে। পথ চলা শুরু হয় রাত্রির অন্ধকারে।

সামনে একটা ছোট নদী। গাড়ি জমতে থাকে পর পর। চেনা যায় না মানুষ; গাড়ি তো নয়ই। সব একাকার। নেতাজির গাড়ির পাত্তা নেই। খুঁজতে থাকে সবাই। অনেকটা পর এসে পৌছায় নেতাজির গাড়ি। খেয়া পাড়ের উপায় নেই। মেয়েদের হাঁটিয়ে পরপারে নিয়ে যাবার নির্দেশ এল। কর্নেল মালিক আর মেজর স্বামী ওপারে নিয়ে যান মেয়েদের।

পথের ধারে ধারে গ্রাম। পরিত্যক্ত জনপদ। ভাঙ্গা। আগুনে পোড়া। শত্রু ওদের রেহাই দেয়নি। বোমা ফেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। খুবলে খেয়েছে। এক এক করে গাড়ি যায় ওপারে।

সিটাং নদীর পাড়ে এসে গাড়ি আবার থামে। পুল উড়িয়ে দিয়েছে শক্রর বোমা। পারাপারের একমাত্র উপায় সেই সনাতন ফেরি। সব গাড়ি জমে গেল পারে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা আকাশের বিমানের চাইতেও মনে হয় ভয়ঙ্কর।

পরিত্যক্ত এক গৃহ। ওপর তলার কক্ষের ঝুল আর ধুলো ঝেড়ে একখানা কম্বল বিছিয়ে দেয়া হয়। শুয়ে পড়েন নেতাজি। ওরই মধ্যে হাসি ফুটে ওঠে সবাই-এর মুখে। মেয়েরা মেতে ওঠে রান্নায়। তিন দিনের মাথায় পেটে পড়ল অন্ন। ভাত আর ডাল। সবাই মুখে তোলে আর বলে,—তোফা।

ছিলেন বড় বড় অনেকেই। ভোঁসলে, কিয়াণি, চ্যাটার্জি, গুলজার সিং, মালিক, চোপড়া, রাথুরী, স্বামী, আয়ার। কেউ কম নন। যে-কেউ পারেন একটা গোটা বাহিনী পরিচালনা করতে। কিন্তু সবাই চেয়ে আছেন ঐ একটি মানুষের মুখের দিকে। বিশ্রাম নেই এই যাত্রাকালেও। সবই দেখছেন নিজের চোখে। নির্দেশ দিয়ে চলেছেন সকল বিষয়ে। বৃহৎ একটি একান্নবর্তী পরিবারের কর্তার মতো সকল দায় আর দায়িত্ব ঐ একটি মাথায়।

বিধাতা কী দিয়ে গড়েছিলেন এই মানুষটিকে ? বৃহত্ব ও মহত্বের এক বিরাট বিগ্রহ। দুদিন পূর্বেও ছিলেন একটা মস্তবড় প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক, একটি বিপ্লবী সমর-নিপুণ বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতি ; আর এই মুহূর্তে ?

হাঁটু সমান বুট পায়ে। দেহে সাধারণ একজন সৈনিকের খাকি পরিচ্ছদ। পেটে অন্ন নেই, নেই তৃষ্ণার জল। তবু মুখের আর চোখের কোণে সেই মন ভোলানো অনির্বাণ হাসি। সমদুঃখসুখং ধীরং,—ধুলো আর কাদা, কাঁটা আর কাঁকড়, জয় আর পরাজয় সমজ্ঞান করে চলেছেন যোগী তাঁর লক্ষ্যের দিকে।

দীর্ঘ পথ। তিনশো মাইলের ওপর দুর্গম জঙ্গল কেটে এগোতে হবে। মাথার ওপরে ওড়ে শক্রর বিমান। মেশিন গানের গুলি

কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবু মুখের হাসি থামে না। সঙ্গে দুঃখ-রাতের সাথীরা। সব ফেলে, সব ভুলে যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল। সোজা রাস্তায় আর যাবার উপায় নেই। হয়তো গাড়িও আর চলবে না। যেতে হবে হেঁটে। কিন্তু যেতে হবেই।

"আমি এই পরিবেশে আরো ভালো করে দেখলাম এই মানুষটিকে; আমাদের নেতাজিকে। একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব ও দুর্লভ মহত্বের রূপে বার্মা-থাইল্যাণ্ডের সেই বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে! সৈনিক, রাজনীতিবিদ, নায়ক আর একটি গোটা মানুষ; একাধারে এক বিচিত্র সমাবেশ। বিশ্ব-সংসারে কদাচিৎ এ-রূপ চোখে পড়ে।" (১)

এই মানুষটিকে দেখেই থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিপুল সংগ্রাম একদা বলেছিলেন: "বুদ্ধের পাশে বসবার একটি মাত্র লোকই আমার চোখে পড়েছে;—নেতাজি বোস। একজন পরিপূর্ণ নিটোল মানুষ। সর্বকালের আচার্য। এ-মানুষকে অনুগমন করে তৃপ্তি আছে।" (২)

মৌলমেন দেখা যায়। গাড়ি আর চলবে না। এবার পদযাত্রা। সবাই এক সঙ্গে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় কুচ-কাওয়াজের ভঙ্গীতে। ফাইল করে। নায়ক নিযুক্ত হন কিয়াণি। হুকুম দেন কিয়াণি। নেতাজিও মেনে চলেন সে-হুকুম। চলা হয় শুরু। মার্চ।

যেমন করেই হোক, নেতাজির গাড়ি ওরা পার করে দিতে চেয়েছিল। নেতাজি রাজী হননি। সবাইকে ফেলে তিনি যাবেন একা? গাড়িতে? না।

সমান তালে পা ফেলে চলেছেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সিপাহ্‌সালার। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। মুখের কোণে বিন্দুমাত্রও বিরাগ নেই। নেই খেদ। গুণ গুণ করে সবাই গান গায়: কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—

ঘুমে চোখ জুড়ে আসে। শ্রান্তিতে গা এলিয়ে পড়তে চায়।

(১) 'আন টু হিম এ উইটনেস'—আয়ার

(২) 'ওকার রোব্‌স্‌'—লিওপোল্ড্‌ ফিসার

নোংরা পরিধেয়। ধুলোয় ঢাকা গা আর মাথা। মুখ ভরতি দাড়ি। নেতাজি চলেছেন। উঁচু বুট পরে এই মার্চ আরও কষ্টকর। কিন্তু উপায় নেই। চলতেই হবে। পায়ের ফোস্কা গলে ঘা হয়ে গেছে। খোঁড়াতে থাকেন নেতাজি। সবাই তাকিয়ে দেখে। চোখের কোণ ওদের চিক চিক করে ওঠে। নেতাজি থামেন না।

জঙ্গলের ভেতর একটা বড় গাছের তলায় সবাই বসে পড়ে। নেতাজিও। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছেন। চেয়ে আছেন সাথীদের মুখের পানে। ভাগ্যের বোঝা বয়ে চলেছে ওরা অবিরাম। ইংরেজের গোলামী অঙ্গীকার করে ওরা একদিন এই দূর বিদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কৃতঘ্ন ইংরেজ প্রাণের ভয়ে ওদের তুলে দিয়েছিল জাপানীদের হাতে। স্থান হয়ে ছিল বন্দী-শিবিরে। বন্দী-জীবনের অসহায় বিপর্যয় আর নিত্য লাঞ্ছনায় ওরা চারপাশে শুধু অন্ধকার দেখেছিল। সেই আঁধার ঘেরা সীমাহীন দুর্যোগের মধ্যে ওরা পেয়েছিল নেতাজিকে। ওদের নায়ক, বন্ধু, সাথী, সিপাহ্‌সালার। আজও তাই। এর পর?

স্বাধীনতার ওরা স্বপ্ন দেখেছিল। মেতে উঠেছিল। সাড়া দিয়েছিল মুক্তির পাগল-করা ডাকে। জীবনের মায়া ওরা করে নি। বার বার এগিয়ে গেছে মৃত্যুর কালো হিংস্র মুখে। দমে নি। ভয় পায় নি। সেদিন প্রাণ-ভরা আশা ছিল। ছিল একটা কল্পনা-ভরা ভবিষ্যৎ। আজ? সেদিনকার মতো আজও কি এই জীবনকে ওরা প্রসন্ন মনে স্বীকার করে নিতে পারবে? পারবে তাঁরই সঙ্গে চলতে? দূরে,—আরও অনেক দূরে যেতে?

কেউ চা এনে হাতে দেয়। বিবর্ণ কালো চা। বিস্বাদ। চুমুক দিয়ে নেতাজি শব্দ করেন,—"আঃ"—। হাঁ করে সবাই সেই মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে।

দেখা দিল মৌলমেন। দিনের আলো দেখা দিল দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির পর। নেতাজি নিজে দাঁড়িয়ে আগে মেয়েদের, তারপর

এক এক করে সবাইকে তুলে দিলেন ট্রেনে। হোক না মালগাড়ি, তবু ট্রেন। নেতাজির জন্য পাওয়া গেল একখানা রেল মোটর। (ট্রলি ?) ২৪ ঘণ্টা পূর্বে নেতাজি ব্যাঙ্ককে পৌঁছোলেন।

সহসা আলো ফুটে উঠল চোখের সম্মুখে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। হাতে চাএর মগটা নিয়ে সবে মুখ দেবেন, বার্তাবহ দুটি সংবাদ শুনিয়ে দিল। ১লা মে (১৯৪৫) হিটলার আত্মহত্যা করেছেন, আর জার্মেনী আত্মসমর্পণ করেছে ৭ই মে।

ইতিহাস পাশ ফিরে বসল। পাতা গেল উল্টে। ঘুরে গেল কালের চাকা। স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইলেন নেতাজি বাইরের দিকে। বার্লিন···আজাদ হিন্দ ফৌজ···লিজিয়ন···

আর ? ওঠেনি ফুটে ঐ দৃষ্টির সম্মুখে আর কারও একখানি মুখ ? করুণ আর বিষণ্ণ সেই পাণ্ডুর হাসি ? অস্ফুট কোন নব-জাতকের কাকলি ?

হয়তো উঠেছিল,—হয়তো ওঠেইনি। কেউ কি কোনদিন ঐ মুখে শুনেছে নিজের সম্পর্কীয় কারও নাম ? মায়ের নাম ? ভাইএর ? আত্মীয়, স্বজন বা আর কারও ?

সময় কোথা ? নিজের কথা,—আর আত্মীয়ের কথা ভাববার মতো বিলাসিতা কবেই-বা এলো ঐ জীবনে ?

তাছাড়া, ঐ সঙ্গের ওরা : ওদেরও তো সবই একদিন ছিল। ছিল গৃহ, সংসার, পরিজন ; ছিল জীবনের একাগ্র ও তন্ময় মমতা ; আর তারও বাড়া,—একটি নিবিড় ও নীরব মাধুর্যের সান্নিধ্য,—জীবনসঙ্গিনী ছিল,—কিন্তু কোথায় গেল ?

নিজের প্রাণের সঙ্গোপণে উঠতে-চাওয়া শত প্রশ্ন, শত ছবি, শত কথা নিমেষেই-যে মরে যায় ওদের দিকে তাকিয়ে।

উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে। বেড়িয়ে এলেন ঘর থেকে। ব্যাঙ্কক সঙ্ঘের অফিসার ও কর্মীদের পাঠালেন পথের দিকে। এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে শ্রান্ত সাথীদের। হাতে তখনও ধরাই রয়েছে চাএর মগটা।

সেই দিনেরই অপরাহ্ণ থেকে ব্যাঙ্কক রেডিও স্টেশন কাজ শুরু করে দিল। জেনারেল চ্যাটার্জি আর প্রচার-মন্ত্রী আয়ার সমগ্র ইণ্ডোনেশিয়া জুড়ে কাজের তালিকা তৈরী করলেন। প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে, দ্বিতীয়টা হবে সাইগনে। নেতাজি চলে গেলেন সিঙ্গাপুর।

১০ই আগষ্ট, ১৯৪৫। সিঙ্গাপুরের কাজ গুছিয়ে নেতাজি এসেছিলেন মালয়ের সেরামবাম-এ। নাম-করা অন্যতম প্রধান আজাদী সমর-শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল এখানে। গভীর রাত। নিজস্ব বাংলোর বারান্দায় বসে নেতাজি আলোচনা করে চলেছেন অবস্থার নানাদিক। পাশে কয়েকজন সঙ্গী। এল টেলিফোন। জরুরী বার্তা। সিঙ্গাপুর থেকে সোজা আসেনি। লাইন নেই। তাই এসেছে কৌলালামপুর ঘুরে। করেছেন কর্ণেল এনায়েৎ কিয়ানি।

রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মুক্তি পেলেন জহরলাল আলমোড়া জেল থেকে ১৫ই জুন, ১৯৪৫। আমেদনগর ফোর্ট থেকে ওঁকে পাঠানো হয়েছিল নাইনি সেণ্ট্রাল জেলে। (২৮শে মার্চ) সেখান থেকে আলমোড়া।

ফোর্ট থেকে আজাদ সাহেবকে পাঠানো হয়েছিল বাঁকুড়া জেলে। জেল থেকে তিনিও মুক্তি পেলেন ঐ একই দিনে।

মুক্তি পেয়েই এঁরা বিলক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন ইংরেজের সঙ্গে একটা মিটমাটের আশায়। জহরলালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে প্রায় ষোলো আনা। বহু আকাঙ্ক্ষিত মিত্র পক্ষের বিজয়-ঘোষণার দিন আর কল্পনা নয়, একান্ত বাস্তব। এই দিনটির জন্যই দীর্ঘদিন তিনি ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেছেন। দিন গুণেছেন। ভয় ছিল আগস্ট-আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে। সে দুর্ভাবনাও কেটে গেছে। আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। মিত্র পক্ষের সমর প্রচেষ্টার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। দেশ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন জহরলাল। গান্ধীকে সমর্থন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন

নিরুপায় হয়ে। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য কামনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে।

জেলের ভেতর থেকেই বড়লাটের সঙ্গে আজাদ সাহেবের পত্রালাপ হয়েছে। সিমলা কনফারেন্সের দিনক্ষণ স্থির করে লর্ড ওয়াভেল এই উন্মুখ নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল বোম্বাইতে ২১শে জুন। সভাপতি আজাদ সাহেবকে দেয়া হল প্রতিনিধিত্ব করবার একক ক্ষমতা।

সিমলায় কনফারেন্স শুরু হয় ২৫শে জুন। নিজের ঘাড়ে ঝক্কিটা পুরোপুরি না রাখতে সভাপতি আজাদ সাহেব ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন সিমলাতেই।

পূর্ব-নির্দিষ্ট হোটেলে আজাদ সাহেবকে না রেখে বড়লাট ওয়াভেল ওঁকে সমাদরে নিয়ে এলেন লাটভবনে। ছেড়ে দিলেন একটি প্রকোষ্ঠ। আজাদ এই সদাশয়তায় গলে গিয়েছিলেন। আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল চূড়ান্ত। বড়লাটের মহানুভবতায় নেতারা গদগদ হয়ে উঠলেন। মুক্ত কণ্ঠে তারিফ করতেও ভুললেন না। (I was impressed by the frankness and sincerity of the Viceroy.—Azad) এবং এই প্রথম ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভদ্র আখ্যায় অবিহিত করায় তাঁদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। (He (Wavell) also said that whatever their political opinion or their differences with the Government, Congress leaders were gentlemen.—Azad)

কংগ্রেস সভাপতি ওয়ার্কি কমিটির কাছে সুপারিশ করে বসলেন যে, বড়লাটের প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণ করা হবে শোভন ও সঙ্গত। (We should accept it—Azad)

কিন্তু দাতা ইংরেজ তার সেই সনাতন গোঁ থেকে একচুলও নড়ল না। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পুরোপুরি ভারতীয় করণের আশ্বাস ছিল সিমলা কনফারেন্স-এর এক এবং অদ্বিতীয় প্রস্তাব। অবশ্য সঙ্গে ছিল একটি মস্ত বড় যদি।

জিন্না। নেতাদের উন্মুখ আশা ও ভবিষ্যতের অবাধ কল্পনা জিন্নার একচালে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। ভারতীয় মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের অবাধ ও একক অধিকার থাকিবে মুসলিম লীগের এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করবে শুধু হিন্দুদের; এই ছিল জিন্নার মোদ্দা কথা। সাধ্য সাধনা হল প্রচুর। জিন্না রইলেন অচল অটল। ভেঙ্গে গেল কনফারেন্স।

দীর্ঘদিনের ও সম্প্রতিকালের সব কথাই কংগ্রেস নেতারা বেমালুম ভুলে গেল। ইংরেজের নগ্ন ও পৈশাচিক অত্যাচার তাদের মনের ওপর কিম্বা আপোসের পথে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করতে পারেনি। বাধা দিল ইংরেজের নিজের হাতে গড়া অরাজনৈতিক ও অবাস্তব একটা থিয়োরী। প্রকৃতপক্ষে এ-প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে কংগ্রেসের দিক থেকে নীতিগত কোন বাধা-যে বিশেষ ছিল, তা সম্ভবত সত্য নয়। কিন্তু সেইক্ষণে এ-প্রস্তাবে সম্মতি দেবার উপায়ও ছিল না। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন মুসলমান,—আবুল কালাম আজাদ। তাঁকে অপসারিত না করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-শাসনের ফরমূলা তৈরী ও গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা মনের সংগোপনে আনাগোনা করলেও তা প্রকাশ করবার উপায় তখন কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। নেতাদের অপেক্ষা করতে হল আরও দু'টি বৎসর।

সিমলা কনফারেন্স-এর কোন কথাই নেতাজির অজ্ঞাত ছিল না। প্রতিটি দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি রেডিও শুনে চলেছেন। সব খবরই নেতাজির কানে জঘন্য মনে হয়, একটি বাদে।—গান্ধী কনফারেন্সে যোগদান করেননি; তিনি যোগ দিলে এবং একটা-কিছু কথা দিয়ে ফেললে ফেরানো মুস্কিল হত।

নেতাজি এসেছিলেন ব্যাঙ্ককে। সেখান থেকে সোজা বিমানে চলে যান সিঙ্গাপুর। দিনের পর দিন, এর পর থেকে চলল তাঁর রেডিও বক্তৃতা। একমাস ধরে এই বক্তৃতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে গেছেন। একটা দিনও বাদ দেননি।

নেতাজি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন আসন্ন ভারত-মুক্তির ছবি। যুদ্ধে জয়ী হয়েও ইংরেজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। আকণ্ঠ ডুবে গেছে ঋণে। লোক-বল তার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমদানি ও রপ্তানির জাহাজের একটা বড় অংশ তার জলের তলায়। সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও ইংরেজ জয়ী হয়েছিল; কিন্তু অব্যবহিত পরই সে বাধ্যও হয়েছিল আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা দিতে। এবারও ইংরেজ বাধ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করতে। কিন্তু তারই পূর্বক্ষণে ইংরেজ শেষ চেষ্টা করে দেখবে ভারতবর্ষকে আরও কিছুকাল পায়ের তলায় রাখবার। আপোসের মাধ্যমে সামান্য ছিটেফোঁটা অনুগ্রহ বিলিয়ে ইংরেজ স্তব্ধ করে দেবে সংগ্রামী ভারতবর্ষের কণ্ঠ। সমগ্র শক্তি দিয়ে নেতাজি, তাই, একে রুখতে চান। একটু ধৈর্য, একটু সংযম; ইংরেজ পালাবার পথ পাবে না।

ইংরেজ রগড় দেখছে সিমলায়। লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে জিন্না আর কংগ্রেসের ভেতর। তার সদিচ্ছার তো অবধি নেই। বিলেতের পারলিয়ামেণ্টে ভারত সচিব এ্যামেরি বিগলিত হয়ে বক্তৃতা করেছেন। সদাশয়তা ঝরে পড়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন দেশের মর্যাদা নিয়ে এবার ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষের অনুকূলে বন্ধুর বেশে ইংরেজের পাশে দাঁড়াবে। এবং এ-আশাও তিনি আন্তরিকভাবে পোষণ করেন যে, ভারতীয় কংগ্রেস শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব অচিরেই গ্রহণ করবে।

এ্যামেরির এই ঘোষণায় নেতারা শুধু পুলকিত নয়, দস্তুর মতো আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রতার অবসান হতে-যে দেরি নেই, এই কল্পনায় অধীরও কম হননি। বাকি শুধু কংগ্রেসকে দিয়ে প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নেয়া। কংগ্রেসের পক্ষে এই পথই-যে শ্রেয়ের পথ, সে-কথা, তাই, তারা বলতেও শুরু করে দিলেন। (This statement created the general

impression in India that at last the Indian political problem would be solved……and there was no reason why Congress should not accept the offer.) (১)

১৯৪৫-এর জুন মাস সত্যিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সময়। ভারতবর্ষের অতি বিক্রমশালী চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যখন ইংরেজ বড়লাটের সিমলা-ভবনে অপর্যাপ্ত খানাপিনায় অতিব্যস্ত, ইংরেজের সামান্যতম অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ শাসন-দায়িত্ব লাভের ব্যগ্র সম্ভাবনায় আত্মহারা, সেই একই সময়ে ভারত সীমান্তের অদূরে এক জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে চলেছে এক অকুতোভয় উদ্দাম অবুঝ, যে কোনদিন নিজের কল্যাণ চাইল না। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক একদিন এই দুই মানসভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে, কিন্তু আশ্চর্য এদেশের জন-মানস,—এই বিসদৃশ রাজনৈতিক বৈপরীত্য কোন প্রকার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা কারও মনে জাগাতে পারেনি। ভারতবর্ষের একটি কণ্ঠ সেদিন কেন ও কী বলেনি। চায়নি কোন কৈফিয়ৎ। ওঠেনি কোন প্রতিবাদ।

ভারতীয় চিন্তাধারার এই উদাসীন শীতলতা হয়তো সহজাত। হয়তো 'মায়াময়মিদমখিলং'-চিন্তার এও এক বিশিষ্ট রূপ;—নেতাজি এ-কথা জেনে ও মেনেও সেদিন কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেননি। সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এক প্রবল প্রতিবাদ নেতাজির কণ্ঠে। ফল বা পরিণামের কথা তাঁর মনে জাগেনি। শুধু এই একটি কথাই তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল যে, তাঁর জ্ঞাতসারে দেশ ও জাতির অকল্যাণকর কোন কাজ কেউ যেন বিনা প্রতিবাদে না করতে পারে। সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়ে চলেছে: "…বন্ধুগণ, আমি এখানে আর্মচেয়ার পলিটিশিয়ান হয়ে বসে নেই। তা যদি থাকতুম, আজ নিশ্চয়ই এ-সম্বন্ধে কোন. কথা বলতে আমি চাইতুম না। কিন্তু আমার বন্ধুরা এবং আমি

(১) 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম'—আজাদ

এখানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত। রণাঙ্গনে আমরা মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করছি। যারা পেছনে আছে, তাদের জীবনও অনিশ্চিত বিপদের মধ্যে আকণ্ঠ ডোবা। যে-কোনো মুহূর্তে তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। বার্মায় থাকা কালে আমরা জীবন উপভোগ করেছি অনবরত বোমা ও মেশিনগানের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমার চোখের সামনে আমার প্রিয়তম বন্ধুরা নিষ্ঠুর শত্রুর গুলিতে মাটির বুকে লুটিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। কেউ কেউ অসহায় পঙ্গুর জীবন নিয়েছেন বরণ করে। আমেরিকার বিমান রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ হাসপাতাল আমারই চোখের সামনে সমভূমি করে দিয়েছে। রুগ্ন, আহত, উত্থান-শক্তিহীন আর্তেরা মরেছে অসহায় ভাবে।

"আমরা কয়েকজন আজো বেঁচে আছি। আছি শুধু ভগবানের কৃপায়। এবং বেঁচে থাকবার এই বিধিলিপি আজকের ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলবার ও দেশবাসীকে নির্দেশ দেবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাকে দিয়েছে। কার্পেট বম্বিং কাকে বলে, তোমরা কেউ জানো না ; যুদ্ধ-বিমান নিচু হয়ে যখন মেশিনগানের গুলি বৃষ্টি করতে থাকে, দেখেছো সে-দৃশ্য কোনদিন নিজের চোখে ? ভাবতে পারো সেই অবস্থা, যখন তোমার কানের দু'পাশ দিয়ে বুলেট ছুটতে থাকে একটার পর একটা ? এই অবস্থার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যারা বেঁচে আছে, বলতে পারো তাদের কাছে ওয়াভেল-প্রস্তাবের মূল্য কতটুকু ?"

সেদিন ক'জন ছিলেন, এবং আজও কি কেউ আছেন, যিনি বা যাঁরা নেতাজির সেই জীবন কল্পনা করতে পারেন ? ইটালী গেছে। জার্মেনী গেল। জাপানও যাবে। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে পিছু হটে নিজে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সিঙ্গাপুরের শেষ প্রান্তে। তারপর ?

এক সীমাহারা অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ ভ্রূকুটি দেখায় না ? আর ভিড় করে আসা ঐ নিবিড় কালো জমাট আঁধার ? কিন্তু তারই বুকে দাঁড়িয়ে এই অ-মৃতের সাধক নির্ভয় কণ্ঠে এ কী গান গাইছেন প্রাণ ভরে ?

নিজের কথা নয়, প্রাণ-প্রিয় পরিজন বা আত্মীয় কারও কথাও নয়, শুধু ভারতবর্ষ, আর তার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কথাই কি অন্তরে স্থান পেল না কোনদিন ?

বলেই চলেছেন : "লর্ড ওয়াভেলের অতি আধুনিক ভারত-কল্যাণ প্রস্তাব সম্পর্কে কী হবে ভারতবাসীর করণীয়, সে কথাটা আজ ভাবতে হবে। সময় খুবই সঙ্কীর্ণ। তাই প্রথমেই ওয়ার্কিং কমিটি যাতে ও-প্রস্তাব কোন ক্রমেই গ্রহণ না করে তার জন্য সর্বপ্রকারে বাধা দান করতে হবে। যদি তা সম্ভব নাই-ই হয়, এবং যদি ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেই ফেলে, পরবর্তী কর্মসূচী হবে, এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা; যার ফলে একজিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে কংগ্রেস সভ্যরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ-কাজ করা আদৌ কঠিন নয়। রাজবন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন দুর্দমণীয় করে গড়ে তুলতে হবে। এবং তা করতে গেলেই বড়লাট ও কাউন্সিলের মধ্যে গুরুতর মতভেদ অনিবার্য। এরই ফলে এমন সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য যা ইংরেজের নিশ্চিন্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করবেই। টাকা, সৈন্য, রসদ সংগ্রহের পথে টেনে আনবে নানা বিপত্তি…।

"হয়তো এ-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন ? যেমন করে পারো শত্রুর সরবরাহের পথ ধ্বংস করো। সাবোতাজ করো ওর পরিবহণ ব্যবস্থা।…গড়ে তোলো গুপ্ত সংস্থা দেশের সর্বত্র। ইংরেজের অবস্থান দুর্বিষহ করে তোলো। সংযোগ স্থাপন করো সৈন্যদের সঙ্গে। বিদ্রোহের সম্ভাবনা সফল করে তোলো। মনে রেখো, ১৯৩৯ আর ১৯৪৫-এর মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। আজ ভারতবর্ষে ইংরেজের হাতে গড়া ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ। এরা অনেকেই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। অনেকে জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী। কেউ কেউ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। হয়তো এই মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষিত কামনা পূর্ণ হবে না ; কিন্তু কামনা বেশিদিন অপূর্ণও থাকবে না। এই যুদ্ধের অবসান হলে এক বিরাট বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী।

"ঐ বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে অস্ত্র সংগ্রহ করবে। সেই অস্ত্রে যুদ্ধ করবে ইংরেজের বিরুদ্ধে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০-এ। শত্রুর অস্ত্র দিয়ে কেমন করে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়, সে-পরীক্ষা হয়ে গেছে।

"কমরেডস, একটা কথা ভুলে যেয়ো না: ব্যর্থতায় যার হতাশা আসে, সে বিপ্লবী নয়। বিপ্লবীর চিরন্তন প্রতিজ্ঞা একটিই,—'সফলতা চাই নিশ্চয়ই, কিন্তু ভয় পাবো না ব্যর্থতায়।'"

কবরের শান্তি ছিল সেদিন ভারতবর্ষে। ছিল অসহায়তার নিশ্চল নিস্তব্ধতা। রুদ্ধ কারাগারের অর্গল মুক্ত করে দিয়েছিল ইংরেজ। বেরিয়ে এসেছিলেন কারাগার থেকে অনেকে। এসেছিলেন গান্ধী, জহরলাল, আজাদ, প্যাটেল। এঁরা সবাই নিজেকে পরিশ্রান্ত মনে করেছিলেন। মনে করেছিলেন নিজেকে ক্লান্ত। কেউ গিয়েছিলেন কাশ্মীরের গুলমার্গে, কেউ শ্রীনগরে।

চির অশান্ত এক খেপা শুধু জানল না পরিশ্রান্ত হতে। বিশ্রাম নেবার কথা মনে উঠল না। একক এই আত্মভোলা সংগ্রামী স্বপ্ন দেখেই চলেছে সেই ক্ষণের আর আগামী দিনের। চোখের স্বপ্নালু নেশা কাটল না। কণ্ঠের নিঃসংশয় বিজয়ের অনাহত ধ্বনি থামল না।

অবিনাশী বিপ্লবী ছুটেই চলেছে আগে। আরও আগে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ বিপ্লবের ধ্বনি। সম্মুখে অশ্রান্ত বিপ্লবীর মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন।

কিন্তু ওরা বলে সুভাষ বোস ফ্যাসিস্ট। বলে ইংরেজ, বলে আমেরিকা। বলেছেন জহরলাল। আর বলেছে সেদিনের কম্যুনিস্টরা। কিন্তু কেন?

বন্দে মাতরম্ বলে অথবা গান্ধীর জয়ধ্বনি দিয়ে ইংরেজের জেলে ঢোকা আর জেলে দিন কয়েক থেকে বেরিয়ে আসাই স্বাধীনতার আদি ও অকৃত্রিম পন্থা,—এই সংস্কার সুভাষ বোস ভেঙেছিলেন বলে? শত্রুর এক চরম সঙ্কট-মুহূর্তে শত্রুকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে মিতালি করেননি

বলে? ওরা বলে এই কারণেই কি, যে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুভাষ বোস ভিন্ দেশের সাহায্য চেয়েছিলেন ও নিয়েছিলেন?

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বলা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু অনেক দিনের বন্ধু জহরলাল বললেন কেন? কেন বলল এদেশের অর্বাচীন তথাকথিত কম্যুনিস্টরা?

জহরলাল ও কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী সেদিন ছিল প্রায় অভিন্ন। যে পার্থক্য ছিল, তা ছিল সময়ের,—আদর্শের নয়। যুদ্ধের প্রথম থেকেই জহরলাল নেহেরু ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে ইংরেজই নাকি ডেমোক্রেসীর স্রষ্টা ও বাহন; খানিকটা হয়তো এই কারণে। কিন্তু ব্যাধি ছিল আরও গভীরে। জহরলাল নেহেরুর মনের গহন বনে। ইংরেজী সভ্যতা এই ব্যক্তিটি গ্রহণ করেছিলেন সর্ব-সত্তা দিয়ে। ইংরেজের প্রতি তাঁর এই নির্জলা ভক্তি তাঁকে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। এবং এই অহৈতুকী ভক্তির প্রাবল্যে জহরলাল নেহেরু ইংরেজের শত্রু সুভাষ বোসকে ইংরেজের কণ্ঠ অনুকরণ করে ফ্যাসিস্ট বলতে উৎসাহ বোধ করেছেন।

হিটলার রাশিয়ার ওপর আক্রমণ চালাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কম্যুনিস্টরা ছিল ইংরেজ বিদ্বেষী। ইংরেজের পরাজয়ে তারাও উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং অন্যান্য কংগ্রেসী ও সুভাষপন্থীদের সঙ্গে তাদেরও অনেকে স্থান পেয়েছিল ইংরেজের কারাগারে। কম্যুনিস্টদের মতটা পালটে গেল রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর থেকে।

এইখানেই খটকা। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে; কম্যুনিস্ট-মাত্রেই হিটলারকে শত্রু ভাববে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং বোধগম্যও। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে ইংরেজ রাতারাতি কম্যুনিস্টদের কাছে সাধু ও মিত্র হয়ে উঠল কেমন করে এবং কেন,—স্থির সিদ্ধান্তে আসা একটু কষ্টকর বৈকি।

সেদিনকার কম্যুনিস্টরা এর ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে এইভাবে: যেহেতু কম্যুনিজম একটি মতবাদ যা বিশ্বের শোষিত মানবের পরিত্রাণের

পক্ষে বিশিষ্ট, অনন্য এবং অপরিহার্য ; এবং যেহেতু এই কম্যুনিজমের একমাত্র ধারক ও বাহক রাশিয়া ; তাই, রাশিয়া বিশ্বের কম্যুনিস্টদের শুধু শ্রদ্ধারই পাত্র নয়, পরন্তু মুক্তি-পীঠও। সেই রাশিয়ার ওপর হামলা করে হিটলার জঘন্যতম পাপের নিয়ামক তো বটেই, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীও। তার সঙ্গে যে মিতালি করে সেও সম-অপরাধী।

অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নেই। এবং প্রণিধানযোগ্যও। কিন্তু প্রশ্ন নিরসন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জহরলাল নেহেরুর যুক্তি বুঝি। ইংরেজী ভাবের ভাবুক, ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার এবং ইংরেজী সভ্যতার অন্ধ স্তাবক জহরলালের পক্ষে ইংরেজ-সম্পর্কশূন্য স্বাধীনতা কল্পনা করা শুধু অসম্ভব নয়,—অকাম্য। সুতরাং।

কিন্তু এরা ? এদেশের কম্যুনিস্টরা ? এদেশের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ইংরেজের এই আত্মিক সম্পর্কের অবকাশ কোথায় ? শত্রু যখন এক, গ্রেট-বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে একটা সাময়িক চুক্তি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। গ্রেট-বৃটেন রাশিয়ার সমব্যথী। কিন্তু সমধর্মীও কি ? না। তবে এদেশের কম্যুনিস্টদের নিকট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চাইতে ইংরেজের স্বার্থ ও আপদ সহসা এমন বৃহৎ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল কেন ?

কারণ ছিল। এদেশের কম্যুনিস্টরা সেদিন পরিচালিত হত ইংরেজ কম্যুনিস্টদের দ্বারা। এবং বৈদেশিকনীতির বেলায় ইংলণ্ডের কম্যুনিস্ট, শ্রমিক, এবং টোরীদের মত ও কর্মধারা ছিল অভিন্ন ; এই কারণে।

সেদিনকার চীনেও কম্যুনিস্ট ছিল। তারা কী করেছিল ? রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তির গাঁটছড়া বাঁধবার পরক্ষণেই কি চীনের কম্যুনিস্টরা জাপানীদের জিন্দাবাদ গাইতে শুরু করেছিল ? জাপানীদের বন্ধু ভেবে নিয়েছিল ? না, যুদ্ধই তারা স্থগীত রেখেছিল ? চীনের কম্যুনিস্টরা রাশিয়ার শত্রু ছিল, না, মিত্র ছিল ?

পরদেশী এবং ফ্যাসিষ্ট হিটলার বা সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সাহায্য নিলেই যদি ফ্যাসিষ্ট হতে হয়,– রাশিয়াও কি সম অপরাধে অপরাধী

নয়? সেও কি হিটলার, জাপান ও শেষ মুহূর্তে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করেনি?

কোনও পরাধীন দেশ বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে এবং নিজের কৃতিত্বে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে, ইতিহাসে সম্ভবত এর নজির নেই। অতীতের গ্যারিবল্ডী থেকে সাম্প্রতিক চীন, সবাই বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং বিপ্লব সার্থক করতে পেরেছে। গ্যারিবল্ডী নিয়েছিলেন ফ্রান্সের সাহায্য; এবং ইংলণ্ডের সাহায্যও কম ছিল না। আয়র্লণ্ড নিয়েছে আমেরিকা ও ফ্রান্সের; স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকাকে নানাভাবে ফ্রান্স সাহায্য দিয়েছে; এ-ছাড়া জারমেনীর সাহায্য ছাড়া লেনিন কি রাশিয়ায় পৌঁছোতে পারতেন? না পারলে রাশিয়ার বিপ্লব কোন পথে যেত? আর চীন যদি রাশিয়ার সাহায্য না পেত?

হিটলারের ফ্যাসিবাদ সমর্থন করেন বলেই সুভাষচন্দ্র জার্মেনীতে গিয়েছিলেন, এ-কথা সত্য তো নয়ই,—তাঁর পরম শত্রুও এ-কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে সমর্থ হবে না। সুভাষচন্দ্র যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, তাঁর কথা ও নানা কাজের ভেতর দিয়ে রাশিয়ার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। উঠেছে তাঁর অজস্র বক্তৃতায় ও বিশ্লেষণে এবং নানা আলোচনায়। বস্তুত তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছিল পুরোপুরি রাশিয়ারই অনুকরণে ও আদর্শে।

এ-ছাড়াও বড় প্রমাণ আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার দিন তিনি কি মনের ভুলে রাশিয়ার নাম বাদ দিয়েছিলেন? এদেশের কম্যুনিস্টদের থিয়োরী অনুযায়ী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই তো তাঁর উচিত ছিল।

এ-প্রশ্নের সম্ভবত অকাট্য উত্তর দিয়েছেন একজন রাশিয়ান কম্যুনিস্ট। দিয়াকফ্। রাশিয়ার প্রখ্যাত ভাষা তত্ত্ববিদ অধ্যাপক এ, এম, দিয়াকফ্ কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সংবাদপত্রের

প্রতিনিধির কাছে তিনি বলেন : "সুভাষ বসু যখন বার্লিন বেতার হইতে অক্ষশক্তির পক্ষে প্রচার চালাইতেছিলেন, তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। সোভিয়েট সরকার যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন, তখন বৃটিশ সরকার সুভাষ বোসের নাম ঐ প্রচার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট সরকার উহাতে রাজী হন নাই।" ("যুগান্তর" পত্রিকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩)

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে পৌঁছেই নেতাজি জার্মেনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেয়েছিলেন। এবং এর কয়েকদিন পরই এ-সংবাদও তাঁর অজানা থাকল না যে, রাশিয়া জাপানকে আক্রমণ করেছে। জাপানের পরাজয় অনিবার্য ও আসন্ন, এ-কথা ভাবতে নেতাজিকে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। এই অবস্থায় তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার কথা ভাবা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। এবং তা তিনি ভেবেও ছিলেন। জাপানী সরকারকে এবং বার্মা ও সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত জাপানী রাজপুরুষদের অনতিবিলম্বে রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

জার্মেনী ছিল রাশিয়ার শত্রু। নেতাজি তাঁর বহির্ভারতীয় অভিযানের প্রথম অধ্যায়ে সেই জার্মেনীর মিত্র হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এ-কথা তিনিও ভুলে যাননি এবং রাশিয়ারও স্মরণ থাকবার কথা। এবং এ-কথাও অত্যন্ত সত্য যে, তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্বাপর রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষ সম্পর্কই রক্ষা করে গেছেন।

সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সেই মিত্র পক্ষের অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে রাশিয়ার মতান্তর দানা বেঁধে ওঠে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অদূর ভবিষ্যতে এই মতান্তর মনান্তরে পরিণত হতে কাল বিলম্ব করবে না, এ-ধারণা নেতাজির কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সেই দিনই। সেই ক্ষণের না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ-আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী

ও বিরুদ্ধ-পক্ষ রাশিয়াকে হতেই হবে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞান জনিত এই সিদ্ধান্ত নেতাজির মনে উদয় হয়েছিল সেই সময়েই। এবং সেই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ও অনিবার্য মনে করেই নেতাজি তাঁর পরবর্তী আশ্রয়স্থল ও বান্ধব হিসেবে সর্বাগ্রে রাশিয়াকে ভেবে নিয়েছিলেন। আর কোন দেশের কথা তাঁর মনে জাগেনি। জেগেছিল শুধু রাশিয়ার কথা। কেন জাগল? রাশিয়া ফ্যাসিষ্ট বলে? না, নেতাজি ফ্যাসিস্ট বলে?

॥ বার ॥

কিন্তু এ-প্রশ্নের শেষ উত্তর দিয়েছেন নেতাজি নিজেই।

"কমরেডস্, জাপানের সাহায্য গ্রহণ করেছি বলে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নই। জাপান ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেছে এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে জানিয়েছে বিধি-মতো স্বীকৃতি। কিন্তু যারা আজ ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ছটফট করছে, এবং ইংরেজের পক্ষভুক্ত হয়ে সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের অংশীদার হতে চাইছে, তাদের মতিগতির স্বরূপ কী? ইংরেজের রাজ-প্রতিনিধি ভাইসরয়-এর আজ্ঞাবহ হয়ে ভারত-শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা করবার কল্পনায় তাদের বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা মনে জাগলো না কেন? যদি তারা এ-কথা ভেবে থাকে এবং ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে যে, ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে, তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা···

"জাপানের সাহায্য নিতে আমি লজ্জা বোধ করিনি, এ-কথা আমি বলেছি। কথাটা আরো একটু পরিস্কার করে আমি বোলবো। মহা পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বর যদি তার অস্তিত্বের জন্য বিশ্বের দোরে দোরে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে ঘুরতে লজ্জা না পেয়ে থাকে, নতজানু হয়ে আমেরিকার দয়া ও দাক্ষিণ্যের পদপ্রান্তে ধর্ণা দিতে এবং সঙ্কোচ ও আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতে তার যদি প্রাণে ধিক্কার ও ঘৃণার উদ্রেক না হয়, ভারতবর্ষের মতো পরাধীন ও নিরস্ত্র একটি দেশ তার মুক্তির জন্য বন্ধু-দেশের কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জা বোধ করবে কেন,—এই কথাটিই আমার জিজ্ঞাস্য।"

আজকের কংগ্রেসে বামপন্থীর স্থান নেই। দেশের মুক্তিকামী বামপন্থীর প্রতিনিধিত্ব করবারও অধিকার, তাই, বর্তমান কংগ্রেসের

নেই। এ-কথা বলায় কংগ্রেসের বর্তমান নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এবং এই শ্রেণীর ক্ষিপ্ত কংগ্রেস-নেতারাই আমাকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন জাপানের কাছ থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি বলে।

"আজ আমরা শুধু জাপানের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়েছি ; কিন্তু আগামীকালের কথাটাও আমি এঁদের কাছে জানিয়ে যাই। অনাগত দিনে ভবিষ্যৎ-ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আমরা বিশ্বের আরো অনেক দেশের কাছে হাত বাড়াবো এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে দ্বিধা কোরবো না।"

নিঃসংশয় ঘোষণা। গ্লানিহীন অকপট বিশ্লেষণ। এবং পরবর্তীকালের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি এক আবশ্যিক নির্দেশও।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন শুধু বর্তমানের এক সীমিত, কৃপণ, ক্ষণস্থায়ী এবং ভাবাবেগ উদ্বেল মুহূর্তের জীবন নয়। এই আত্মপ্রত্যয়ী, অকুতোভয়, বস্তুনিষ্ঠ সংগ্রামীর জীবন সনাতন ভারতবর্ষের অবিনাশী তপস্যা, ক্ষুব্ধ ও নিপীড়িত ভারতবর্ষের বর্তমান মুমুক্ষু রূপ ও ভবিষ্যতের অপার মহিমান্বিত কল্পনা, স্বপ্ন ও বাস্তবের এক বিচিত্র সমাহার।

বৃটিশ শাসন কায়েমী হবার পর থেকে সম্মান দূরের কথা, আন্তর্জাতিক কোনও প্রকার স্বীকৃতিও ভারতের ভাগ্যে জোটেনি। বিশ্বের কাছে তার পরিচয় ছিল ইংরেজের পদানত এক আজ্ঞাবহ দাস বলে। বিশ্বের ঘৃণা ও উপেক্ষা কুড়িয়েছে সে গোটা দেড়শো বছর। পেয়েছে দুঃসহ ধিক্কার। বড় জোর কৃপা।

এই সর্বপ্রথম বিশ্বরাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সে পেল স্বীকৃতি। "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর এই সর্বপ্রথম আমরা আমাদের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে সমর্থ হলাম। এবং সেই গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃতি লাভ করলো বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ স্বাধীন দেশের।" (নেতাজির এই কথার প্রতিবাদে হয়তো এ-কথা বলা চলে যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো বৃহৎ তিনটি দেশ, আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি ; এ-কথার সত্যতা স্বীকার করেও একটা কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও

রাশিয়া অপেক্ষা সেদিনকার জার্মেনী, ইটালী ও জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য কম ছিল না। শত্রু ইংরেজ-আমেরিকা তাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি, এ-কথা সত্য, কিন্তু তাদের পক্ষেও সামরিক স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় ছিল না। চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় বিশ্ব সমর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে লিখছেন: "জেনারেল স্লীমের অধীনে ছিল ছ' ডিভিসন সৈন্য, দুটো আর্মারড্ ব্রিগেড; জাপানের আট ডিভিসন সৈন্য [জাপানীদের ডিভিসন গঠিত হয় কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে] এবং এক ডিভিসন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি'।"

এই সর্বপ্রথম শত্রু ইংরেজ তার প্রতিপক্ষ হিসাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বীকৃতি জানাল। এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্ব, অবদান ও দেশ-প্রেমের অতুল্য আখ্যায়িকা লাভ করল বিশ্বের ঐতিহাসিক মর্যাদা।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তির মনে বিশ্ব-রাজনীতি সম্পর্কে অনুধাবনতা ছিল। নেতাজি সুভাষ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। জহরলালের বেশিটাই ছিল আনুমানিক, অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রাকৃত। নেতাজি ও জহরলালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণের ধারাও এই কারণে সম্পূর্ণ পৃথক।

নেতাজির বিশ্লেষণ ও সমাধান সঙ্কল্প সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকরী। জহরলালের বিশ্লেষণে অবাস্তবের চমক ছিল, গমকেরও অন্ত ছিল না। এই অসাধারণ জলুস-প্রিয় ব্যক্তিটির শুধু পোষাকে ও পরিচ্ছদেই মধ্যযুগীয় নবাবী আমলের মানসিকতা প্রাধান্য লাভ করেনি, পরন্তু তাঁর কথা ও আচরণেও ছিল তারই অযথা প্রচার মুখরতা। মুখে অহরহ ডেমোক্রাসীর জয়গান করেও কার্যকালে একজন পাকা ও ঝানু ডিক্টেটার হতে তাঁর কুত্রাপি আটকায়নি।

নেতাজি প্রকাশ্যে ভবিষ্যৎ-ভারত সম্পর্কে সাময়িক ও সীমিত এক-নায়কত্বের কার্যকারিতা আলোচনা করেছেন, কিন্তু কি কংগ্রেসী জীবনে, কি আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়কের ক্ষেত্রে, প্রতিটি

সহকর্মীর মতামত জেনে তিনি কর্মসূচী তৈরী করতেন এবং সেই পথে চলতেনও।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পূর্ব-পর্যন্ত বিশ্বের রাজনীতি মুখ্যত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ছিল কম্যুনিজম, আর ছিল ফ্যাসিজম। জহরলাল সে-সময় নিজেকে পরিচয় দিতে চেয়েছেন কম্যুনিস্ট বলে।

নেতাজি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে পূর্বাপর ছিলেন অটল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নির্বাসিত জীবনে ইওরোপ থেকে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন যে, কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম কোনটার কাছেই তাঁর মাথা বাঁধা রাখতে তিনি রাজী নন।

হিটলার-বধের পর আর ফ্যাসিজম রইল না। বিশ্ব জুড়ে কম্যুনিজম উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। রাশিয়ার অবিশ্বাস্য শক্তি ও অনির্বাণ সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের বিপুল মানব-গোষ্ঠী কম্যুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হল। এদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চার্চিল ১৯৭৬-এর নির্বাচনে হেরে গেলেন মূলত এরই ফলে। গ্রেট বৃটেনের গায়েও সেদিন কম্যুনিজম দোলা দিতে ছাড়েনি। এর হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতির আশায় সেদিন কঠোর সংরক্ষণশীল ইংরেজ তার পরিত্রাতা চার্চিলকে ভুলতে বাধ্য হয়েছিল। জিতিয়ে দিয়েছিল নকল কম্যুনিজম-এর ছায়ারূপ শ্রমিক দলকে।

অপর দিকে ইংরেজকে স্থানচ্যুত করে আমেরিকা গ্রাস করল বাকি পৃথিবীটাকে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী, ধনতন্ত্রী ও শোষক শ্রেণীর এবং ভিখিরী দুনিয়ার মাতব্বর হয়ে বসল আমেরিকা।

বিশ্ব-রাজনীতি-ক্ষেত্রের এই আকস্মিক পট পরিবর্তনে কম-বেশি সব দেশ ও ব্যক্তিই খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য সব চাইতে বেশি হারিয়ে ফেলেছিলেন সম্ভবত জহরলাল ও তাঁর পরিচালিত ভারতবর্ষ।

কিন্তু নেতাজি-জীবনে এই বিভ্রান্তি কোন ক্ষেত্রে এবং কোন দিনই লক্ষিত হয়নি।

বস্তুত নেতাজি ও জহরলালের চারিত্রিক মৌল উপাদানের মধ্যেই বিলক্ষণ পার্থক্য ছিল। বাল্যকাল থেকে সুভাষচন্দ্রের মনে একান্ত গভীর ও তীব্র হয়ে উঠেছিল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। জহরলাল সে-সুযোগ পাননি।

বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভ জহরলালের গড়ে উঠেছে বিদেশে ও বৈদেশিক প্রভাবে। সেখানে চারিত্রিক যে রীতি ও নীতিবোধ তাঁকে জীবনের অনাগত লিপ্সা ও উচ্চাশার মূলধন যুগিয়েছিল, সেখানে বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দির উচ্চ প্রেরণা ও উর্ধ্বমুখী সঙ্কল্পের উপাদান ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দির বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার পরিকল্পনায় খানিকটা আধ্যাত্মিক প্রাচীনত্ব ও মিষ্টিসিজিম-এর ছোঁয়াচ ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু ওকে আশ্রয় করে যে উন্নত পারিপার্শ্বিকতা বাংলায় গড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল, সুভাষ তারই কোলে লালিত ও পালিত।

বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ আর সুভাষ-জীবনের প্রারম্ভ একই কালে। সুভাষ-জীবনের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটেছিল এই বিস্ময়কর নতুন প্রভাতের অরুণোদয়ে। তাঁর সমস্ত চেতনার অঙ্গে ছিল, একদিকে শুচিতা, দেশ ও জাতির প্রতি অখণ্ড মমত্ব, স্বাধীনতার আশ্চর্য প্রেরণা; অন্যদিকে বিংশ শতাব্দির অসহিষ্ণুতা, বীর্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উগ্র উন্মুখতা এবং খানিকটা আত্মপ্রত্যয়ের আধিক্য স্থান করে নিয়েছিল।

সুভাষের কি স্বাদেশিকতা, কি স্বাধীনতা-কামনা, কোনটাই আকস্মিক নয়। জহরলালের ঠিক বিপরীত। একদা অতি অকস্মাৎ তাঁর প্রাণে 'স্বদেশী' হবার কামনা জেগে উঠেছিল এবং যে দেশ-প্রেমের প্রাবল্য ১৯১৯-এর পর একান্ত ত্রস্ততায় তাঁকে কর্মক্ষেত্রে টেনে নামিয়েছিল, তা শুধু চমকপ্রদই নয়,—তাঁর স্বভাব, স্বধর্ম ও দীর্ঘদিনের অর্জিত শিক্ষা-দীক্ষারও বিপরীত। (আত্মচরিতে তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন।)

এবং এরই ফলে যে স্বদেশ-প্রেম তাঁর জীবনে এনে দিন আমূল

পরিবর্তন, তার ভিত ছিল দুর্বল এবং তাড়াহুড়ো করে গাঁথা বলে খানিকটা ভঙ্গুরও। পরবর্তী জীবনে, তাই, তাঁকে জীবন-বোধ ও বাস্তবতার এক তীব্র ও তিক্ত সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রতি পদে।

এই কারণে ১৯৪৭-এর পর জহরলালকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বার বার। সেই চিরন্তন মস্তিষ্ক ও হৃদয় দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর নীতি সস্তা খেলায় পর্যবসিত হয়েছে (মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব কথাটা নেপোলিয়নের। জহরলাল নেপোলিয়নের দস্তুরমতো পূজারী ছিলেন। এই সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমসনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ দ্রষ্টব্য) একবার রাশিয়া, পরক্ষণে আমেরিকা পৃথক ভাবে, এবং বহুক্ষেত্রে একই সময়ে সমভাবে তাঁকে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে জহরলালের জীবন-দর্শনে কোন স্থির সঙ্কল্প অথবা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ স্থান করে নিতে পারেনি ; এবং কোনদিনই তা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েও ওঠেনি।

কিন্তু নেতাজির পরিস্ফুট প্রজ্ঞানে ১৯৪৫-এই সমরোত্তর পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ-রূপ সম্যক ধরা দিয়েছিল। তিনি সেই দিনই আগামী দিনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ইতি কর্তব্য স্থির করতে কোন সংশয়ও তাঁর মনে জাগেনি।

২১শে মে (১৯৪৫) ব্যাঙ্ককের এক সভায় তিনি বলেছিলেন : "বন্ধুগণ, এ-যুদ্ধের অনেক বিস্ময়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষাও করছে। আর সেই অনাগত বিস্ময়গুলি আমাদের শত্রুপক্ষের খুব প্রিয় বলেও মনে হবে না। আমি এ কথা অনেকবার বলেছি যে, জার্মেনীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ও ইঙ্গ-আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে বিলক্ষণ ফাটল দেখা দেবে। বলা বাহুল্য সে-ফাটল দেখা দিয়েছে। দিন যাবে, আর ফাটলের মুখ বিস্তৃত হতে থাকবে। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন আমাদের শত্রুরা বুঝতে পারবে যে, যেদিন আর যে-মুহূর্তে জার্মেনীর পতন হয়েছে, সেই দিন আর সেই মুহূর্তে ইউরোপের অভ্যন্তরে জার্মেনীর চাইতেও বড় আর এক প্রবল শক্তির প্রবেশ-পথ তারা উন্মুক্তও করে দিয়েছে। সেই শক্তি

সোভিয়েট রাশিয়া। জার্মেনীর চাইতেও সোভিয়েট রাশিয়া ইঙ্গ-ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বৃহত্তর শত্রু, এ-কথাটা ওরা জানতো না। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক এই ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করে চলেছে এবং সময় ও সুযোগ মতো তার সদ্ব্যবহার করতে সে ভুলবে না। আমাদের বৈদেশিক নীতির মৌল সিদ্ধান্ত একটিই এবং তা এই : বৃটেনের শত্রুই ভারতের বন্ধু।

"আমরা জানি যে, জার্মেনী ছিল সোভিয়েট এবং ইঙ্গ-আমেরিকার সাধারণ (common) শত্রু। কিন্তু এ-কথাও আমরা বিলক্ষণ জানি যে, সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধের নীতি ও কারণ ইঙ্গ-আমেরিকার নীতি ও কারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। এ কথা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো কনফারেন্স-এ। রাশিয়ার বৈদেশিক কমিসার মোলোটোভ ভারতবর্ষ এবং ফিলিপাইনের দুই পুতুল প্রতিনিধিকে আদৌ আমলই দেননি। নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরো যে ব্যাপক ও গভীর সংঘাত ঘনীভূত হয়ে আসছে সোভিয়েট রাশিয়া আর ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠীর মধ্যে, এ তারই অনাগত কিন্তু নিশ্চিত ইঙ্গিত। এই সংঘাত থাকবে এবং ক্রমশ বেড়েই চলবে। আমরাও আমাদের প্রধান শত্রু ইংরেজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই চলবো।"

২৫শে মে (১৯৪৫) সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজি যে রেডিও ভাষণ দেন, তাতে তিনি আরও পরিস্ফুট : "...যুদ্ধোত্তর ইওরোপের পুনর্গঠনের নামে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠী উন্মুখ হয়ে উঠবে ইওরোপের অভ্যন্তরে প্রধান মুরুব্বির ভূমিকা অভিনয় করতে; কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তা করতে দেবে না। বাধা দেবে।

"পরাজয়ের পূর্বে যুদ্ধোত্তর ইওরোপের জন্য জার্মেনীর একটা পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু সে পরাজিত। আর একটি রাষ্ট্রেরও নতুন পরিকল্পনা আছে। রাশিয়ার।

"আমেরিকা চায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তার 'আমেরিকান শতাব্দি' চালু করতে। তার সে-চাওয়া কোনদিনই সফল হবে না। তাছাড়া

ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-আমেরিকান আদর্শ আজকের ইওরোপের গ্রহণ-কাম্যও নয়।....

"মার্শাল স্ট্যালিনের ওপর সমগ্র ইওরোপের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। সাগ্রহে যুদ্ধোত্তর ইওরোপ দেখে চলবে স্ট্যালিনের প্রতিটি পদক্ষেপ..."

এই নেতাজি এবং এই তাঁর দূরদৃষ্টি। বিচক্ষণ বিশ্লেষণের অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল, প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তে দৃঢ়, আর বড়ই চেনা তাঁর আগামী কাল ;— যা জহরলাল নেহেরুর কোনদিনই ছিল না।

এবং নেতাজির এই রূপের সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকার পরিচয়ও বড় কম ছিল না। সিঙ্গাপুরের পতনের অব্যবহিত পর নেতাজি অবিশ্রান্ত বক্তৃতা দিয়েছেন বার্লিন থেকে। তাঁর সেই উদ্দীপ্ত অনল প্রবাহে ভয় পেয়েছিল ইংরেজ। দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল আমেরিকার। সেদিন সিঙ্গাপুর থেকে যে বিপর্যয়ের বিপন্ন বারতা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের সর্বত্র, তাতে ইংরেজের মনে আগামী দিনের এক অসহায় বিপর্যস্ত রূপ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কয়েকদিন পূর্বে সিঙ্গাপুর থেকে লণ্ডনের 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রতিনিধি তার করেছিলেন : "বোসের অভূতপূর্ব প্রচণ্ড বেতার প্রচার চলেছে অবিরাম।" (A wireless campaign of unprecedented vehemence) লণ্ডনের সাপ্তাহিক ট্রিবিউন লিখেছিল : "ভারতীয় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।" (Indian revolution is on.)

১৯৪২-এর ১৬ই মার্চ আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' লিখেছিল : "বোস-বিরোধিতার কামান গর্জে উঠেছে। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও সম্ভবত কামানের মুখ বন্ধ করবার সময় আছে। প্রধান মন্ত্রিত্ব ও দেশরক্ষার দায়িত্ব নেহেরুকে দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিতে হবে।...ভুল করো না। সুযোগ ও সুবিধার ইঙ্গিত বলে একে ভুল বুঝো না। এ-ইঙ্গিত ইতিহাসের রুদ্র আঘাত।" (There is only one possible chance to make up a little of the lost time still to spike the guns of the Bose

opposition. Nehru must be asked to become Prime Minister and Minister of Defence···Make no mistake. This is not opportunity knocking at our door, it is history battering down.) (১)

এদেশের লোক অনেক সময় জহরলালকে চিনতে পারেনি। ভুলও বুঝেছে। কিন্তু চিনেছিল ইংরেজ। চিনেছিল আমেরিকা। এবং তারা ভুল করেনি।

তাই, একজন ইংরেজের এ-কথা বলতে বাধল না যে, জহরলাল ইংরেজেরই হুবহু প্রতিবিম্ব। (Nehru is the curbon copy of English man.—Lastdays of British Raj by Leonard Mosle.)

পক্ষান্তরে আর একজন লেখক, তিনিও ইংরেজ,—মাইকেল এডওয়ার্ড্‌স, তাঁর 'লাষ্ট ইয়ার্‌স্ অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে নেতাজি সম্পর্কে অনেক আলোচনা করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে: "···ফলত ভারতবর্ষ তাঁর কাছে (সুভাষের) যতটা ঋণী, ততটা আর কারও কাছেই নয়····" ("···In a sense, India owes more to him (Bose) than to any other man····")

মালয়ে তখনও মিত্রপক্ষ প্রবেশ করেনি। বিনা যুদ্ধে যেন মালয়ের একটি ইঞ্চি ভূমিও শত্রু দখল করতে না পারে,—নির্দেশ দিলেন নেতাজি। জরুরি কাজে সেরামবামে চলে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি।

সংবাদের যেন আর বিরাম নেই। আসছেই একটার পর একটা। প্রথমে এল, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ।

---

(১) Leadership and Political Institutions of India নামক আমেরিকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ; সম্পাদক আর, এল পার্ক এবং আইরীন টিঙ্কার। (সর্বপ্রথম এদেশে যুগবাণী আলোচনা করেছিলেন।)

পরক্ষণেই টেলিফোন বেজে উঠল। এ্যাটম বোমা পড়েছে হিরোসিমা আর নাগাসাগিতে। একটি লহমায় দুটি জীবন্ত আর লোকারণ্য জনপদ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। চাকা ঘুরছে। কালচক্রের বিরামবিহীন বিবর্তন।

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। মিত্রপক্ষের অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন যে, জাপান একা হলেও তাকে পর্যুদস্ত করা সময় সাপেক্ষ। হয়তো সেই অপেক্ষাটা একটু দীর্ঘ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু দীর্ঘ হল না। নিমেষে হয়ে গেল।

দানব হিটলারের গোপন কক্ষে নাকি এক বিশেষ ধরণের মারণ-অস্ত্র মজুত ছিল। হিটলার কী ভেবে সে-অস্ত্র প্রয়োগ না করেই আত্মহত্যা করে বসলেন। দানবের খেয়াল বোঝা সত্যিই মুস্কিল।

আমেরিকা সুসভ্য। ভগবানের ওপর ভক্তি ও বিশ্বাসও কম নয়; তাছাড়া শাসক গোষ্ঠীও হিটলারের মতো দানবীয় নয়। এ্যাটম বোমা ছুড়ে জাপানীদের ভব-যন্ত্রনা শেষ করে দিল। কন্‌সেন্‌ট্রেশন্‌ ক্যাম্পের হৃদয়হীনতা ব্যথিত করেছিল সুসভ্য শ্বেতাঙ্গদের। অশ্বেত জাপানী মেরে বাহোবা পেল আমেরিকা।

আবার টেলিফোন বেজে ওঠে। মালাক্কার খবর। সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের ডঃ লক্ষনাইয়া ও গণপতি মোটরে আসছেন আরও গুরুতর সংবাদ নিয়ে। সেরামবামে ওঁরা রাত দুটোর মধ্যেই পৌছে যাবেন।

১০ই আগষ্ট, ১৯৪৫।

খেতে বসেছিলেন নেতাজি। চিন্তার রেখা ওঁর ললাটে ফুটে উঠেছিল বই কি। চারদিক থেকে কালো একটা যবনিকা ওঁকে ঢেকে ফেলতে ছুটে আসছে। স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ ওর রূপ। ভয়ঙ্কর।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একদা পৌছে গিয়েছিলেন। আজ দাঁড়িয়ে আছেন সিঙ্গাপুরের প্রান্তে। দৃষ্টি পীড়িত করেও আর ভারতের তীরভূমি নজরে পড়ে না। অবলুপ্ত হয়ে গেল ভারতের রেখা দৃষ্টির গোচর থেকে। প্রত্যক্ষ শুধু সুনীল জলধি। তারপর?

বাইরে শব্দ হল। গাড়ি এসে ঢুকল গেষ্ট হাউসের হাতার ভেতর। ধুলোয় গাড়িখানা ঢাকা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন লক্ষণাইয়া আর গণপতি। নেতাজিকে জানানো হল। ডাক পড়ল ওঁদের।

"দোতলায় ছিলো নেতাজির ঘর। একখানা টেবিলের সামনে বসেছিলেন। গায়ে শুধু গেঞ্জি। পায়ে টপবুট। বুস-সার্টটা খুলে রেখেছেন। ঘরে বেশ গরম। সামনের তীব্র আলো পড়েছে নেতাজির মুখের ওপর। লক্ষণাইয়া ও গণপতি এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্যালুট করে বললেন,—'জয়হিন্দ'। নেতাজি ইঙ্গিতে জানালেন বসতে। ওঁরা আর আমি টেবলের অপর প্রান্তে বসে পড়লাম। আমাকে নেতাজি ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। লক্ষণাইয়ার দিকে ঘুরে নেতাজি জিজ্ঞেস করলেন : 'এইবার বলো। কী সংবাদ এনেছো?'

"লক্ষণাইয়া চেয়ারখানা একটু টেনে নিলেন নেতাজির দিকে। ঝু'কে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন : 'জাপান আত্মসমর্পণ করেছে সার।'

"কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকালাম নেতাজির মুখের দিকে। মাথাটা আমার ঘুরে উঠেছিলো। রাজ্যের কথা প্রবল বেগে আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত করে তুললো।

"এইবার তাহলে সব শেষ। এই অসাধারণ মানুষটি গত চব্বিশটি মাসে যা গড়ে তুলেছিলেন, সে সবেরই সমাধি হয়ে গেলো। কিন্তু সত্যিই কি সব শেষ? ওঁর সকল স্বপ্ন, সকল কর্ম, সকল উদ্যম এই মুহূর্তে সবই হয়ে গেলো নির্মূল? একটি মহান জীবনের সাঙ্গ হয়ে গেলো সব? এই মর্মান্তিক আঘাত উনি সহ্য করবেন কেমন করে? একে স্বীকারই-বা করে নেবেন কী ভাবে? না, আশা করবার আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না। সামনে শুধু অন্ধকার। গাঢ়। ভয়ঙ্কর।

"এই সীমাহীন আঁধার ওঁকে গ্রাস করতে আসছে। সত্যিই গ্রাস করবে? অথবা আঁধার কেটে আবার উনি বেরিয়ে আসবেন? আবার সৃষ্টি করবেন নতুন রণাঙ্গন? উনি কি পরাজয় স্বীকার করে নেবেন? এই আঘাতে পড়বেন মুষড়ে? না, নবতম শক্তি নিয়ে স্বাধীনতার নতুন

সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন ?" বলে চলেছেন নেতাজির সাথী আয়ার সাহেব। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী।

আয়ার বলেই চলেছেন : " 'হুঁ' "। ঐ একটিমাত্র শব্দ বেরিয়ে এলো নেতাজির কণ্ঠ থেকে। শব্দটা প্রায়ই নেতাজি ব্যবহার করতেন। মুহূর্তে সমস্ত অবয়ব স্থির হয়ে গেলো। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই শান্ত স্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠলো সেই মুখে। একটু নড়ে-চড়ে বসে বললেন : 'এইতো ? ব্যস। এরপর ?'

"নেতাজি নয় শুধু, তাঁর ভেতর থেকে চিরন্তনের এক অপরাজেয় সৈনিক কথা কয়ে উঠলো।"

"চলতে থাকলো স্বাভাবিক এবং বাস্তব হিসেব-নিকেশ আর সেই দুর্যোগের বিশ্লেষণ। বসে বসে ভাবনা করবার সময় কোথা ? যা করবার, করতে হবে অনতিবিলম্বে। কোথায় শুরু হবে আবার পরবর্তী সংগ্রাম ? যুদ্ধ শেষ হয়নি। জাপানের হতে পারে। কিন্তু মুক্তি-ফৌজের যুদ্ধ চলবে আরো অনেক অনেক দিন ধরে। শত্রুকে পরাজিত না করে মুক্তি-ফৌজের বিশ্রাম নেই। তারা তাই থামবে না কোন ক্রমেই। থামবে না ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত। জাপানের আত্মসমর্পণ মানে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ নয়।

"মুখে ফুটে ওঠে আবার সেই অনবদ্য হাসি। নানাপ্রকার চুটকি কথা আর সরস মন্তব্য মুখ থেকে বেরোতে থাকে অনবরত।"

নেতাজি। গীতা বিগ্রহ। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।

জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মুখে দাঁড়িয়ে হেসে চলেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী যোগী।

জয় আর পরাজয় সমজ্ঞান করে এক খাপ খোলা তলোয়ার এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম ক্ষেত্রে।

"আবার হাসি। আবার কথা। রাত গভীর হতে চলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন : 'সবাই আত্মসমর্পণ কোরলো। করিনি শুধু আমরা'।"

নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আয়ার সাহেব দেখে চলেছেন এই দেব-দুর্লভ মানুষটিকে।

রাত তিনটে বেজে গেল।

নির্দেশ ছুটে চলেছে। একটার পর নতুন আর একটা।

রাঘবন আর স্বামী আছেন পেনাং-এ, আর থিবি আছেন ইপোতে। সিঙ্গাপুরে তাঁদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ইনায়েৎ খাঁকে তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলা হল। তাড়াতাড়ি ওঁদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছোতে হবে। নেতাজির সঙ্গে সিঙ্গাপুরে ওঁদের দেখা হওয়া চাই।

"আমি যাবার উপক্রম করছিলাম। সহসা আমাকে থামিয়ে নেতাজি বলে উঠলেন: 'ইনায়েৎ খাঁকে বলে দাও গাড়িতে প্রচুর তেল নিতে। আগামী কাল থেকে তেলের প্রয়োজন আমাদের ফুরিয়ে যাবে।' শেষ করলেন নেতাজি। তখনো সেই মুখখানায় হাসি লেগেই ছিলো। নিভে যায়নি।" বলছেন আয়ার।

রাত চারটে তিরিশ।

লক্ষ্মণাইয়া আর গণপৎ চলে গেলেন। বারান্দায় এসে বসলেন নেতাজি একখানা বেতের চেয়ারে। পাশে আয়ার। স্তিমিত আলো। ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। বসেই আছেন। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সহসা বলে উঠলেন: "এ অধ্যায় শেষ। পরেরটা এইবার আমাদের ভাবতে হবে।"

পাঁচটা বেজে গেল।

আয়ার তাকিয়ে আছেন নেতাজির মুখের দিকে। হয়তো চেষ্টা করেছিলেন এই মানুষটির মনের কথা বুঝতে। হয়তো চিন্তার গভীরতা আন্দাজ করতে চেয়েছিলেন। পেরেছিলেন কি?

একটু দ্বিধার সঙ্গেই আয়ার বললেন: "বারো মাইল আমাদের মোটরে যেতে হবে স্যার; রাতও শেষ হয়ে এলো। একটু গড়িয়ে নেবেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল : "কাল থেকে বিশ্রামে আর কেউ বাধা দিতে আসবে না আয়ার। অফুরন্ত বিশ্রাম আমাদের সামনে।"

বিশ্রাম নেতাজি নেননি। আয়ার নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। শুয়েও ছিলেন বিছানায়।

আর নেতাজি ?

নিদ্রালু উষার আবছায়া আঁধার গায়ে জড়িয়ে দু'টি অতন্দ্র আঁখি দিয়ে তিনি কি দেখছিলেন ? খুঁজছিলেন কাকে ?

এক অনিশ্চিত অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বিষন্ন করুণ জিজ্ঞাসা কি কোনও কথাই বলেনি কানে? ছিল না কোন চাওয়া? কিছু বলার? কিছু জানার?

"নিচে নাবতেই দেখা হলো নেতাজির সঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছেন। সারা মুখখানা তাজা ফুলের মতোই নিটোল আর ঢল ঢল। সারারাত যেন ঘুমিয়েই কাটিয়েছেন। দুঃখও বিষাদের চিহ্ন নেই সে-মুখে। মনে হলো, আর একটা নতুন বিজয়-অভিযানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজি।" (১)

বেশ মাঝারি গোছের একটি কনভয় যাত্রা করল সিঙ্গাপুরের দিকে। প্রথমে একখানা লড়ি, সশস্ত্র প্রহরী ওতে। তারপরই নেতাজির গাড়ি। আয়ারকে বসিয়ে নিলেন পাশে। ড্রাইভারের পাশে বসলেন সমশের সিং; নেতাজির এ. ডি. সি। তারপরের গাড়িতে মেজর জেনারেল আলাগাপ্পান, কর্ণেল নাগার, কর্ণেল কিয়ানি। পেছনে চলল সত্য সহায়ের গাড়ি; বোঝাই মালপত্তর ও খাদ্য দিয়ে। গাড়ির মাথায় সহায় পাহাড় জমিয়েছেন কলা দিয়ে; পাকা, আধপাকা, কাঁচা। কলা সিঙ্গাপুরে দুষ্প্রাপ্য।

মাঝে মাঝে গাড়ি থামে। নেতাজি গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যান সহায়-এর গাড়ির ধারে। সহায়কে বলেন : "রাস্তার গরীব-গুর্বোদের কিছুটা কলা দিয়ে দাও সহায়, নইলে কিন্তু সূর্য্যিমামাই সাবড়ে দেবেন।"

(১) 'আন টু হিম এ উইটনেস'—আয়ার

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। শুধু সহায় একটু কুঁকড়ে যান। পরক্ষণে তিনিও হেসে ওঠেন।

অপরাহ্ন সাতটা তিরিশ। নেতাজি পৌঁছে গেলেন সিঙ্গাপুরে।

অবিলম্বে মেজর জেনারেল কিয়ানি ও কর্ণেল হবিবর রহমানকে ডেকে পাঠানো হল। তারপরই শুরু হল পরামর্শ সভা। চলল নৈশ ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত। আহারের পর বারান্দায় কফি দেয়া হল। সেখানেই কাটল রাত তিনটে পর্যন্ত।

নেতাজির বাংলো। সামনে বারান্দা। বারান্দার পরই প্রশস্ত অঙ্গন। সবুজ ঘাসে ঢাকা। অদূরে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। নীল। অশান্ত গর্জনে আছাড় খায় অবিশ্রান্ত।

জাপানের আত্মসমর্পণের সরকারী ঘোষণা তখনও জানা যায়নি।

নিবিষ্ট হয়ে সবাই রেডিও শোনেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ধরা হয় বি. বি. সি; এ. আই. আর; টোকিও; ওয়াশিংটন আর মস্কো। গোনা ক'টি ঘণ্টা হাতে। মুহূর্ত অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই। যা করবার করতে হবে কাল বিলম্ব না করে।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া জুড়ে রয়েছে সঙ্ঘের শাখা। বিভিন্ন স্থানে রয়েছে ফৌজের শিক্ষা-কেন্দ্র। তাদের কাছে নির্দেশ পাঠাতে হবে। জাপানের আত্মসমর্পণের সরকারী সংবাদ আসেনি; কিন্তু আসবে। আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। তখন আর সময় থাকবে না।

মিত্রপক্ষ বলতে শুরু করে দিয়েছে যে, জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।

১৩ই আগস্ট চলল বিরাম বিহীন কাজ। শেষ মুহূর্ত আগত প্রায়। ওঁৎ পেতে রয়েছে শত্রু। এগিয়ে আসছে ওর সন্ধানী চোখ।

ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর প্রায় ৫০০ মেয়ে। নেতাজির দুশ্চিন্তা সব চাইতে বেশি ওদের নিয়ে। ওদের মর্যাদা কি ইংরেজ রাখবে?

আর ইজ্জৎ? ওরা কি পারবে নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে? ললাটে ফুটে ওঠে গভীর রেখা। উৎকণ্ঠার গভীরতা বোঝা যায় ওঁর চোখ দেখে।

ডেকে পাঠান ক্যাপটেন মিসেস থেবরকে। নির্দেশ দেন এই বলে যে, প্রতিটি মেয়ে যেন যার যার ঘরে পৌঁছোয়। প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে বেশি করে অর্থ দেবার কথাও বলে দেন।

এরপরই সেই ছেলে ক'টির কথা: জাপানে ওরা গেছে সামরিক শিক্ষার জন্য। বালক ওরা। ওদের এই একান্ত বর্তমান, আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ওরা কী করবে? কে দেখবে ওদের? নেতাজির দুশ্চিন্তার অবধি নেই।

১৪ই আগস্ট, অপরাহ্ন।

একটা দাঁতের গোড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দাঁতটা তুলে ফেললেন। রক্তপাত হল প্রচুর। ডাক্তার অনেক করে বললেন খানিকটা সময় অন্তত শুয়ে থাকতে। ভালো হয় যদি গোটা দিনটা বিশ্রাম নেন নেতাজি, একথাও ডাক্তার বলেছিলেন।

বিশ্রাম! তাও এই সময়ে!

বিধাতা ললাটে বিশ্রাম লিখলেন কবে?

এক নিস্পন্দ দেশ ও জাতির কোলে জন্ম নিল এক অশান্ত ঝড়।

অপরাহ্ন চারটের সময় অবকাশ মিলল একটু গড়িয়ে নেবার। শয্যায় শুয়ে পড়লেন। হয়তো-বা চোখ দুটোও বুজতে চেয়েছিলেন ;— একেবারে শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল ছোট ছোট কয়েকটি মেয়ে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর জীবন-কথা নিয়ে ওরা নাটক করবে। নেতাজির সেখানে না গেলেই নয়। যেতে হবেই। চললেন।

চমৎকার অভিনয় করল মেয়েরা। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা অপূর্ব শিহরণ বয়ে গেল সবার মনে। সবাই জানে আসন্ন দুর্যোগের ঘনঘটা। ভুলে গেল। সবাই দেখতে পায় অস্পষ্ট

ভবিষ্যতের কালা বোবা রূপ। তাই-বা মনে রইল কোথায়? এক সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। দাঁড়িয়ে গাইছে সবাই। সকলের মাঝখানে তাদের নেতাজি। উঁচু মাথা। নয়নাভিরাম রূপ। অধরে মধুর হাসি। তিন সহস্র সৈনিক আর শত শত রাণী বাহিনীর মেয়ের কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল :

শুভ শুখ চৈন—

শেষবারের মতো সিঙ্গাপুরের সৈকতে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর তাদের সর্বাধিনায়ক মিলিত কণ্ঠে গাইছেন ভারত বন্দনার ভাগবত সঙ্গীত।

আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী-সভা সিদ্ধান্তে এসে গেছে। নেতাজিকে শত্রুর হাতে বন্দী হতে দেয়া হবে না। কোন মতেই না। পৃথিবীর যে-প্রান্তে শত্রু ইংরেজের হাত পৌঁছোবে না, নেতাজিকে সরিয়ে নেয়া হবে সেইখানে। কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়াল একটি প্রবল বিরুদ্ধ মত। নেতাজি রাজী নন। এই সিঙ্গাপুরে দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি তাঁর মন্ত্রী আর সেনাপতিদের নিয়ে। ইংরেজ আসুক। বন্দী করুক সবাইকে।

মুহূর্তকাল সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। একটা সোচ্চার ঘোষণা। অপরাজেয় মুক্তিকাম সৈনিক রুখে দাঁড়াতে চাইছে শেষবারের মতো। শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াতে চাইছে। ইংরেজের মুখোমুখী।

কিন্তু ইংরেজ বিজয়ী ;—স্বীকার করে নেবে এ-কথা আজাদ হিন্দ সরকার আর ফৌজ? শেষ হয়ে যাবে না আজাদী সংগ্রাম চিরতরে? আবার কতকাল ভারতবর্ষ থাকবে মরার মতো উদ্ধত বিজয়ী ইংরেজের পায়ের তলায় পড়ে?

নেতাজি শুধু একজন মানুষ নন ; একজন সৈনিক নন ; যে-কোন মানুষ বা সৈনিকও নন। বিদ্রোহী এবং আগামী বিপ্লবের মূর্ত বিগ্রহ নেতাজি। তিনি বেঁচে থাকলে, থাকলে মুক্ত,—পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুন,—সমাপ্তি নেই আজাদী সংগ্রামের। বিপ্লবের জ্বলন্ত আর

জীবন্ত রূপ ধরে আবার তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন সমগ্র জাতিকে। ডাক দেবেন বজ্র নির্ঘোষে। বলবেন—চলো দিল্লী।

নেতাজির মৃত্যু নেই। নেতাজি বিপ্লবের মহানায়ক। অবিনাশী, চিরন্তন। আবার তাঁর আবির্ভাব হবে। ঝড়ের রাতে, আর অমানিশায়। জাতিকে পরিচালিত করবেন সেই অবিনশ্বর বিপ্লবের পাবক-পরিশুদ্ধ স্বক্ষেত্রে ও স্বরাজ্যে।

শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। নেতাজিকে যেমন করেই হোক যেতে হবে।

১৫ই আগস্ট। শেষ সিদ্ধান্ত নেতাজির। তিনি যাবেন। ইংরেজের আগড়ের বাইরে যাবেন। যাবেন শত্রুর নাগালের অনেক দূরে।

আবার নতুন করে যাত্রা হবে শুরু।

অজানা ও অচেনার চিরন্তন দুর্জ্জেয় ডাক আর একবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। নাম না-জানা পথ আমন্ত্রণ জানায়।

সাড়া দেন নেতাজি।

সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।

ডাক পড়ে কর্ণেল স্ট্র্যাসির। বারান্দায় বসে ছিলেন নেতাজি। চোখ দুটি চলে গেছে কোন্ সুদূরে। অনেক দূরের বীচিবিক্ষোভ ছাড়িয়ে নিঃসীম দিগন্তে মিশেছে দৃষ্টি। দেহ স্থির। বসে আছেন এক ধ্যানী বুদ্ধ।

স্ট্র্যাসি এলেন। পাশে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর ক্যাপ্টেন আর. এ. মালেক। দু'জনের হাতেই নানা ধরণের নক্সা আর রেখাচিত্র।

কিছুদিন পূর্বে সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত বন্ধু ও সাথীদের একটি স্মারক চিহ্ন গড়ে তোলবার কথা জেগেছিল নেতাজির মনে। স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নিজে। ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন নিজের হাতে। (৮ই জুলাই, ১৯৪৫) নির্মাণের ভার দিয়েছিলেন কর্ণেল স্ট্র্যাসির ওপর। যাত্রার পূর্বক্ষণে সারা অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল সেই হারিয়ে

যাওয়া সাথীদের জন্য। জীবনের বিচিত্র অভিযানে মহাদুর্যোগের সাথীরা কত দূর-দূরান্তর থেকে ছুটে এসেছিল তাঁর পাশে। আপনার বলতে তাদের কেউ ছিল না। সব হারিয়ে, সব খুইয়ে, সব ভুলে তারা আশ্রয় করেছিল তাঁকে। তাদের নেতাজিকে। এই সিঙ্গাপুরেই তাদের তিনি পেয়েছিলেন। সিঙ্গাপুরেই আবার সব ফেলে, সবাইকে ফেলে, তাঁকে যেতে হবে।

পায়ের শব্দে ধ্যান ভেঙ্গে যায়। ফিরে তাকান। স্ট্র্যাসি স্যালুট করেন, বলেন,—'জয়হিন্দ'। মালেকও। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেতাজি নক্সাগুলি দেখেন। দেখেন রেখা-চিত্র। দৃষ্টির সম্মুখে নতুন করে ভেসে ওঠে আরাকান, কালাদান, বিষেণপুর, আর ইম্ফল।

শ্যামল প্রান্তর কাদা হয়ে উঠেছিল শত শহিদের রক্তে। রক্তের ফোয়ারা ছিটকে লেগেছিল পাহাড়ের গায়ে। অস্থি সমাকীর্ণ বনভূমি, পাহাড়ের আনাচ-কানাচ, পল্লীর নিস্তব্ধ প্রান্তর হাঁ করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

যে-কোন মুহূর্তে ইংরেজ ঢুকে পড়বে সিঙ্গাপুরে। তার পূর্বে গড়ে তোলা যাবে না এই সমাধি চিহ্ন? কতদিন লাগবে? পনের দিন? কিন্তু ইংরেজ তার পূর্বেই যদি এসে পড়ে? ওরা কি দেবে এই স্মৃতি চিহ্ন তৈরী করতে?

চোখ তুলে চান স্ট্র্যাসির দিকে। বলেন: "স্ট্র্যাসি,...পারবে?"

কর্ণেল আবার স্যালুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। নেতাজির চোখে চোখ রেখে বলেন: "পারবো সার।"

জ্বল জ্বল করে ওঠে নেতাজির সারা মুখ। বিস্ফারিত দুটি স্থির আঁখি নিবদ্ধ হয়ে আছে স্ট্র্যাসির মুখের ওপর। কত বড় দায়িত্ব স্ট্র্যাসি অঙ্গীকার করে নিলেন এই মুহূর্তে নেতাজির কাছ থেকে, তার গুরুত্ব স্ট্র্যাসির অজানা নয়। এই সময়ে কনট্রাক্টার, শিল্পী, আর মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে। চাই লোক—আর চাই তাদের মনোবল।

শেষবারের মতো মন কানায় কানায় ভরে উঠল নেতাজির। তাঁর শেরের বাচ্চারা সত্য সত্যই সত্যিকারের শের। কাগজের নয়। গল্পের নয়। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও এরা হাসতে জানে। এরা তাঁর হুকুমে মৃত্যুর টুঁটি চেপে ধরতে পারে। স্ট্র্যাসি কথা দিয়েছেন। হবে। চোখে তাঁর দেখে যাওয়া হবে না। কিন্তু সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেই সর্বপ্রথম ইংরেজ দেখবে এই অপরূপ ছবি। অকুতোভয় ভারতবাসীর নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বিস্ময় ভরা বলিদানের এক জীবন্ত সাক্ষর।

নেতাজি উঠে দাঁড়ান। স্ট্র্যাসির হাত জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন ক্ষণকাল। তারপর ধীরে বলেন: "ভগবান তোমার সহায় হোন স্ট্র্যাসি। নিশ্চয়ই তুমি পারবে।"

স্নেহ, মমতা, আর সীমাহীন বিশ্বাস ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে স্ট্র্যাসির শিরে। শিউরে ওঠেন স্ট্র্যাসি। একটা অজ্ঞাত প্রবাহের স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েন।

পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়ান স্ট্র্যাসি। স্যালুট করে মুখে বলেন,—'জয়হিন্দ'। ঘুড়ে দাঁড়ান। মাপা পদক্ষেপে বেরিয়ে যান। সঙ্গে মালেক।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ। নির্ভীক, নির্লোভ, দুর্বার।

দাঁড়িয়েই আছেন নেতাজি। তখনও ডান হাতখানা মাথায় ঠেকানো।

বন্দরের তীরভূমি কি দেখা যায়? না। ধোঁয়াটে। অস্পষ্ট। কতদূর? তাও অজানা। শুধু একটি কথাই জানা, পাড়ি দিতে হবে।

আজও পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কিয়ানি, আলাগাপ্পান, সরকার আর আয়ার। এর পর? কে কে থাকবে সঙ্গে? কেউ কি থাকবে?

ফিরে তাকান নেতাজি কিয়ানির দিকে। বলেন: "তোমার ওপর সিঙ্গাপুর আর আজাদ হিন্দ-এর সব দায়িত্ব রইলো। তোমায় সাহায্য করবেন আলাগাপ্পান আর সরকার।"

পরক্ষণেই হবিবের দিকে : "হবিব, আমার সঙ্গে যাবে তো ?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন হবিব : "হাঁ সার "

"আমার সঙ্গে এখান থেকে আর যাবেন প্রীতম সিং। আর ব্যাঙ্কক থেকে যাবেন আবিদ আর দেবনাথ।" বললেন নেতাজি।

কিন্তু মেজর স্বামী ? তাঁরও-যে যাবার কথা ছিল নেতাজির সঙ্গেই। স্বামী তখনও এসে পৌঁছোন নি।

এরপর আয়ার। একটু পাশ ফিরে আয়ারকে লক্ষ্য করে বললেন : "আয়ার সাব্, তোমার বয়েস কত ?"

"আটচল্লিশ সার"। উত্তর দিলেন আয়ার।

"আমার চাইতে এক বছর কম। তা, তোমার কী ইচ্ছে ?"

"আমার কাছে মস্কো আর মালয় একই। আমি সঙ্গে যাবো সার।"

"ঠিক আছে।"

আয়োজন শেষ।

বিদায়ক্ষণ দেখা দেয়। বাকি আছে ঘণ্টা তিনেক। নেতাজি একটু বিশ্রাম করবেন না ? তখনও চলছে অনুসন্ধান। বাকি কিছু থাকল না তো ? বলবার আর শোনাবার ? হিসাব-নিকাশ পাওনা-দেনার ?

কিন্তু জানা তো হল না নেতাজি যাবেন কোথায়। মস্কো ? মাঞ্চুরিয়া ? টোকিও ? সব দিকে চাপ চাপ অন্ধকার।

শুধু জানা গেল এইটুকু যে, ব্যাঙ্কক থেকে হবে শেষ যাত্রা।

কিন্তু কোথায় শেষ হবে এ নিরুদ্দেশ যাত্রার ? থামবে তো কোথাও ? নেতাজির সঙ্গেই-বা কে কে যাবে ? টোকিও কিম্বা জাপান অধিকৃত কোন স্থানই আর নেতাজির পক্ষে নিরাপদ নয়। আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের স্বাধীনতা নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু বিশ্বের কোথাও কি এমন স্থান আছে, যেখানে গেলে ইঙ্গ-আমেরিকার রোষ-বহ্নির হাত থেকে নেতাজি রক্ষা পাবেন ? এমন কি কেউ আছে, যে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে ?

আছে। রাশিয়া। কিন্তু সে কি চাইবে? হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই চাইবে। রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ভরসা পায়। দাঁড়াবেও। আর,—আবার যেদিন নেতাজি ইংরেজের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান গড়ে তুলবেন, সেদিন একমাত্র রাশিয়াই তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যও করবে।

কিন্তু, হয়তো এ-অনুমান সত্যই। তবু এইক্ষণে সবটাই নিছক অনুমান।

সত্য মাত্র একটিই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সিঙ্গাপুর এই মুহূর্তে ছেড়ে যেতে হবে।

১৬ই আগস্ট। সকাল ন'টা।

সবাই পৌঁছে গেলেন বিমান ক্ষেত্রে। বিদায় জানাতে এসেছেন কিয়ানি, আলাগাপ্পান, সরকার, আরও অনেকে।

ন'টা তিরিশ মিনিটে নেতাজি সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠলেন। শেষ বারের মতো সবাই একসঙ্গে বলে উঠল: "জয়হিন্দ।"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের সে বিদায় বাণী কেউ কি শুনতে পেয়েছিল?

ব্যাঙ্ককে বিমান পৌঁছোল বেলা তিনটেয়। কেউ জানত না নেতাজির আসবার কথা। বিমানক্ষেত্রে কেউ ছিল না। এক প্রান্তে ছিল একখানা কাঠের ছাউনি। সেখানেই সবাই এসে দাঁড়ালেন। বাইরে গন্‌গনে আগুনের মতো সূর্যোত্তাপ। প্রায় দু'ঘণ্টার মাথায় সংবাদ পেয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন ভোঁসলে। পেছনে এসেছিল আরও কয়েকখানা গাড়ি। নেতাজিকে নিয়ে ভোঁসলে চলে গেলেন। পেছনের গাড়িতে আর সবাই।

বার্তা রটে যেতে সময় লাগল না। নেতাজির বাংলোর প্রাঙ্গণ ভরে গেল জনতার স্রোতে। উৎকণ্ঠায় সবাই চঞ্চল। সবাই দেখতে চায় নেতাজিকে। ওদের মনেও হয়তো জেগেছিল সেই নিয়তির মতো নিষ্ঠুর কথাটা। শেষ দেখা।

রাত্রি গভীর হতে থাকে। জনতা নড়ে না। কমেও না। মাঝে

মাঝে নেতাজি এসে বারান্দায় দাঁড়ান। ওরা চীৎকার করে ওঠে,—নেতাজি জিন্দাবাদ !

ভোর হতে দেরি নেই। পাখি ডাকতে শুরু করেছে। ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার।

বাজে পাঁচটা।

সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিচে।

ধীর পায়ে নেতাজি নেমে এলেন ওপর থেকে।

সামনে এসে দাঁড়ালেন। পেছনে দাঁড়ালেন হবিবর রহমান, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান, আয়ার আর দেবনাথ দাশ।

একে একে বিদায় নিলেন পরমানন্দ, ঈশ্বর সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ শাস্ত্রী, পিল্লাই, ভাস্করণ, ক্যাপ্টেন রিজ্‌ভি।

নেতাজি এগিয়ে যেয়ে সবাইকে আলিঙ্গন করলেন। থর থর করে কাঁপছে ওঁদের ঠোঁট। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। নেতাজি বিড় বিড় করে বলে চলেছেন,—জয়হিন্দ। অবিরল জলের ধারা নেতাজির গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সুনীল, নেতাজির খাস-ভৃত্য। ব্যাঙ্ককের ক্যাম্পে ও থাকত। দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। নেতাজি এগিয়ে গেলেন ওর দিকে। পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সুনীল।

॥ তের ॥

নেতাজির প্লেন সাইগনে পৌছোল সকাল ১০টায়। (১৭ই আগস্ট) ছ'খানা প্লেন ছেড়েছিল ব্যাঙ্কক থেকে। একখানায় নেতাজি, কর্ণেল হবিব, প্রীতম সিং, আয়ার এবং একজন জাপানী অফিসার। অন্যখানায় গুলজারা সিং, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাশ, জেনারেল আইসোদা এবং হাচাইয়া। বিমান ক্ষেত্রেই এ-ব্যবস্থা হল যে, আইসোদা এবং হাচাইয়া তখুনি ফিল্ডমার্শাল তেরৌচির সঙ্গে দেখা করবেন এবং নেতাজির ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার সাহায্যের জন্য বিমানের কী ব্যবস্থা হবে, তাও জেনে আসবেন। তেরৌচির হেড্কোয়ার্টার ছিল দালাতে। বিমানে যেতে হবে।

সবাই মোটরে চেপে সহরের অনতিদূরে নারায়ণদাসের গৃহে উপস্থিত হলেন। নারায়ণ দাস ছিলেন স্থানীয় আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের হাউসিং বিভাগের সেক্রেটারী।

সাইগন সহর। নিস্তব্ধ। জনমানবহীন রাজপথ। ছ'দিন পূর্বে জাপানের আত্মসমর্পণ-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আর উদ্বিগ্ন ছশ্চিন্তায় সবাই দিশেহারা। এককালে ফরাসীরা ছিল অধীশ্বর। বিজয়ী মিত্রপক্ষের সঙ্গে ফরাসী ছ্যগলের যোগ আছে। স্বাধীন ফরাসী সরকার পুনর্গঠিত হয়েছে। ওরা আসবে। ওদের হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পেতে আবার আসবে। আসবে ওদের মিত্র বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে। দেখাবে আবার ওদের দর্প আর দম্ভ।

অধিকাংশ গৃহের দরজা ভেতর থেকে রুদ্ধ। কোন কোন ঘরে তালা মারা। গৃহবাসী দূরে পালিয়ে গেছে। ক্বচিৎ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ উঁকি মারে। আবার পরক্ষণেই খড়খড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

আনাচে-কানাচে দু-একটি দোকান খোলা। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে। মুখে রা নেই। সবাই চোখের ইসারায় কথা বলে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুজব শতমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছিল ভারতবাসী। তাদের নাকি জ্যান্ত গোর দেয়া হবে। রোমহর্ষক গল্প হাওয়ায় ছড়াতে থাকে।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কর্মীরা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ চলে গেছে দূরের গ্রামে। দেশীয়দের মধ্যে যারা জাপানীদের সাহায্য করেছে বা চাকুরী করেছে, তারা ভয়ে আধমরা।

নেতাজির আগমন-কথা তাই কেউ জানল না। অবশ্য জানবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল। শুধু গুজব শুনে বিমানক্ষেত্রে এসেছিলেন একটি প্রাণী; চন্দ্রমাল। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের জনৈক কর্মী।

দাড়ি কামিয়ে নেতাজি স্নান করলেন। মূহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রা।

সকল চিন্তার অবসান হয়ে গেছে। শ্রান্ত সৈনিক অবকাশ পেয়েছেন ঘুমিয়ে নেবার। দীর্ঘদিন এই অবকাশ মেলেনি। প্রতীক্ষায় বসে ছিল নিদ্রা।

আধঘণ্টাও কাটল না। ছুটে এল একজন জাপানী অফিসার। একখানা জাপানী প্লেন সেই মুহূর্তে ছাড়বে। প্লেনে স্থান আছে মাত্র একজনের। নেতাজি কি যাবেন?

নেতাজি উঠে বসলেন শয্যার ওপর। আবিদকে জিজ্ঞেস করলেন: "ওঁকে জিজ্ঞেস করো, এ-প্লেন যাবে কোথায়?"

আবিদ বললেন: "করেছিলাম সার। উনি জানেন না।"

"যে জানে, তাকে পাঠিয়ে দিতে বলো। আইসোদা ও হাচাইয়া দালাত থেকে ফিরে এসেছেন?"

"সার, জাপানী অফিসারটি বলছেন যে, হাতে সময় মোটে নেই।"

"এ-ভাবে কিছু না জেনে আমি যেতে পারিনে। তাড়াহুড়ো করবারও কোনো মানে হয় না। এমন কেউ আসুক যে সব জানে।" ফিরে গেলেন জাপানী।

একটুবাদেই আঙ্গিনার ভেতর ঢুকে পড়ল একখানা মোটর গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন আইসোদা, হাচাইয়া আর ফিল্ড মার্শাল তেরৌচির একজন স্টাফ্ অফিসার। ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। থাকলেন নেতাজির কাছে শুধু হবিব।

কী কথা হয়েছিল বন্ধ-ঘরে অজ্ঞাতই থেকে গেল। একটু বাদেই নেতাজি বেরিয়ে এলেন। হবিব, আয়ার, আবিদ আর দেবনাথকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন। দরজা ভেতর থেকে দেয়া হল রুদ্ধ করে।

"শোনো, একখানা প্লেন শুধু পাওয়া গেছে; তাও আমাদের একজনের জন্যে পাওয়া যাবে একটি মাত্র সিট। আমার যাওয়া যদি তোমরা সাব্যস্ত করো, আমাকে যেতে হবে একা। দেরি কোরো না। যা বলবার তোমরা বলে ফেলো। আর একজনের জায়গা দিতে আমি বলেছি; হবে বলে মনে হয় না।" শেষ করলেন নেতাজি।

সারা কক্ষ স্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষগুলোও পাথর হয়ে গেছে। কী জবাব দেবে? কে-ই-বা আগে বলবে কথা? অজানা ভবিষ্যতের হাতে নেতাজিকে একা ছেড়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে কে আসবে এগিয়ে আগে?

কিন্তু ওরা কি ইচ্ছে করলে একজনকেও একটু স্থান দিতে পারে না? ওদের একজন না হয় নাই-ই গেল। তাই বলে নেতাজি যাবেন একা? তাও এই সময়ে?

"চিৎকার করে আমাদের বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে, তোমরা অন্যায় করছো। অন্তত বারো জন লোক যেতে পারে একখানা বম্বার প্লেনে। সে অবস্থায়, আমাদের একজনকেও তোমরা নেবে না কেন? কেন তোমরা নেতাজিকে একা নিতে চাইছো? সে-এক উন্মাদ মুহূর্ত।

আমাদের স্থির হয়ে ভাববার উপায় ছিল না কিছু। শুধু বোবা আর বোকার মতো আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইছিলাম।" লিখছেন আয়ার।

নেতাজি আবার বলে উঠলেন: "দেরি কোরো না। সময় নেই মোটে। আমি যাবো কি যাবো না, এই কথাটিই তোমরা শুধু বলো।"

কিন্তু নেতাজি সাইগনেই থাকুন, এমন কথাই-বা ওঁরা বলবেন কেমন করে? যে-কোন মুহূর্তে শত্রু এসে দাঁড়াবে। দাঁড়াবে তার হিংস্র দাঁত বের করে। নেতাজিকে ওরা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে। তাঁরা কয়েকজন পাশে আছেন সত্য। তাঁরা মরবেন, এ-কথাও ঠিক; কিন্তু নিজেরা মরেও তো নেতাজিকে বাঁচানো যাবে না। ওঁরা সত্যিই কি পাগল হয়ে যাবেন?

একজন ওঁদের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন। বললেন: "সার, ওদের কাছে আরো জোর দিয়ে বলুন। অন্তত একজনের ওরা স্থান দিক। যদি তা নাই-ই দেয়,"—রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কষ্টে মুখ থেকে বেড়িয়ে এল: "আপনি সায়গন ছেড়ে চলে যান সার।"

আর ওঁরা বলতে পারেন না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন সবাই। ভাগ্যের এক নিদারুণ পরিহাস। যাঁর একটি ইঙ্গিতে শত প্রাণ ছুটে এসেছে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে, এবং আজও করতে প্রস্তুত, শেষ অজানার কোলে ফিরে যাবার সময় তাঁকে যেতে হবে আজ একা।

তবু ওঁরা শেষ মুহূর্তে বলে ওঠেন: "যেখানেই যাবেন সার, আমাদের নিয়ে যেতে একটুও দেরি করবেন না।"

সংসার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র কি নেতাজির চাইতেও প্রিয়? ওদের কি নেতাজি ছাড়া আর কেউ, আর কিছু প্রিয়তর ছিল? এমন করে কে কবে সব তুচ্ছ মনে করেছে নেতার জন্য? সব ভুলে পাগল হয়ে উঠেছে নেতার সর্ব অবস্থার সাথী হতে?

কিন্তু নেতাজি যাবেন কোথায়, একবারও তো স্পষ্ট করে সে-কথাটি বললেন না।

"আমরা কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। প্লেন যাবে মাঞ্চুরিয়া। নেতাজি মনে করেছিলেন যে, আমরা জানি। তাই তিনি বলেননি।" বলছেন আয়ার।

জাপানীরা দাঁড়িয়ে আছেন। ফিরে গেলেন নেতাজি। পরক্ষণেই আবার ফিরে এলেন। বললেন: "একটা সিট পাওয়া গেলো। একজন যাবে। হবিব যাবে আমার সঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন: "তোমরাও এসো। কী জানি, যদিই পাওয়া যায় আরো।"

অপরাহ্ণ পাঁচটা পনের। ১৭ই আগস্ট।

নেতাজিকে নিয়ে প্লেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে থাকলেন হবিব একা।

সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে ওঠবার সময় বলে গেলেন: "আবার দেখা হবে।"

দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের দিকে ওরা চেয়ে রয়েছে
চেয়ে রয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ।
চেয়ে রয়েছে গোটা ভারতবর্ষ।
চোখভরা অবিরল অশ্রু। কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ।
সজাগ ওদের কানে শুধু বাজে—
আবার দেখা হবে।—
সম্ভবামি যুগে যুগে।

উপসংহার

সার্বভৌম স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র। রাজধানী দিল্লী। প্রশস্ত রাজপথ। সরল, মসৃন, পরিচ্ছন্ন। মাথায় রাষ্ট্রপতি ভবন। ওরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ভূতপূর্ব ভারত অধিশ্বর ইংলণ্ডের মৃত রাজা। তাকিয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে চেয়ে।

ভবনের মাথায় ওড়ে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। রাজপথের দু'পাশে নয়নাভিরাম উপবন। পথে জনতার স্রোত।

ঐ জনতার ভিড়ে কি মিশে আছে সেই পাঞ্জাবী যুবকটি, যে তার সর্বস্ব দিয়ে কিনেছিল নেতাজির গলার মালাটি? বর্ণাঢ্য বসন ও ভূষণে সজ্জিত অগণিত অভিজাতদের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায় দীন আর কাঙালের দল। বিশীর্ণ দেহ আর জীর্ণ পরিচ্ছদ নিয়ে সেই যুবকটিও কি মিশে আছে ওদেরই সঙ্গে? হাতে কি তার আজও আছে সেই শুকনো মালাছড়া? শুকিয়ে যাওয়া ফুলের পাঁপড়িগুলি?

ক্রোড়পতি মালিকদের গাড়ি ছোটে রাজপথে। যায় লোক-সভায়। যায় রাষ্ট্রপতি-ভবনে। আর হবিব? এক কোটি টাকা তুলে দিয়েছিল নেতাজির হাতে। কেন দিল? কী পেল? সে কোথায়? হারিয়ে গেল?

মাতা-পিতা-ভাই-বোন ফেলে ছুটে এসেছিল সেই মেয়েরা,—ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর সৈনিক হয়েছিল। কাঁধে তুলে নিয়েছিল কিরিচ বসানো রাইফেল। তারা গেল কোথায়? বুকের রক্তে কামনা করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এল। তকৃত্ তাউস থেকে বিতরিত হল করুণা। শিরোপা পেল কত নটী আর নট। কত বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী। তারা পেল কী? তারা গেল কোথায়?

কোহিমা আর ইম্ফল থেকে চাপা আর্তনাদ গুমরে গুমরে ওঠে নিস্তব্ধ প্রদোষের বুকে। আরাকান আর কালাদান কাঁদে নিশীথ রাত্রে। বিক্ষিপ্ত করোটি কি কাঁদে? কাঁদে কি ভগ্ন অস্থির টুক্‌রো?

উন্মাদিনী নারী ঘুরে বেড়ায় রাজপথে, যমুনার তীরে তীরে, রাজঘাটের চারপাশে। শতচ্ছিন্ন বেশ। অস্থি-চর্ম-সার দেহ। বিড় বিড় করে বলে—জয়হিন্দ।

কে ও? আজাদ হিন্দ ফৌজের কেউ?